www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭ - ১৯১২)

মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭ - ১৯১২)
১২৫৪ সালের ২৮শে কার্তিক মোতাবেক ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই নভেম্বরে নদীয়া জেলার গৌরী নদীর তীরবর্তী "লাহিনী পাড়া গ্রামে, মাতামহ মুন্সী জিনাতুল্লার বাটীতে, বিবি দৌলতন্নেসার গর্ভে" মীর মর্শারফ হোসেন জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মীর মুয়াজ্জম হোসেন। মর্শারফ ছিলেন তাঁর পিতার দ্বিতীয় পরে প্রথম সন্তান। রাজ-কার্যে যোগ্যতা ও পারদর্শিতার জন্য এঁরা 'মীর' উপাধি পান। প্রকৃতপক্ষে বংশ-পরিচয়ের উপাধি হল 'সৈয়দ'।

বিষাদ সিন্ধু (উপন্যাস)

মহানবী (সঃ) এর দৌহিত্রদ্বয় হযরত হাসান (রঃ) ও হযরত হোসেন (রঃ) এর চরম বিয়োগান্তক পরিণতি নিয়ে মীর মশাররফ হোসেন এর অমর উপন্যাস "বিষাদ সিন্ধু"। এর তিনটি পর্ব - "মহরম পর্ব, ''উদ্ধার পর্ব", ও এজিদ বধ পর্ব" প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৮৮৫, ১৮৮৭ ও ১৮৯১ ইং সালে।

- উপক্রমণিকা
- বিষাদ সিন্ধু মহরম পর্ব

উপক্রমণিকা

যখন আরব-গগনে ইসলাম-রবি মধ্যাকাশে উদিত, সমস্ত আরব-ভূমি ইসলাম-গৌরবে গৌরবান্বিত এবং সকলেই সেই প্রভু হজরত মোহাম্মদের পদানত হইয়াছে; সেই সময় একদা পবিত্র ঈদোৎসব-দিনে হজরত মোহাম্মদ প্রধান প্রধান শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে উপবেশন করিয়া ধর্মোপদেশ প্রদান করিতেছেন। এমন সময় তদীয় দৌহিত্র অর্থাৎ মহাবীর হযরত আলী-এর দুই পুত্র-হজরত হাসান ও হোসেন বালকসুলভ আগ্রহবশতঃ কাঁদিতে কাঁদিতে মাতামহের নিকট বসনভূষণ প্রার্থনা করিলেন।

হজরত স্নেহবশে দুই ভ্রাতার গণ্ডস্থলে চুম্বন করতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী রূপ বসনে তোমরা সন্তুষ্ট হইবে?" হজরত হাসান সবুজ রঙের ও হজরত হোসেন লালরঙের বসন প্রার্থনা করিলেন। তন্মুহুর্তেই স্বর্গীয় প্রধান দূত জিবরাইল, প্রভু মোহাম্মদের নিকট উপস্থিত হইয়া পরম কারুণিক পরমেশ্বরের আদেশবাক্য কহিয়া অন্তর্হিত হইলেন। স্বর্গীয় সৌরভে চতুর্দিক আমোদিত হইল। প্রভু মোহাম্মদ ক্ষণকাল ম্লানমুখে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। শিষ্যগণ তাঁহার তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া নিতান্তই ভয়াকুল হইলেন। কী কারণে প্রভু এরূপ চিন্তিত হইলেন, কেহই তাহা কিছু স্থির করিতে না পারিয়া বিষন্ন-নয়নে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

পবিত্র বদনের মলিনভাব দেখিয়া সকলের নেত্রই বাষ্প-পরিপ্লুত হইল। কিন্তু কেহই জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইলেন না। প্রভু মোহাম্মদ শিষ্যগণের তাদৃশ অবস্থা দর্শনে মনের ভাব গোপন করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা হঠাৎ এরূপ দুঃখিত ও বিষাদিত হইয়া কাঁদিতেছ কেন?"

শিষ্যগণ করজোড়ে বলিতে লাগিলেন, "প্রভুর অগোচর কী আছে? ঘনাগমে কিংবা নিশাশেষে পূর্ণচন্দ্র হঠাৎ মলিনভাব ধারণ করিলে তারাদলের জ্যোতিঃ তখন কোথায় থাকে? আমরা আপনার চির-আজ্ঞাবহ। অকস্মাৎ প্রভুর পবিত্র মুখের মলিনভাব দেখিয়াই আমাদের আশঙ্কা জন্মিয়াছে। যতক্ষণ আপনার সহাস্য আস্যের ঈদৃশ বিসদৃশ ভাব বিদ্যমান থাকিবে, ততক্ষণ ততই আমাদের দুঃখবেগ পরিবর্ধিত হইবে। আমরা বেশ বুঝিয়াছি,

সামান্য বাত্যাঘাতে পর্বত কম্পিত হয় নাই, সামান্য বায়ুপ্রবাহেও মহাসমুদ্রে প্রবল তরঙ্গ উত্থিত হয় নাই। প্রভো! অনুকম্পা-প্রকাশে শীঘ্র ইহার হেতু ব্যক্ত করিয়া অল্পমতি শিষ্যগণকে আশ্বস্ত করুন।"

প্রভু মোহাম্মদ নম্রভাবে কহিলেন, "তোমাদের মধ্যে কাহারো সন্তান আমার প্রাণাধিক প্রিয়তম হাসান-হোসেনের পরম শত্রু হইবে। হাসানকে বিষপান করাইয়া মারিবে এবং হোসেনকে অস্ত্রাঘাতে নিধন করিবে, তাহারই নিদর্শনস্বরূপ আজ দুই ভ্রাতা আমার নিকট সবুজ ও লাল রঙের বসন প্রার্থনা করিয়াছে।"

এই কথা শুনিয়া শিষ্যগণ নির্বাক্ হইলেন। কাহারো মুখে একটিও কথা সরিল না। তাঁহাদের কন্ঠ ও রসনা ক্রমে শুষ্ক হইয়া আসিল। কিছুকাল পরে তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "প্রভুর অবিদিত কিছুই নাই। কাহার সন্তানের দ্বারা এরূপ সাংঘাতিক কার্য সংঘটিত হইবে, শুনিতে পাইলে তাহার প্রতিকারের উপায় করিতে পারি। যদি তাহা ব্যক্ত না করেন, তবে আমরা অদ্যই বিষপান করিয়া আত্মবিসর্জন করিব। যদি তাহাতে পাপগ্রস্ত হইয়া নারকী হইতে হয়, তবে সকলেই অদ্য হইতে আপন আপন পত্নীগণকে একেবারে পরিত্যাগ করিব। প্রাণ থাকিতে আর স্ত্রী-মুখ দেখিব না, স্ত্রীলোকের নামও করিব না।"

প্রভু মোহাম্মদ কহিলেন, "ভাই সকল! ঈশ্বরের নিয়োজিত কার্যে বাধা দিতে এ জগতে কাহারো সাধ্য নাই; তাঁহার কলম রদ করিতে কাহারো ক্ষমতা নাই। তাঁহার আদেশ অলঙ্ঘনীয়। তবে তোমরা-অবশ্যম্ভাবী ঘটনা স্মরণ করিয়া কেন দুঃখিত থাকিবে? নিরপরাধিনী সহধর্মিণীগণের প্রতি শাস্ত্র-বহির্ভূত কার্য করিয়া অবলাগণের মনে কেন ব্যথা দিবে? তাহাও তো মহাপাপ! তোমাদের কাহারো মনে দুঃখ হইবে বলিয়াই আমি তাহার মূল বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতে ইতস্তত করিতেছি। নিতান্ত পক্ষে যদি শুনিতে বাসনা হইয়া থাকে, বলিতেছি-শ্রবণ কর। তোমাদের মধ্যে এই প্রিয়তম মাবিয়ার এক পুত্র জন্মিবে; সেই পুত্র

জগতে এজিদ্ নামে খ্যাত হইবে; সেই এজিদ্ হাসান-হোসেনের পরম শত্রু হইয়া প্রাণবধ করাইবে। যদিও মাবিয়া এ পর্যন্ত বিবাহ করেন নাই, তথাপি সেই অসীম জগদ্বিধান জগদীশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন হইবার নহে, কখনোই হইবে না। সেই অব্যক্ত সুকৌশলসম্পন্ন অদ্বিতীয় প্রভুর আদেশ কখনোই ব্যর্থ হইবে না।"

মাবিয়া ধর্ম সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, "জীবন থাকিতে বিবাহের নামও করিব না; নিজে ইচ্ছা করিয়া কখনো স্ত্রীলোকের মুখ পর্যন্ত দেখিব না।"

প্রভু মোহাম্মদ কহিলেন, "প্রিয় মাবিয়া! ঈশ্বরের কার্য,-তোমার মত ঈশ্বরভক্ত লোকের এরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হওয়া নিতান্ত অনুচিত। তাঁহার মহিমার পার নাই, ক্ষমতার সীমা নাই, কৌশলের অন্ত নাই।" এই সকল কথার পর সকলেই আপন আপন বাটীতে চলিয়া গেলেন।

কিছুদিন পরে একদা মাবিয়া মূত্রত্যাগ করিয়া কুলুখ (কুলুখ-ঢিল, পানির পরিবর্তে ঢিল ব্যবহার করা শাস্ত্রসঙ্গত) লইয়াছেন, সেই কুলুখ এমন অসাধারণ বিষসংযুক্ত ছিল যে, তিনি বিষের যন্ত্রণায় ভূতলে গড়াগড়ি দিতে দিতে অস্থির হইয়া পড়িলেন। বন্ধুবান্ধব সকলের কর্ণেই মাবিয়ার পীড়ার সংবাদ গেল। অনেকরূপ চিকিৎসা হইল; ক্রমশ বৃদ্ধি ব্যতীত কিছুতেই যন্ত্রণার হ্রাস হইল না। মাবিয়ার জীবনের আশায় সকলেই নিরাশ হইলেন। ক্রমে ক্রমে তদ্বিষয় প্রভু মোহাম্মদের কর্ণগোচর হইল, তিনি মহাব্যস্তে মাবিয়ার নিকটে আসিয়া ঈশ্বরের নাম করিয়া বিষসংযুক্ত স্থানে ফুৎকার প্রদানে উদ্যত হইলেন।

এমন সময় স্বর্গীয় দূত আসিয়া বলিলেন, "হে মোহাম্মদ, কী করিতেছ? সাবধান! সাবধান! ঈশ্বরের নাম করিয়া মন্ত্রপূত করিয়ো না। এ সকলই ঈশ্বরের লীলা। তোমার মন্ত্রে মাবিয়া কখনোই আরোগ্যলাভ করিবে না। সাবধান! ইহার সমুচিত ঔষধ স্ত্রী-সহবাস। স্ত্রী-সহবাসমাত্রেই মাবিয়া বিষম বিষ-যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিবে। উহা ব্যতীত এ বিষের

যন্ত্রণা নিবারণের ঔষধ জগতে আর দ্বিতীয় নাই।" এই কথা বলিয়া স্বর্গীয় দূত অন্তর্হিত হইলেন।

প্রভু মোহাম্মদ শিষ্যগণকে বলিতে লাগিলেন, "ভাই সকল! এ রোগের ঔষধ নাই। ইহজগতে ইহার উপযুক্ত চিকিৎসা নাই। একমাত্র উপায় স্ত্রী-সহবাস। যদি মাবিয়া স্ত্রী-সহবাস করিতে সম্মত হন, তবেই প্রাণরা হইতে পারে।" মাবিয়া স্ত্রী-সহবাসে অসম্মত হইলেন। 'আত্মহত্যা মহাপাপ' প্রভু কর্তৃক এই উপদেশ শুনিতে লাগিলেন। পরিশেষে সাব্যস্ত হইল যে, অশীতিবর্ষীয়া কোন বৃদ্ধা স্ত্রীকে শাস্ত্রানুসারে গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত সহবাস করিবেন। কার্যেও তাহাই ঘটিল। বিষম রোগ হইতে মাবিয়া মুক্ত হইলেন। জীবন রক্ষা হইল।

অসীম করুণাময় পরমেশ্বরের কৌশলের কণামাত্র বুঝিয়া উঠা মানবপ্রকৃতির সাধ্য নহে। সেই অশীতিবর্ষীয়া বৃদ্ধা স্ত্রী কালক্রমে গর্ভবতী হইয়া যথাসময়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। মাবিয়া পূর্ব হইতে স্থিরসঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে, যদি পুত্র হয়, তখনই তাহাকে মারিয়া ফেলিবেন; কিন্তু পুত্রের সুকোমল বদনমণ্ডলের প্রতি একবার নয়ন-গোচর করিবামাত্রই বৈরীভাব অন্তর হইতে একেবারে তিরোহিত হইল। হৃদয়ে সুমধুর বাৎসল্যভাবের আবির্ভাব হইয়া তাঁহার মন আকর্ষণ করিল। তখন পুত্রের প্রাণ হরণ করিবেন কি, নিজেই পুত্রের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। আপন প্রাণ হইতেও তিনি এজিদেক অধিক ভালবাসিতে লাগিলেন।

বয়োবৃদ্ধির সহিত ভালবাসাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কিন্তু সময়ে সময়ে সেই নিদারুণ হৃদয়বিদারক বাক্য মনে করিয়া নিতান্তই দুঃখিত হইতেন। কিছুদিন পরে মাবিয়া দামেস্ক নগরে স্থায়ীরূপে বাস করিবার বাসনা প্রভু মোহাম্মদ ও মাননীয় আলীর নিকটে প্রকাশ করিয়া অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। আরো বলিলেন, "এজিদের কথা আমি ভুলি নাই।

হাসান-হোসেনের নিকট হইতে তাহাকে দূরে রাখিবার অভিলাষেই আমি মদিনা পরিত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিতেছি।"

মাননীয় আলী সরলহৃদয়ে সন্তুষ্টচিত্তে জ্ঞাতি-ভ্রাতা মাবিয়ার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়া নিজ অধিকৃত দামেস্ক নগর তাঁহাকে অর্পণ করিলেন। প্রভু মোহাম্মদ কহিলেন, "মাবিয়া দামেস্ক কেন, এই জগ হইতে অন্য জগতে গেলেও ঈশ্বরের বাক্য লঙ্ঘন হইবে না।" মাবিয়া লজ্জিত হইলেন, কিন্তু পূর্বসঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন না। অল্পদিবসের মধ্যে তিনি সপরিবারে মদিনা পরিত্যাগ করিয়া দামেস্ক নগরে গমন করিলেন এবং তত্রত্য রাজসিংহাসনে উপবেশন করিয়া প্রজাপালন ও ঈশ্বরের উপাসনায় অধিকাংশ সময় যাপন করিতে লাগিলেন। এদিকে প্রভু মোহাম্মদ হিজরি ১১ সনের ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার বেলা সপ্তম ঘটিকার সময় পবিত্র-ভূমি মদিনায় পবিত্র দেহ রাখিয়া স্বর্গবাসী হইলেন।

প্রভুর দেহত্যাগের ছয় মাস পরে বিবি ফাতেমা (প্রভুকন্যা, হাসান-হোসেনের জননী, মহাবীর আলীর সহধর্মিণী) হিজরি ১১ সনে পুত্র ও স্বামী রাখিয়া জান্নাত (বেহেশ্তের নাম) বাসিনী হইলেন। মহাবীর হজরত আলী হিজরি ৪০ সনের রমজান মাসের চতুর্থ দিবস রবিবারে দেহত্যাগ করেন। তপরেই মহামান্য ইমাম হাসান মদিনার সিংহাসনে উপবেশন করিয়া ধর্মানুসারে রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন। দামেস্ক নগরে এজিদ্ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পরিবর্ণিত ঘটনা শুরু হইল।

সূচীপত্র

- প্রথম প্রবাহ
- দ্বিতীয় প্রবাহ
- তৃতীয় প্রবাহ
- চতুর্থ প্রবাহ
- পঞ্চম প্রবাহ
- ষষ্ঠ প্রবাহ

- সপ্তম প্রবাহ
- অষ্টম প্রবাহ
- নবম প্রবাহ
- দশম প্রবাহ
- একাদশ প্রবাহ
- দ্বাদশ প্রবাহ
- ত্রয়োদশ প্রবাহ
- চতুর্দশ প্রবাহ
- পঞ্চদশ প্রবাহ
- ষোড়শ প্রবাহ
- সপ্তদশ প্রবাহ
- অষ্টাদশ প্রবাহ
- ঊনবিংশ প্রবাহ
- বিংশ প্রবাহ
- একবিংশ প্রবাহ
- দ্বাবিংশ প্রবাহ

প্রথম প্রবাহ

"তুমি আমার একমাত্র পুত্র। এই অতুল বিভব, সুবিস্তৃত রাজ্য এবং অসংখ্য সৈন্যসামন্ত সকলই তোমার। দামেস্ক-রাজমুকুট অচিরে তোমারই শিরে শোভা পাইবে। তুমি এই রাজ্যের কোটি কোটি প্রজার অধীশ্বর হইয়া তাহাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ, প্রতিপালন এবং জাতীয় ধর্মের উকর্ষ সাধন করিয়া সর্বত্র পূজিত এবং সকলের আদৃত হইবে। বল তো তোমার কিসের অভাব? কী মনস্তাপ? আমি তো ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। তুমি সর্বদাই মলিন ভাবে বিষাদিত চিত্তে বিকৃতমনার ন্যায় অযথা চিন্তায় অযথাস্থানে ভ্রমণ করিয়া দিন দিন ক্ষীণ ও মলিন হইতেছ। সময়ে সময়ে যেন একেবারে বিষাদ-সিন্ধুতে নিমগ্ন হইয়া,

জগতের সমুদয় আশা জলাঞ্জলি দিয়া আত্মবিনাশে প্রস্তুত হইতেছ; ইহারই-বা কারণ কী? আমি পিতা, আমার নিকটে কিছুই গোপন করিয়ো না। মনের কথা অকপটে প্রকাশ কর। যদি অর্থের আবশ্যক হইয়া থাকে, ধনভাণ্ডার কাহার জন্য? যদি রাজসিংহাসনে উপবেশন করিয়া রাজ্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করিবার বাসনা হইয়া থাকে, বল, আমি এই মুহুর্তেই তোমাকে মহামূল্য রাজবেশে সুসজ্জিত করিয়া রাজমুকুট তোমার শিরে অর্পণ করাইতেছি, এখনই তোমাকে সিংহাসনে উপবেশন করাইতেছি। আমি স্বচক্ষে তোমাকে রাজকার্যে নিয়োজিত দেখিয়া নশ্বর বিশ্বসংসার পরিত্যাগ করিতে পারিলে তাহা অপেক্ষা ঐহিকের সুখ আর কী আছে? তুমি আমার একমাত্র পুত্ররত্ন। অধিক আর কী বলিব-তুমি আমার অন্ধের যষ্টি, নয়নের পুত্তলি, মস্তকের অমূল্য মণি, হৃদয়ভাণ্ডারের মহামূল্য রত্ন, জীবনের জীবনীশক্তি-আশাতরু অসময়ে মুঞ্জরিত, আশামুকুল অসময়ে মুকুলিত, আশা-কুসুম অসময়ে প্রস্ফুটিত। বাছা, সদাসর্বদা তোমার মলিন মুখ ও বিমর্ষ ভাব দেখিয়া আমি একেবারে হতাশ হইয়াছি, জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছি। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, মনের কথা অকপটে আমার নিকট প্রকাশ কর। আমি পিতা হইয়া মনের বেদনায় আজ তোমার হস্তধারণ করিয়া বলিতেছি সকল কথা মন খুলিয়া আমার নিকট কি জন্য প্রকাশ কর না?" মাবিয়া নির্জনে নির্বেদসহকারে এজিদ্‌কে এই সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

এজিদ্ দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক বলিতে অগ্রসর হইয়াও কোন কথা বলিতে পারিলেন না; কন্ঠরোধ হইয়া জিহ্বায় জড়তা আসিল। মায়ার আসক্তির এমনি শক্তি যে, পিতার নিকট মনোগত ভাব প্রকাশ করিবার অবসর প্রাপ্ত হইয়াও মনোভাব প্রকাশ করিতে পারিলেন না; সাধ্যাতীত চেষ্টা করিয়াও মুক্তহৃদয়ে প্রকৃত মনের কথা পিতাকে বুঝাইতে পারিলেন না। যদিও বহু কষ্টে 'জয়' শব্দটি উচ্চারণ করিলেন, কিন্তু সে শব্দ মাবিয়ার কর্ণগোচর হইল না। কথা যেন নয়নজলেই ভাসিয়া গেল; 'জয়' শব্দটি কেবল জলমাত্রেই সার হইল। গণ্ডস্থল হইতে বক্ষঃস্থল পর্যন্ত বিষাদ-বারিতে সিক্ত হইতে লাগিল। সেই বিষাদ-বারিপ্রবাহ দর্শন করিয়া অনুতাপী মাবিয়া আরো অধিকতর দুঃখানলে দগ্ধীভূত হইতে লাগিলেন। জলে অগ্নি নির্বাণ হয়; কিন্তু প্রেমাগ্নি অন্তরে প্রজ্বলিত হইয়া প্রথমে নয়ন দুটির আশ্রয়ে বাষ্প সৃষ্টি করে,

পরিণামে জলে পরিণত হইয়া স্রোত বহিতে থাকে। সে জলে হয়ত বাহ্যবহ্নি সহজেই নির্বাপিত হইতে পারে, কিন্তু মনের আগুন দ্বিগুণ, চতুর্গুণ, শতগুণ জ্বলিয়া উঠে। এজিদ রাজ্যের প্রয়াসী নহেন, সৈন্যসামন্ত এবং রাজমুকুটেরও প্রত্যাশী নহেন, রাজসিংহাসনের আকাঙ্খীও নহেন। তিনি যে রত্নের প্রয়াসী, তিনি যে মহামূল্য ধনের প্রত্যাশী, তাহা তাঁহার পিতার মনের অগোচর, বুদ্ধির অগোচর। পুত্রের ঈদৃশী অবস্থা দেখিয়া মাবিয়া যারপরনাই দুঃখিত ও চিন্তিত হইলেন। শেষে অশ্রুসম্বরণে অক্ষম হইয়া বাষ্পাকুললোচনে পুনর্বার বলিতে লাগিলেন, "এজিদ্! তোমার মনের কথা মন খুলিয়া আমার নিকট ব্যক্ত কর। অর্থে হউক বা সামর্থ্যে হউক, বুদ্ধি কৌশলে হউক, যে কোন প্রকারেই হউক, তোমার মনের আশা আমি পূর্ণ করিবই করিব। তুমি আমার যত্নের রত্ন, অদ্বিতীয় স্নেহাধার। তুমি পাগলের ন্যায় হতবুদ্ধি, অবিবেকের ন্যায় সংসার-বর্জিত হইয়া মাতা পিতাকে অসীম দুঃখসাগরে ভাসাইবে, বনে-বনে, পর্বতে পর্বতে বেড়াইয়া বেড়াইয়া অমূল্যজীবনকে তুচ্ছজ্ঞানে হয়ত কোন্ দিন আত্মঘাতী হইয়া এই কিশোর বয়সে মৃত্তিকাশায়ী হইবে, ইহা ভাবিয়া আমার প্রাণ নিতান্তই আকুল হইতেছে; কিছুতেই স্থির হইতে পারিতেছি না। জীবন যেন দেহ ছাড়িয়া যাই যাই করিতেছে, প্রাণপাখি যেন পিঞ্জর ছাড়িয়া উড়ি-উড়ি করিতেছে। বল দেখি ব�স! কোন্ চক্ষে মাবিয়া তোমার প্রাণশূন্য দেহ দেখিবে? বল দেখি ব�স! কোন্ প্রাণে মাবিয়া তোমার মৃতদেহে শেষ বসন (কাফন) পরাইয়া মৃত্তিকায় প্রোথিত করিবে?"

এজিদ্ করজোড়ে বলিতে লাগিলেন, "পিতঃ! আমার দুঃখ অনন্ত। এ দুঃখের সীমা নাই, উপশমের উপায় নাই। আমি নিরূপায় হইয়াই জগতে আশা হইতে একেবারে বহু দূরে দাঁড়াইয়া আছি। আমার বিষয়, বিভব, ধন, জন, মতা সমস্তই অতুল, তাহা আমি জানি। আমি অবোধ নই; কিন্তু আমার অন্তর যে মোহিনী-মূর্তির সুতীক্ষ্ণ নয়ন-বাণে বিদ্ধ হইতেছে, সে বেদনার উপশম নাই। পিতঃ! সে বেদনার প্রতিকারের প্রতিকার নাই। যদি থাকিত, তবে বলিতাম! আর বলিতে পারি না। এতদিন অতি গোপনে মনে মনে রাখিয়াছিলাম, আজ আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া মনের কথা যতদূর সাধ্য বলিলাম। আর বলিবার

সাধ্য নাই। হয় দেখিবেন, না হয় শুনিবেন-এজিদ্ বিষপান করিয়া যেখানে শোকতাপের নাম নাই, প্রণয়ে হতাশ নাই, অভাব নাই এবং আশা নাই, এমন কোন নির্জন স্থানে এই পাপময় দেহ রাখিয়া সেই পবিত্রধামে চলিয়া গিয়াছে। আর অধিক বলিতে পারিতেছি না, ক্ষমা করিবেন।" এই কথা শেষ হইতে-না-হইতেই বৃদ্ধা মহিষী একগাছি সূবর্ণ-যষ্টি-আশ্রয়ে ঐ নির্জন গৃহমধ্যে আসিয়া এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। এজিদ্ শশব্যস্তে উঠিয়া জননীর পদচুম্বন করিয়া পিতার পদধূলি গ্রহণান্তর সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। দামেস্কাধিপতি মহিষীকে অভ্যর্থনা করিয়া অতি যত্নে মসনদের (মসনদ পারস্য শব্দ। অনেকে যে মসলন্দ শব্দ ব্যবহার করেন, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রম) পার্শ্বে বসাইয়া বলিতে লাগিলেন, "মহিষী! তোমার কথাক্রমে আজ বহু যত্ন করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারিলাম না; মনের কথা কিছুতেই ভাঙ্গিল না। পরিশেষে আপনিও কাঁদিল, আমাকেও কাঁদাইল। সে রাজ্যধনের ভিখারী নহে, বিনশ্বর ঐশ্বর্যের ভিখারী নহে; কেবল এইমাত্র বলিল যে, আমার আশা পূর্ণ হইবার নহে! আর শেষে যাহা বলিল তাহা মুখে আনা যায় না; বোধ হইতেছে যেন কোন মায়াবিনী মোহনীয় রূপে বিমুগ্ধ হইয়া এইরূপ মোহময়ী অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।"

রাজমহিষী অতি কষ্টে মস্তক উত্তোলন করিয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ! আমি অনেক সন্ধানে জানিয়াছি, আর এজিদ্ও আপনার নিকটে আভাসে বলিয়াছে।-আবদুল জাব্বারকে বোধ হয় আপনি জানেন?"

মাবিয়া কহিলেন, "তাহাকে তো অনেক দিন হইতেই জানি।" "সেই আবদুল জাব্বারের স্ত্রীর নাম জয়নাব।"

"হাঁ হাঁ, ঠিক হইয়াছে। আমার সঙ্গে কথা কহিবার সময় 'জয়' পর্যন্ত বলিয়া আর বলিতে পারে নাই।" একটু অগ্রসর হইয়া মাবিয়া আবার কহিলেন, "হাঁ! সেই জয়নাব কি?"

"আমার মাথা আর মুণ্ডু! সেই জয়নাবকে দেখিয়াই তো এজিদ্ পাগল হইয়াছে। আমার নিকট কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, মা, যদি আমি জয়নাবকে না পাই, তবে আর আমাকে দেখিতে পাইবেন না। নিশ্চয় জানাজা (মৃত শরীরের সদ্গতির উপাসনা) ক্ষেত্রে কাফনবস্ত্রের তাবুতাসনে ধরাশায়ী দেখিবেন।" এই পর্যন্ত বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মহিষী পুনর্বার কহিলেন, "আমার এজিদ্ যদি না বাঁচিল, তবে আর এই জীবনে ও বৃথা ধনে ফল কি?"

যেন একটু সরোষে মাবিয়া কহিলেন, "মহিষী! তুমি আমাকে কী করিতে বল?"

"আমি কি করিতে বলিব? যাহাতে এজিদের প্রাণরক্ষা হয় তাহারই উপায় করুন। আপনি বর্তমান থাকিতে আমার সাধ্যই-বা কী-কথাই-বা কী?"

মাবিয়া রোষভরে উঠিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন, বৃদ্ধা মহিষী হস্ত ধরিবামাত্র অমনি বসিয়া পড়িলেন। বলিতে লাগিলেন, "পাপী আর নারকীরা এ কার্যে যোগ দিবে। আমি ও-কথা আর শুনিতে চাই না। তুমি আর ও-কথা বলিয়া আমার কর্ণকে কলুষিত করিয়ো না। আপনার জিহ্বাকে ও পাপকথায় অপবিত্র করিয়ো না। ভাবিয়া দেখ দেখি, ধর্ম-পুস্তকের উপদেশ কি? পরস্ত্রীর প্রতি কুভাবে যে একবার দৃষ্টি করিবে, কোন প্রকার কুভাবের কথা মনোমধ্যে যে একবার উদিত করিবে, তাহারও প্রধান নরক 'জাহান্নামে' বাস হইবে। আর ইহকালের বিচার দেখিতে পাইতেছ! লৌহদণ্ড দ্বারা শত আঘাতে পরস্ত্রীহারীর অস্থি চূর্ণ, চর্ম ক্ষয় করিয়া জীবনান্ত করে। ইহা কী একবারও এজিদের মনে হয় না? প্রজার ধন, প্রাণ, মান, জাতি, এ সমুদয়ের রক্ষাকর্তা রাজা। রাজার কর্তব্যকর্মই তাহা। এই কর্তব্যে অবহেলা করিলে রাজাকে ঈশ্বরের নিকট দায়ী হইতে হয়। পরিণামে নরকের তেজোময় অগ্নিতে দগ্ধীভূত হইয়া ভস্মসা হইতে হয়। তাহাতেও নিস্তার নাই। সে ভস্ম হইতে পুনরায় শরীর গঠিত হইয়া পুনরায় শাস্তিভোগ করিতে হয়। এমন গুরুপাপের অনুষ্ঠান করা দূরে থাকুক, শুনিতেও পাপ আছে। এজিদ্ আত্মবিনাশ করিতে চায়, করুক, তাহাতে দুঃখিত নহি। এমন

শত এজিদ-শত কেন সহস্র এজিদ্ এই কারণে প্রাণত্যাগ করিলেও মাবিয়ার চক্ষে এক বিন্দু জল পড়া দূরে থাকুক বরং সন্তোষ-হৃদয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিবে। একটা পাপী জগ হইতে বহিষ্কৃত হইল বলিয়া ঈশ্বরের সমীপে এই মাবিয়া সেই জগপিতার নামে সহস্র সহস্র সাধুবাদ সমর্পণ করিবে। পুত্রের উপরোধে, কি তাহার প্রাণ রক্ষার কারণে ঈশ্বরের বাক্য-লঙ্ঘন করিয়া মাবিয়া কি মহাপাপী হইবে? তুমি কি তাহা মনে কর মহিষী? আমার প্রাণ থাকিতে তাহা হইবে না, মাবিয়া জগতে থাকিতে তাহা ঘটিবে না-কখনোই না।"

বৃদ্ধা মহিষী একটু অগ্রসর হইয়া মহারাজের হস্ত দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া কাতরভাবে বলিতে লাগিলেন, "দেখুন মহারাজ! এজিদ্ যে ফাঁদে পড়িয়াছে, সে ফাঁদে জগতের অনেক ভাল ভাল লোক বাঁধা পড়িয়াছেন। শত শত মুনি-ঋষি, ঈশ্বরভক্ত, কত শত মহাতেজস্বী জিতেন্দ্রিয় মহাশক্তিবিশিষ্ট মহাপুরুষ এই ফাঁদে পড়িয়া তত্ত্বজ্ঞান হারাইয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। আসক্তি, প্রেম ও ভালবাসার কথা ধর্মপুস্তকেও রহিয়াছে। ভাবিয়া দেখিলে প্রতীত হয়, মানুষের মধ্যেই ভালবাসার জন্ম, ইহা কাহাকেও শিক্ষা দিতে হয় না, দেখিয়াও কেহ শিক্ষা করে না, ভালবাসা স্বভাবতঃই জন্মে। বাদশানাম্দার! ইহাতে নূতন কিছুই নাই, আপনি যদি মনোযোগ করিয়া শুনেন, তবে আমি প্রণয় প্রসঙ্গ অনেক শুনাইতে পারি, দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতেও পারি। জগতে শত শত ভালবাসার জন্ম হইয়াছে, অনেকেই ভালবাসিয়াছে, তাহাদের কীর্তিকলাপ আজ পর্যন্ত-আজ পর্যন্ত কেন, জগ বিলয় না হওয়া পর্যন্ত মানবহৃদয়ে সমভাবে অঙ্কিত থাকিবে। বলিবেন, পাত্র বিবেচনা চাই। ভালবাসারূপ সমুদ্র যখন হৃদয়াকাশে মানস-চন্দ্রের আকর্ষণে স্ফীত হইয়া উঠে, তখন পাত্রাপাত্র জ্ঞান থাকে না। পিতা, মাতা, সংসার, ধর্ম, এমন কি ঈশ্বরকেও মনে থাকে কি না সন্দেহ। ইহাতে এজিদের দোষ কি বলুন দেখি? এই নৈসর্গিক কার্য নিবারণ করিতে এজিদের কি ক্ষমতা আছে? না আমার ক্ষমতা আছে? না আপনারই ক্ষমতা আছে? যাহাই বলুন মহারাজ! ভালবাসার ক্ষমতা অসীম!"

মাবিয়া বলিলেন, "আমি কি ভালবাসার দোষ দিতেছি? ভালবাসা তো ভাল কথা। মানব-শরীর ধারণ করিয়া যাহার হৃদয়ে ভালবাসা নাই, সে কি মানুষ? প্রেমশূন্য-হৃদয় কি হৃদয়? এজিদের ভালবাসা তো সেরূপ ভালবাসা নয়! তুমি কি কিছুই বুঝিতে পার নাই?"

মহিষী কহিলেন, "আমি বুঝিয়াছি, আপনিই বুঝিতে পারেন নাই। দেখুন মহারাজ! আমার এই অবস্থাতে ঈশ্বর সদয় হইয়া পুত্র দিয়াছেন। এ জগতে সংসারী মাত্রেই পুত্র কামনা করিয়া থাকে। বিষয়বিভব, ধন-সম্পত্তি অনেকেরই আছে; কিন্তু উপযুক্ত পুত্ররত্ন কাহার ভাগ্যে কয়টি ফলে বলুন দেখি? পুত্র-কামনায় লোকে কী না করে? ঈশ্বরের উপাসনা, ঈশ্বরভক্ত এবং ঈশ্বরপ্রেমিক লোকের অনুগ্রহের প্রত্যাশা, যথাসাধ্য দীন-দুঃখীর ভরণপোষণের সাহায্য প্রভৃতি যত প্রকার স৺কার্যে মনে আনন্দ জন্মে, সন্তান-কামনায় লোকে তাহা সকলই করিয়া থাকে। আপনি ঈশ্বরের নিকট কামনা করিয়া পুত্রধন লাভ করেন নাই; আমিও পুত্রলাভের জন্য বৃদ্ধ বয়সে ব বিদীর্ণ করিয়া শোণিতবিন্দু ঈশ্বরের উদ্দেশে উ৺সর্গ করি নাই। দয়াময় ভগবানের প্রসাদে, অযাচিতভাবে এবং বিনাযত্নে আমরা উভয়ে এ পুত্ররত্ন লাভ করিয়াছি। অগ্রপশ্চা৺ বিবেচনা করিয়া ক্রোধ করিতে হয়। যে এজিদের মুখ, এক মুহূর্ত না দেখিলে একেবারে জ্ঞানশূন্য হন, এজিদেক সর্বদা নিকটে রাখিয়াও আপনার দেখিবার সাধ মিটে না, আমি তো সকলই জানি, কোন সময়ে এই এজিদেক প্রাণে মারিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহা পারিলেন কই? ঐ মুখ দেখিয়াই তো হাতের অস্ত্র হাতেই রহিয়াছিল। অস্ত্রাঘাতে পুত্রের প্রাণবধ-সঙ্কল্প সাধন করিবেন দূরে থাকুক, ক্রোড়ে লইয়া শত শতবার মুখচুম্বন করিয়াও মনের সাধ মিটাইতে পারেন নাই।"

মাবিয়া বলিলেন, "আমাকে তুমি কি করিতে বল?"

মহিষী বলিলেন, "আর কি করিতে বলিব। যাহাতে ধর্ম রক্ষা পায়, লোকের নিকটেও নিন্দনীয় না হইতে হয় অথচ এজিদের প্রাণরক্ষা পায়, এমন কোন উপায় অবলম্বন করাই উচিত।"

"উচিত বটে, কিন্তু উপায় আসিতেছে না। স্থূল কথা, যাহাতে ধর্ম রা পায়, ধর্মোপদেষ্টার আজ্ঞা লঙ্ঘন না হয় অথচ প্রাণাধিক পুত্রের প্রাণরক্ষা হয়, ইহা হইলেই যথেষ্ট হইল। লোকনিন্দার ভয় কী? যে মুখে লোকে একবার নিন্দা করে, সে মুখে সুখ্যাতির গুণগান করাইতে কতক্ষণ লাগে?"

মহিষী বলিলেন, "আপনাকে কিছুই করিতে হইবে না, কিছু বলিতেও হইবে না, কিন্তু কোন কার্যে বাধা দিতেও পারিবেন না। মারওয়ানের সঙ্গে পরামর্শ করিয়াই আমি সকল কার্য করিব। ধর্মবিরুদ্ধ, ধর্মের অবমাননা কী ধর্মোপদেষ্টার আজ্ঞা লঙ্ঘনের অণুমাত্র সম্ভাবনা দেখিতে পান, বাধা দিবেন, আমরা ক্ষান্ত হইব।"

মহারাজ মহাসন্তোষে মহিষীর হস্ত চুম্বন করিয়া বলিলেন, "তাহা যদি পার, তবে ইহা অপেক্ষা সন্তোষের বিষয় আর কী আছে? এজিদের অবস্থা দেখিয়াই আমার মনে যে কী কষ্ট হইতেছে, তাহা ঈশ্বরই জানেন। যদি সকল দিক্ রক্ষা করিয়া কার্য উদ্ধার করিতে পার, তবেই সর্বপ্রকারে মঙ্গল; এজিদ্ও প্রাণে বাঁচে, আমিও নিশ্চিন্তভাবে ঈশ্বর-উপাসনা করিতে পারি।"

শেষ কথাগুলি শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধা মহিষী অনুকূলভাব-বিজ্ঞাপনসূচক মস্তক সঞ্চালন করিলেন। তখন তাহার মনে যে কি কথা, রসনা তাহা প্রকাশ করিল না; আকার-ইঙ্গিতে পতিবাক্যে সায় দিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। মৌন যেন কথা কহিল,-এই সঙ্কল্পই স্থির।

দ্বিতীয় প্রবাহ

মহারাজের সহিত মহিষীর পরামর্শ হইল। এজিদ্ও কথার সূত্র পাইয়া তাহাতে নানাপ্রকার শাখা-প্রশাখা বাহির করিয়া বিশেষ সতর্কতার সহিত আবদুল জাব্বারের নিকট 'কাসেদ্' প্রেরণ করিলেন।

পাঠক! কাসেদ্ যদিও বার্তাবহ, কিন্তু বঙ্গদেশীয় ডাকহরকরা'কে পত্রবাহক মনে করিবেন না। রাজপত্রবাহক, অথচ সভ্য ও বিচক্ষণ;-মহামতি মুসলমান-লেখকগণ ইহাকেই 'কাসেদ্' বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কাসেদের পরিচ্ছদ সভ্যতাবর্জিত নহে। সুধীর, সুগম্ভীর, সত্যবাদী, মিষ্টভাষী ও সুশ্রী না হইলে কাসেদ্-পদে কেহ বরিত হইতে পারিত না। তবে 'দূতে' ও 'কাসেদে' অতি সামান্য প্রভেদমাত্র; 'কাসেদ্' দূতের সমতুল্য মাননীয় নহে। বিশেষ মনোনীত করিয়াই আবদুল জাব্বারের নিকট কাসেদ্ প্রেরিত হইয়াছিল। আবদুল জাব্বার ভদ্রবংশসম্ভূত, অবস্থাও মন্দ নহে; স্বচ্ছন্দে ভদ্রতা রক্ষা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে পারিতেন; তজ্জন্য পরের স্বারস্থ হইতে হইত না; তাঁহার ধনলিপ্সা অত্যন্ত প্রবল ছিল। কিসে দশ টাকা উপার্জন করিবেন, কী উপায়ে নিজ অবস্থার উন্নতি করিবেন, কী কৌশলে ঐশ্বর্যশালী হইয়া অপেক্ষাকৃত অধিকতর সুখস্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিবেন, এই চিন্তাই সর্বদা তাঁহার মনে জাগরূক ছিল। তাহার একমাত্র স্ত্রী জয়নাব, স্বামীর অবস্থাতেই পরিতৃপ্তা ছিলেন, কোন বিষয়েই তাঁহার উচ্চ আশা ছিল না। যে অবস্থাতেই হউক, সতীত্বধর্ম পালন করিয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করাই তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। ধর্মচিন্তাতেও তিনি উদাসীন ছিলেন না। আবদুল জাব্বার সুশ্রী পুরুষ না হইলেও তাঁহার প্রতি তিনি ভক্তিমতী ছিলেন। স্বামীপদসেবা করাই স্বর্গলাভের সুপ্রশস্ত পথ, তাহা তাঁহার হৃদয়ে সর্বদা জাগরূক ছিল। লৌকিক সুখে তিনি সুখী হইতে ইচ্ছা করিতেন না, ভালবাসিতেন না। ভ্রমেও ধর্মপথ হইতে এক পদ বিচলিত হইতেন না। আবদুল জাব্বার নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া সময়ে সময়ে এজিদের ঐশ্বর্য ও এজিদের রূপলাবণ্য ব্যাখ্যা করিতেন। তাহাতে সতীসাধ্বী জয়নাব মনে মনে নিতান্তই ক্ষুন্ন হইতেন। নিতান্ত অসহ্য হইলে বলিতেন, ঈশ্বর যে অবস্থায় যাহাকে রাখিয়াছেন, তাহাতেই পরিতৃপ্ত হইয়া কায়মনে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা কর্তব্য। পরের ধন, রূপ, দেখিয়া নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দেওয়া বুদ্ধিমানের কর্তব্য নহে। দেখুন! জগতে কত লোক আপনার অপেক্ষা দুঃখী ও পরপ্রত্যাশী আছে যে, তাহার গণনা করা যায় না। ঈশ্বরের বিবেচনা অসীম। মানুষের সাধ্য কি যে, তাঁহার বিচার এবং

বিবেচনায় দোষার্পণ করিতে পারে। তবে অজ্ঞ মনুষ্যগণ না বুঝিয়া অনেক বিষয়ে তাঁহার কৃতকার্যের প্রতি দোষারোপ করে। কিন্তু তিনি এমনি মহান্‌, এমনি বিবেচক, যাহার যাহা সম্ভবে, যে যাহা রক্ষা করিতে পারিবে, তিনি তাহাকে তাহাই দিয়াছেন। তাঁহার বিবেচনায় তিনি কাহাকেও কোন বিষয়ে বঞ্চিত করেন নাই। কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহার গুণানুবাদ করাই আমাদের কর্তব্য।

স্ত্রীর কথায় আবদুল জাব্বার কোন উত্তর করিতেন না, কিন্তু কথাগুলি বড় ভাল বোধ হইত না। তাঁহার মত এই যে, ধনসম্পত্তিশালী না হইলে জগতে সুখী হওয়া যাইতে পারে না; সুতরাং তিনি সর্বদাই অর্থচিন্তায় ব্যস্ত থাকিতেন; ব্যবসায় বাণিজ্য যখন যাহা সুবিধা মনে করিতেন, তখন তাহাই অবলম্বন করিতেন; নিকটস্থ বাজারে অন্যান্য ব্যবসায়িগণের নিকট প্রায় সর্বদা উপস্থিত থাকিয়া অর্থোপার্জনের পথ অনুসন্ধান করিতেন। কেবল আহারের সময় বাটী আসিতেন। আহার করিয়া পুনরায় কার্যস্থানে গমন করিতেন। আজ জয়নাব স্বামীর আহারীয় আয়োজনে ব্যস্ত হইয়া শীঘ্র শীঘ্র রন্ধনকার্য সমাধা করিলেন এবং স্বামী-সম্মুখে ভোজ্যবস্তু প্রদান করিয়া স্বহস্তে বায়ু ব্যজন করিতে লাগিলেন। স্বামী যাহাতে সুখে আহার করিতে পারেন, সে পক্ষে সেই সাধ্বী-সতী পরম যত্নবতী। একে উত্তপ্ত প্রদেশ, তাহাতে জ্বলন্ত অনলের উত্তাপ, এই উভয় তাপে জয়নাবের মুখখানি আরক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে। ললাটে আর কপালে ঘর্মধারা ধরিতেছে না। ললাটে এবং নাসিকার অগ্রভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুক্তার ন্যায় ঘর্মবিন্দু শোভা পাইতেছে। গণ্ডদেশ বহিয়া বুকের বসন পর্যন্ত ভিজিয়া গিয়াছে। পৃষ্ঠবসনের তো কথাই নাই; এত ভিজিয়াছে যে, সেই সিক্তবাস ভেদ করিয়া পৃষ্ঠদেশের সুদৃশ্য কান্তি ফুটিয়া বাহির হইতেছে। পরিহিত বস্ত্রের স্থানে স্থানে কালির চিহ্ন; -হস্তে ও মুখে নানাপ্রকার ভস্মের চিহ্ন। এই সকল দেখিয়া আবদুল জাব্বার বলিলেন, "তুমি যে বল, ঈশ্বর যে অবস্থায় রাখেন, সেই অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়; কিন্তু তোমার এ অবস্থা দেখিয়া আমি কি প্রকারে সন্তুষ্ট থাকিতে পারি বল দেখি! আমি যদি ধনবান্‌ হইতাম, আমার যদি কিছু অর্থের সংস্থান থাকিত, তাহা হইলে তোমার এত কষ্ট

কখনোই হইত না। স্থানবিশেষে, পাত্রবিশেষে ঈশ্বরের বিবেচনা নাই, এইটিই বড় দুঃখের বিষয়। তোমার এই শরীর কি আগুনের উত্তাপ সহনের যোগ্য? এই শরীরে কি এত পরিশ্রম সহ্য হয়? দেখ দেখি, এই দর্পণখানিতে মুখখানি একবার দেখ দেখি, কিরূপ দেখাইতেছে!"

আবদুল জাব্বার এই কথা বলিয়া বামহস্তে একখানি দর্পণ লইয়া স্ত্রীর মুখের কাছে ধরিলেন। জয়নাব তপ্রতি ল্য না করিয়া দর্পণখানি গ্রহণপূর্বক উপবেশনস্থানের এক পার্শ্বে রাখিয়া দিলেন। গম্ভীর বদনে বলিলেন, "স্ত্রীলোকের কার্য কী?"

আবদুল জাব্বার বলিলেন, "তাহা আমি জানি। আমার অবস্থা ভাল হইলে আমি অসংখ্য দাস-দাসী রাখিয়া দিতাম; তাহারাই সকল কার্য করিত। তোমাকে এত পরিশ্রম, এত কষ্ট কখনোই সহ্য করিতে হইত না।"

জয়নাব বলিলেন, "আপনি যাহাই বলুন, আমি তাহাতে সুখী হইতাম না। আপনি বোধ হয় স্থির করিয়াছেন যে, যাহাদের অনেক দাস-দাসী আছে, মণিমুক্তার অলঙ্কার আছে, বহুমূল্য বস্ত্রাদি আছে, তাহারাই জগতে সুখী; তাহা মনে করিবেন না, মনের সুখই যথার্থ সুখ।"

আবদুল জাব্বার বলিলেন, "ও কোন কথাই নহে। টাকা থাকিলে সুখের অভাব কী? আমি এজিদের ন্যায় ঐশ্বর্যশালী হইতাম, তোমাকে কত সুখে রাখিতাম, তাহা আমি জানি, আর আমার মনই জানে। ঈশ্বর টাকা দেন নাই, কী করিব, মনের সাধ মনেই রহিয়া গেল।"

গম্ভীরবদনে জয়নাব কহিলেন, "ও-কথা বলিবেন না। শাহজাদা এজিদের ন্যায় আপনি ক্ষমতাবান্ বা ধনবান্ হইলে আমার ন্যায় কুশ্রী স্ত্রীর প্রতি আপনার ভালবাসা জন্মিত না। আপনারই নয়ন আমাকে দেখিয়া ঘৃণা করিত। ঈশ্বরের সৃষ্টি অতি বিচিত্র! কাহাকেও তিনি সীমাবিশিষ্ট করিয়া রূপবতী করেন নাই। উচ্চাসনে বসিলে আপনার মন সেইরূপ উচ্চরূপেই মোহিত হইত। অবস্থার পরিবর্তনে মানুষের মনের পরীক্ষা হয়।"

"অবস্থার পরিবর্তন হইলেই কি প্রণয়, মমতা, ভদ্রতা ও সুহৃদ ভাবের পরিবর্তন হয়?"

"হীন অবস্থার পরিবর্তনে অবশ্যই কিছু পরিবর্তন হয়,-কিছু কেন? প্রায়ই পরিবর্তন হইয়া থাকে। চারিদিকে চাহিলেই অনেক দেখিতে পাইবেন। যাহারা ধনপিপাসু, অর্থকেই যাহারা ইহকাল-পরকালের সুখসাধন মনে করে, তাহারা অর্থলোভে অতি জঘন্য কার্য করিতে একটুও চিন্তা করে না, তাহারা অতি আদরের ও যত্নের ভালবাসা জিনিসটিও অর্থলোভে বিসর্জন দিতে কিছুমাত্র অপেক্ষা করে না।"

কিঞ্চি ক্ষুণ্ন হইয়া আবদুল জাব্বার কহিলেন, "এ-কথাটা একপ্রকার আমাতেই বর্তিল। তুমি যাহাই বল, জগতের সমুদয় অর্থ, সমুদয় ঐশ্বর্য একত্র করিয়া আমার সম্মুখে রাখিলেও আমি আমার ভালবাসাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না। সকলেরই মূল্য আছে, ভালবাসার মূল্য নাই। যখন মূল্য নাই, তখন আর তাহার সঙ্গে অন্য বস্তুর তুলনা কি, কথাই-বা কি?"

আবদুল জাব্বারের আহার শেষ হইল। রীতিমত হস্তমুখাদি প্রক্ষালন করিয়া ব্যবসায়ের হিসাবপত্রাদি লইতে তিনি ব্যতিব্যস্ত হইলেন। যেখানে যাহা রাখিয়াছেন, একে একে সংগ্রহ করিলেন। ব্যবসায়ের সাহায্যকারী অথচ নিকট-আত্মীয় ওস্মানের নাম করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "এখনো আসিল না। আজ অনেক অসুবিধা হইবে। আর কতক্ষণ বিলম্ব করিব?" এই কথা বলিয়াই বাটী হইতে যাত্রা করিলেন, এমন সময়ে ওস্‌মান অতি ব্যস্তভাবে আসিয়া বলিলেন, "আবদুল জাব্বার! দামেস্ক হইতে একজন কাসেদ্ আসিয়াছে-অত্যন্ত ব্যস্ত, অতিশয় পরিশ্রান্ত, অতিশয় ক্লান্ত। সেই লোক তোমাকেই অন্বেষণ করে। তোমার বাসস্থানের অনুসন্ধান না পাইয়া অনেক ঘুরিয়াছে। শুনিলাম, তাহার নিকট দামেস্কাধিপতির আদেশপত্র আছে।"

ওস্‌মানের মুখে এই কথা শুনিয়া আবদুল জাব্বার শশব্যস্তে বাটীর বাহিরে আসিলেন। কাসেদ্‌ ঈশ্বরের গুণানুবাদ করিয়া দামেস্কাধিপতির বন্দনার পর অতি বিনীতভাবে আবদুল জাব্বারের হস্তে শাহীনামা প্রদান করিলেন।

আবদুল জাব্বার শত শত বার সেই শাহীনামা চুম্বন ও মস্তকোপরি ধারণ করিয়া কাসেদের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিলেন। অনন্তর শাহীনামাহস্তেই অন্তঃপুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া বিশেষ ভক্তিসহকারে শাহীনামাখানি পাঠ করিলেন। তাহাতে লিখিত আছে-

"সম্ভ্রান্ত আবদুল জাব্বার!

তোমাকে জানান যাইতেছে যে, দামেস্কাধিপতি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে স্মরণ করিয়াছেন। অবিলম্বে রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া রাজপ্রসাদলাভে সৌভাগ্য জ্ঞান কর।

প্রধান উজির-
মারওয়ান।"

আবদুল জাব্বার এতৎপাঠে মহাসৌভাগ্য জ্ঞান করিয়া জয়নাবকে কহিলেন, "আমি এখনই দামেস্কনগরে যাত্রা করিব। আমি এমন কী পুণ্য কার্য করিয়াছি যে, স্বয়ং বাদশাহ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। ঈশ্বর জানেন, ভবিষ্যতে কী আছে।"

আবদুল জাব্বারের এই সংবাদ শ্রবণে প্রতিবেশীরা সকলেই আশ্চর্যান্বিত হইলেন। আবদুল জাব্বারের মহাসৌভাগ্য! সকলেই শাহীনামা মহামান্যে মস্তকোপরি রাখিয়া দামেস্ক-সিংহাসনের গৌরব রক্ষা করিলেন। সকলেই একবাক্যে আবদুল জাব্বারের গুণানুবাদ করিয়া কহিলেন, "আবদুল জাব্বারের কপাল ফিরিল।" সমবয়সীরা বলিতে লাগিল, "ভাই! তুমি তো ভাগ্যগুণে বাদশাহের নিকট পরিচিত হইলে। সম্মানের সহিত রাজদরবারেও আহূত হইলে। আমাদের কথা মনে রাখিয়ো।"

আবদুল জাব্বার ব্যতিব্যস্ত হইয়া রাজধানী গমনের উদ্যোগী হইলেন। আত্মীয়-স্বজন এবং সাধারণ প্রতিবেশীগণের নিকট ও জয়নাবের সমক্ষে বিনয়নম্রভাবে বিদায় গ্রহণ করিলেন। শাহীদরবারে গমন-উপযোগী যে সকল বসন তাঁহার ছিল, তৎসমস্ত সংগ্রহ করিয়া বাহক-বাহন সমভিব্যাহারে দামেস্কনগরাভিমুখে গমনার্থ প্রস্তুত হইলেন। প্রতিবেশীবর্গ সহাস্য বদনে তাঁহার প্রশংসাগান কীর্তন করিতে করিতে স্ব স্ব আবাসে চলিয়া গেলেন। জয়নাবের চক্ষু দুটি বাষ্প-সলিলে পরিপূর্ণ হইল। মনের উল্লাসে আবদুল জাব্বার তৎকালে এতদূর বিহ্বল হইয়াছিলেন যে, যাত্রাকালে প্রিয়তমা জয়নাবকে একটিও মনের কথা বলিয়া যাইতে মনে হইল না। সামান্যতঃ বিদায় গ্রহণ করিয়াই ত্বরিতগতিতে রাজদর্শনে যাত্রা করিলেন। পদমর্যাদার এমনই কুহক!

তৃতীয় প্রবাহ

এজিদের শিরায় শিরায়, শোণিতবিন্দুর প্রতি পরমাণু অংশে, প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে, শয়নে-স্বপ্নে, জয়নাব লাভের চিন্তা অন্তরে অবিচলিতভাবে রহিয়াছে। কিন্তু সে চিন্তার উপরেও আর একটি চিন্তা শুদ্ধ মস্তিষ্ক মধ্যে ঘুরিতেছে। এক সময়ে এক মনে দুই প্রকারের চিন্তা অসম্ভব। কিন্তু মূল চিন্তার কৃতকার্যতা লাভের আশায় অন্য একটি চিন্তা বা কল্পনা আশ্রয় করিয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হওয়া যায়, এরূপ নহে। প্রথম চিন্তায় কৃতকার্য হইবার আশাতেই বাহ্যিক চিন্তাই প্রবল হইয়া উঠে। চিন্তার আধার মস্তক; কিন্তু ভালবাসার চিন্তাটুকু মস্তকে উদিত হইয়াই একেবারে হৃদয়ের অন্তঃস্থান অধিকার করিয়া বসে। তাহা যখনই মনে উদয় হয়, অন্তরে ব্যথা লাগে, হৃৎপিণ্ডে আঘাত হয়। হৃদয়তন্ত্রী বেহাগ-রাগে বাজিয়া উঠে। এজিদ্ আপাততঃ বাহ্যচিন্তাতেই মহাব্যস্ত। কারণ এই চিন্তার মধ্যে আশা, ভরসা, নিরাশা, সকলই রহিয়াছে। কাজেই পূর্বভাবের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন বোধ হইতেছে। এজিদের নয়নে, ললাটে ও মুখশ্রীতে যেন ভিন্ন ভাব সমঙ্কিত। দেখিলেই বোধহয় কোন দগ্ধীভূত বিকৃত ধাতুর উপরে কিঞ্চিৎ রজতের পাকা গিল্টী হইয়াছে। হঠাৎ দেখিলে চাকচিক্যবিশিষ্ট রজতপাত্র বলিয়াই

ভ্রম জন্মে। কিন্তু মনোনিবেশ করিয়া লক্ষ্য করিলে সমাবৃত বিকৃত ধাতুর পরমাণু অংশ নয়নগোচর হইয়া চাকিচক্যবিশিষ্ট উজ্জ্বলভাবে যেন বহুদূরে সরিয়া যায়। পুরবাসিগণ এবং অমাত্যগণ সকলেই রাজপুত্রের তাদৃশ বাহ্যিক প্রসন্ন ভাব দর্শন করিয়া মহা আনন্দিত হইলেন।

মারওয়ান্ যদিও প্রধানমন্ত্রী ছিলেন না, কিন্তু এজিদের বুদ্ধি, বল, সহায়, সাহস যত কিছু কার্য সকলই মারওয়ান্। প্রধানমন্ত্রী হামান কেবল রাজকার্য ব্যতীত সাংসারিক অন্য কোন কার্যে মারওয়ানের মতে বাধা দিতে পারিতেন না; কারণ তিনি এজিদের প্রিয়পাত্র। সকল সময়েই সকল বিষয়েই মারওয়ানের সহিত এজিদের পরামর্শ হইত। সে পরামর্শের সময় অসময় ছিল না। কি পরামর্শ তাহা তাঁহারাই জানিতেন।

মারওয়ান বলিলেন, "রাজকুমার! মহারাজ বর্তমান না থাকিলে আপনাকে কখনোই এত কষ্ট পাইতে হইত না।"

এজিদ্ বলিলেন, "পুত্রের স্বাধীনতা কোথায়? কী করি, পিতা বর্তমানে পিতার অমতে কোন কার্যে অগ্রসর হওয়া পুত্রের পক্ষে অনুচিত। আমি হাসান-হোসেনের ভক্ত নহি শাহজাদা বলিয়া মান্য করি না, তাহাদের আনুগত্য স্বীকার করি না; নতশিরে তাহাদের নামে দণ্ডব করি না; সেইজন্যই পিতা মহাবিরক্ত। আবার অন্যায় বিচারে একজনের প্রাণবধ করিয়া স্বার্থসিদ্ধি করিতে সাহস হয় না, ইচ্ছাও করে না। লোকাপবাদ-তাহার পর পরকালের দণ্ড। আর কেন? মহারাজ যে একটু ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহাতেই তো মনস্কামনা সিদ্ধি-আর চাই কী? ধর্মবিরুদ্ধ না হইলে কোন কার্যে বাধা দিবেন না; ইহাই যথেষ্ট। যে মন্ত্রণা করিয়া কার্য আরম্ভ করা হইয়াছে, যদি কৃতকার্য হইতে পারি, তবে আর অন্য পথে যাইবার আবশ্যক কী? একটা গুরুতর পাপভার মাথায় বহন করিবারই বা প্রয়োজন কী? নরহত্যা মহাপাপ।"

হঠা সাদিয়ানা বাদ্য বাজিয়া উঠিল। এজিদ্ কহিলেন, "অসময়ে আনন্দ-বাদ্য কী জন্য? বুঝি আবদুল জাব্বার আসিয়া থাকিবে।" উভয়ে একটু ত্রস্তভাবে দরবার-অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। রাজকর্মচারিগণের প্রতি যে যে প্রকার আদেশ করিয়াছিলেন, তসমস্তই প্রতিপালিত হইয়াছে। কোন বিষয়ে বিশৃঙ্খলা হয় নাই। দরবার পর্যন্ত গমনপথে শ্রেণীবদ্ধ সৈন্যগণ এখনো পর্যন্ত যথাস্থানে দণ্ডায়মান। তদ্দর্শনে তাঁহারা আরো অধিকতর উসাহে দ্রুতগতিতে গমন করিতে লাগিলেন। পথে কাসেদের সহিত দেখা হইল। কাসেদ্ সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া নিবেদন করিলেন, "রাজাদেশ প্রতিপালিত হইয়াছে। আবদুল জাব্বার সমাদরে গৃহীত হইয়াছেন। মহারাজ আম-দরবার বরখাস্ত করিয়া আবদুল জাব্বারের সহিত খোশমহলে বার দিয়াছেন।" এই কথা বলিয়া কাসেদ্ পুনরায় অভিবাদন পূর্বক যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন।

এজিদ্ মারওয়ানের সহিত আনন্দমহলে উপস্থিত হইয়া মহারাজকে অভিবাদন করিলেন এবং রাজাজ্ঞাপ্রাপ্তিক্রমে নির্দিষ্ট স্থানে উপবেশন করিয়া আবদুল জাব্বারের সহিত মহারাজের কথোপকথন শুনিবার অপেক্ষায় উসুক রহিলেন।

আবদুল জাব্বার বিশেষ সতর্কতার সহিত জাতীয় সভ্যতা রক্ষা করিয়া করজোড়ে মহারাজ-সমীপে বসিয়া আছেন। পুত্রের পরামর্শমত এজিদের জননী স্বামীর নিকট যাহা বলিয়াছিলেন, যে প্রকার কথার প্রস্তাব করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন, মাবিয়া অবিকল সেইরূপ বলিতে লাগিলেন, "আবদুল জাব্বার! আমার ইচ্ছা তোমাকে আমি সর্বদা আমার নিকট রাখি। কোন প্রকার রাজকার্যে নিযুক্ত রাখিতে ইচ্ছা করি না। কারণ তাহাতে সময়ে সময়ে নানাপ্রকার চিন্তায় চিন্তিত হইতে হইবে। মন্ত্রিদলের আজ্ঞানুবর্তী হইতে হইবে। অথচ রাজনীতি অনুসারে কোন প্রকারে পদমর্যাদা রক্ষা করা তোমার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিবে। কাজেই সকলের নিকট হাস্যাস্পদ হওয়ারই সম্ভাবনা। আমার ইচ্ছা যে, তোমাকে নিশ্চিন্তভাবে রাজপরিবারের মধ্যে রাখিয়া দিই।"

করজোড়ে আবদুল জাব্বার বলিলেন, "আমি দাসানুদাস আজ্ঞাবহ ভৃত্য। যাহা আদেশ করিবেন, শিরোধার্য করিয়া প্রতিপালন করিব। আমার নিতান্ত সৌভাগ্য যে, আমি আমার আশার অতিরিক্ত আদৃত হইয়া রাজসমীপে উপবেশনের স্থান পাইয়াছি।"

মাবিয়া বলিলেন, "আবদুল জাব্বার! আমার মনোগত অভিপ্রায় প্রধান উজির মারওয়ানের মুখে শ্রবণ করিয়া তোমার প্রতিজ্ঞা পালন কর। আমার উপাসনার সময় অতীত প্রায়, আমি আজিকার মত বিদায় হইলাম।"

এই কথা বলিয়া মাবিয়া খোশমহল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

মন্ত্রী মারওয়ান্ বাদশাহের প্রতিনিধিস্বরূপ বলিতে লাগিলেন, "মাননীয় আবদুল জাব্বার সাহেব! আমাদের ইচ্ছা ছিল যে, রাজসংসার হইতে রাজোচিত আপনার নিত্য নিয়মিত ব্যয়োপযোগী সম্পত্তি প্রদানপূর্বক অদ্বিতীয় রূপযৌবনসম্পন্না বহুগুণবতী নিষ্কলঙ্কচন্দ্রাননা মহামাননীয়া-রাজকুমারী সালেহার সহিত শাস্ত্রসঙ্গত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিয়া এই দামেস্কনগরে আপনাকে স্থায়ী করি। ইহাতে আপনার মত কি?"

কর্ণে এই কথা প্রবেশ করিবামাত্র আবদুল জাব্বার মনের আনন্দে বিভ্রান্ত হইয়া কিছুই উত্তর করিতে পারিলেন না। এজিদের ভগ্নী সালেহার পাণিগ্রহণ করিবেন, স্বাধীনভাবে ব্যয়বিধান জন্য সম্পত্তিও প্রাপ্ত হইবেন, ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি আছে? জীবনে যাহা তিনি আশা করেন নাই, স্বপ্ন যে অমূলক চিন্তা, স্বপ্নেও কোন দিন যাহা উপদেশ পান নাই, অভাবনীয়রূপে আজ তাহাই তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল? ঈশ্বর সকলই করিতে পারেন। মন্ত্রীমুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আবদুল জাব্বার যেন ক্ষণকালের জন্য আত্মহারা হইলেন! তখনই সম্মতিসূচক অভিপ্রায় জানাইতেন, কিন্তু হর্ষবিহ্বলতা আশু তাঁহার বাক্‌শক্তি হরণ করিল। ক্ষণকাল পরে বলিলেন, "মন্ত্রীবর। আমার পরম সৌভাগ্য! রাজাদেশ শিরোধার্য।"

www.MurchOna.com

মারওয়ান্ বলিলেন, "আপনার অঙ্গীকারে আমরাও পরমানন্দ লাভ করিলাম; সমস্তই প্রস্তুত, এখনই এই সভায় এই শুভলগ্নে শুভকার্য সুসম্পন্ন হউক।"

পূর্ব হইতেই এজিদ্ সমস্ত প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। মারওয়ান্কে ইঙ্গিত করিবামাত্র পুরোহিত, অমাত্যবর্গ, পরিজনবর্গ সকলেই একসঙ্গে উপস্থিত হইলেন। মঙ্গলবাদ্য বাজিতে লাগিল। পুরোহিতের আদেশ মত এজিদ্ পাত্রীপক্ষের প্রতিনিধি সাব্যস্ত হইলেন; মারওয়ান্ এবং আবদুর রহমান সাক্ষী হইলেন।

এই স্থানে হিন্দুপাঠকগণের নিকট কিছু বলিবার আছে। আমাদের বিবাহ প্রথা একটু সংক্ষেপে বুঝাইয়া না দিলে এ উপস্থিত বিবাহ বিষয় বুঝিতে একটু আয়াস আবশ্যক হইবে। আমাদের বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত পাত্রপক্ষীয় কোন পুরুষ কি স্ত্রীর পাত্রীকে দেখিবার প্রথা নাই। (এটা আরবীয় প্রথা হতে পারে, তবে মুসলমানদের প্রথা নয়। ইসলামে বিবাহের আগে শুধু পাত্র পাত্রীকে দেখিতে পারে-সংকলক)

পাত্র পূর্ণবয়স্ক হইলে পুরোহিতের উপদেশক্রমে যে দেশে হউক না, কয়েকটি কথা আরবীয় ভাষায় উচ্চারণ করিতে হয়। পাত্রীপক্ষীয় অভিভাবকগণের মনোনীত প্রতিনিধিকে পাত্রের সেই কথাগুলির প্রত্যুত্তরস্বরূপ কয়েকটি কথা বলিতে হয়। বিবাহের মূল কথাই এই যে, প্রস্তাব আর স্বীকার (ইজাব কবুল)। পাত্রী যে বিবাহে সম্মত হইয়াছেন, তাহার প্রমাণস্বরূপ দুইটি সাক্ষীর প্রয়োজন। তদ্ভিন্ন আমাদের বিবাহে অন্য কোন প্রকার ধর্মার্চনা, কি মন্ত্রপাঠ, কি অন্য কোন প্রকার ক্রিয়া কিছুই নাই। তবে লৌকিক প্রথানুসারে ধর্মভাবে শিথিলযত্ন ব্যক্তিগণ, কি কেহ আমাদের ধর্মের অঙ্গ মনে করিয়া যে কিছু অনুষ্ঠান করেন তাহা শাস্ত্রসম্মত নহে। তাহা না করিলেও বিবাহ-বন্ধনে সুদৃঢ় গ্রন্থি শিথিল হয় না; নিয়ম লঙ্ঘনদোষে কোন প্রকার অমঙ্গলভয়েও কোনও পক্ষকে ভয়াতুর হইতে হয় না।

প্রস্তাব বাহুল্যভয়ে তদ্বিষয়ে আর অধিক আড়ম্বর নিষ্প্রয়োজন বোধ হইল। তবে একটি স্থূল কথা, 'দেনমোহর'। অধুনা যে প্রকার লক্ষ লক্ষ টাকার দেনমোহর প্রথা ভারতবর্ষের মুসলমানসমাজে প্রচলিত হইয়াছে, যে প্রথানুসারে স্বামীর যথাসর্বস্ব কন্যার কোক্ষগত করিয়া স্বামীকে পথের ভিখারী করা হইতেছে, তাহা বড় ভয়ঙ্কর। বৃটিশ-বিধিও এই ধর্মসংক্রান্ত ও শাস্ত্রসঙ্গত। কেবলমাত্র স্বীকার-উক্তি ধনে যথার্থ টাকার দায়িত্ব স্বীকারের ন্যায় স্বামীকে দায়ী করিয়া তাহার পৈতৃক সম্পত্তি, আবাসভূমি বিক্রয়, পরিশেষে দেহ পর্যন্ত বন্দিশ্রেণীর সহিত কারাগারে আবদ্ধ করিয়া যথেচ্ছ ব্যবহার করিতেছেন; ইহা নিতান্ত আক্ষেপের বিষয়! আমাদেরও দোষ যে না আছে, এরূপ নহে। আপন আপন দুহিতার ভবিষ্য হিতকামনায় আমরা ক্রমে 'মোহরাণার' সংখ্যা দিন দিন এত বৃদ্ধি করিতেছি। যাহারা ঐহিক পারত্রিক উভয় রাজ্যের রাজা, সেই প্রভু মহম্মদের পরিবারগণের মধ্যে মোহরাণার সংখ্যা এত অল্প ছিল যে, পাঠকগণ শুনিয়া আশ্চর্যান্বিত হইবেন। প্রভু মোহাম্মদের কন্যা হাসান হোসেনের জননী বিবি ফাতেমার দেনমোহর আধুনিক পরিমাণ মুদ্রার হিসাব অনুসারে চারি টাকা চারি আনার বেশি ছিল না।

পাত্রীর সম্মতিসূচক স্বীকারবাক্য স্বকর্ণে শ্রবণ করিবার জন্য প্রতিনিধি মহাশয় সাক্ষীসহ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহারা সভায় প্রত্যাগত হইয়া জাতীয় রীত্যনুসারে সভাস্থ সভ্যগণকে অভিবাদনপূর্বক কহিলেন, "বিবি সালেহা এ বিষয়ে অসম্মত নহেন; কিন্তু তাঁহার একটি কথা আছে। সে কথা এই যে, তিনি পরম্পরায় শুনিয়াছেন, এই মাননীয় সম্ভ্রান্ত আবদুল জাব্বার সাহেবের জয়নাব নামে আর একটি স্ত্রী আছেন, ধর্মশাস্ত্রানুসারে জয়নাবকে না পরিত্যাগ করিলে তিনি এ বিবাহে সম্মতিদান করিতে পারেন না।" আরো তিনি বলিলেন, "জয়নাবের কত দেহমোহরের জন্য আবদুল জাব্বার দায়ী তাহার পরিমাণ তিনি জানিতে চাহেন না, তদতিরিক্ত জয়নাবের ভরণপোষণের জন্য আরো সহস্র মুদ্রা প্রদানে তিনি প্রস্তুত আছেন।" এই প্রস্তাবে হয়ত অনেকেরই মস্তক ঘুরিয়া যাইত, চিন্তাশক্তির পরীক্ষা হইত, আন্তরিক ভাবেরও পরীক্ষা হইত, কিন্তু আবদুল জাব্বারের

বিবেচনাশক্তি এতদূর প্রবল যে, অগ্রপশ্চা ভাবিবার জন্য তাঁহার চিন্তাশক্তিকে ক্ষণকালের নিমিত্ত বিচলিত করিলেন না;

যেমনি প্রশ্ন তেমিন উত্তর। আবদুল জাব্বার বলিলেন, "আমি সম্মত আছি। মুখের কথা কেন, তালাকনামা (স্ত্রী পরিত্যাগ পত্র) এখনই লিখিয়া দিতেছি।"

লেখনী ও কাগজ সকলই প্রস্তুত ছিল, আবদুল জাব্বার প্রথমে পরমেশ্বরের নাম, পরে প্রভু মোহাম্মদের নাম লিখিয়া পতিপরায়ণা নিরপরাধিনী সাধ্বী সহধর্মিণী জয়নাবকে তালাক দিলেন। সভাস্থ অনেক মহোদয় সাক্ষী শ্রেণীতে স্ব-স্ব নাম-ধাম স্বাক্ষর করিলেন। প্রতিনিধির হস্ত দিয়া সেই তালাকনামাখানি সালেহার নিকট প্রেরিত হইল। জয়নাবের অনুমানবাক্য সফল হইল। প্রতিনিধি পুনরায় সাক্ষীসহ অন্তঃপুরে গমন করিলেন। সভাস্থ সকলেই প্রফুল্লচিত্তে সুস্থির হইয়া বসিলেন। নূতন রাগে, নূতন তালে, আনন্দবাদ্য বাজিতে লাগিল। বিবাহসভা সম্পূর্ণরূপেই আনন্দময়ী। আবদুল জাব্বারের ভবনে জয়নাবের হৃদয়তন্ত্রী ছিঁড়িয়া গেল। জলপূর্ণ আঁখি দুটি বোধ হয় জলভারে ডুবিল। আবদুল জাব্বার প্রত্যুত্তর অবধি তালাকনামা লিখিয়া প্রতিনিধির হস্তে অর্পণ করা পর্যন্ত জয়নাবের মুখশ্রীর ও তাঁহার অজ্ঞাত বিপদবিষয়ে চিত্তচাঞ্চল্যের প্রকৃতছবি প্রকৃতরূপেই চিত্র করিয়া পাঠকগণকে দেখাইতে পারিলাম না। কারণ তাহা কল্পনাশক্তির অতীত, মসীলেখনীর শক্তি-বহির্ভূত।

প্রতিনিধি ফিরিয়া আসিলেন। পূর্ব রীত্যনুসারে সভাস্থ সকলকেই পুনরাভিবাদন করিয়া বলিলেন,- "এ সভায় রাজমন্ত্রী, রাজসভাসদ, রাজপরিষদ, রাজাত্মীয়, রাজহিতৈষী, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ এবং বহুদর্শী ব্যক্তিগণ সকলেই উপস্থিত আছেন। সালেহা বিবি যাহা বলিলেন, ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া আমি তাহা অবিকল বলিতেছি, আপনারা মনোযোগপূর্বক শ্রবণ করুন।-

'যে ব্যক্তি ধনলোভে কী রাজ্যলোভে, কী মানসম্ভ্রম বৃদ্ধির আশয়ে নিরপরাধিনী সহধর্মিণীকে পরিত্যাগ করিতে পারে, বহুকালের প্রণয় ও ভালবাসা যে ব্যক্তি এক মুহূর্তে ভুলিতে পারে,

অগ্রপশ্চা বিবেচনা না করিয়া যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ দাম্পত্য প্রণয়ের বন্ধন-রজ্জু অকাতরে ছিন্ন করিতে পারে, তাহাকে বিশ্বাস কী? তাহার কথায় আস্থা কী? তাহার মায়ায় আশা কী? এমন বিশ্বাসঘাতক স্ত্রীবিনাশক অর্থলোভী নরপিশাচের পাণিগ্রহণ করিতে সালেহা বিবি সম্মত নহেন।'''

সভাস্থ সকলেই রাজকুমারীর বুদ্ধি ও বিবেচনার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আবদুল জাব্বারের মস্তকে যেন সহস্র অশনির সহিত আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁহার আকাশ-কুসুমের আমূল চিন্তাবৃটি এককালে নির্মূল হইয়া গেল। প্রতিনিধির বাক্য-বজ্রাঘাতে সুখ-স্বপ্ন-তরু দগ্ধীভূত হইল, পরিচারকগণ রাজকুমারীর অঙ্গীকৃত অর্থ আবদুল জাব্বারের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল। আবদুল জাব্বার তাহা গ্রহণ করিলেন না, কাহাকেও কিছু না বলিয়া সভাভঙ্গের গোলযোগে রাজভবন হইতে বহির্গত হইয়া রাজদত্ত পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিলেন এবং ফকিরের বেশ ধারণ করিয়া বনে বনে, নগরে নগরে, বেড়াইতে লাগিলেন; গৃহে আর প্রতিগমন করিলেন না।

কথা গোপন থাকিবার নহে। আবদুল জাব্বারের সঙ্গীরা ফিরিয়া যাইবার পূর্বেই তাঁহার আবাসপল্লীতে উক্ত ঘটনা রাষ্ট্র হইয়াছিল। মূল কথাগুলি নানা অলঙ্কারে বর্ধিত-কলেবর হইয়া বাতাসের অগ্রে অগ্রে ছুটিয়া জয়নাবকে এবং প্রতিবেশিগণকে মহা দুঃখিত করিয়াছিল। তখন পর্যন্তও নিশ্চিত সংবাদ কেহই পান নাই। অনেকেই বিশ্বাস করেন নাই। সেই অনেকের মধ্যে জয়নাবও একজন। আবদুল জাব্বারের সঙ্গিগণ বাটিতে ফিরিয়া আসিলে সন্দেহ দূর হইল। জয়নাবের আশা-তরী বিষাদ-সিন্ধুতে ডুবিয়া গেল। জয়নাব কাহাকেও কিছু বলিলেন না, কেবল তাঁহার পিতাকে সংবাদ দিয়া অতি মলিন-বেশে দুঃখিত হৃদয়ে পিত্রালয়ে গমন করিলেন।

চতুর্থ প্রবাহ

পথিক ঊর্দ্ধশ্বাসে চলিতেছেন, বিরাম নাই। মুহূর্তকালের জন্য বিশ্রাম নাই। এজিদ্ গোপনে বলিয়া দিয়াছেন, যখন নিতান্ত ক্লান্ত হইবে, চল-শক্তি রহিত হইবে, ক্ষুধা পিপাসায় কাতর হইয়া পড়িবে, সেই সময় একটু বিশ্রাম করিয়ো। কিন্তু বিশ্রামহেতু সময়টুকু অপব্যয় হইবে, বিশ্রামের পর দ্বিগুণ বেগে চলিয়া তাহা পরিপূর্ণ করিবে। পথিক এজিদের আজ্ঞা লঙ্ঘন না করিয়া অবিশ্রান্ত যাইতেছেন। একে মরুভূমি, তাহাতে প্রচণ্ড আতপতাপ, বিশেষ ছায়াশূন্য প্রান্তর,-বিশ্রাম করিবার স্থান অতি বিরল, দেশীয় পথিকের পক্ষে বরং সহজ, অপরিচিত ভিন্নদেশীয় পথিকের পক্ষে এই মরুস্থানে ভ্রমণ করা নিতান্তই দুঃসাধ্য। এ পথিক দেশীয় এবং পরিচিত। দামেস্ক হইতে যাত্রা করিয়াছেন। কোথায় কোন্ পর্বত, কোথায় কোন্ নির্ঝরিণীর জল পরিষ্কার ও পানোপযোগী তাহাও পূর্ব হইতে জানা আছে। পথিক একটি ক্ষুদ্র পর্বত লক্ষ্য করিয়া তদভিমুখে যাইতেছেন। কয়েকদিন পর্যন্ত অবিশ্রান্ত চলিয়া এক্ষণে অনেক দুর্বল হইয়া অতি কষ্টে যাইতেছেন। নির্দিষ্ট পর্বতের নিকটস্থ হইলে পূর্ব পরিচিত আক্কাস ও তসহ কয়েকজন অনুচরের সহিত দেখা হইল।

মোস্লেমকে দেখিয়া আক্কাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই মোস্লেম! কোথায় যাইতেছ?" মোস্লেম উত্তর করিলেন, "পিপাসায় বড়ই কাতর, অগ্রে পিপাসা-নিবৃত্তি করি, পরে আপনার কথার উত্তর দিতেছি।"

আক্কাস বলিলেন, "জল নিকটেই আছে। ঐ কয়েকটি খর্জুর বৃক্ষের নিকট দিয়া সুশীতল নির্ঝরিণী অতি মৃদু মৃদু ভাবে বহিয়া যাইতেছে। চল ঐ খর্জুর-বৃতলে বসিয়া সকলেই একটু বিশ্রাম করি, আমিও কয়েকদিন পর্যন্ত অত্যন্ত ক্লান্ত হইতেছি।"

সকলে একত্র হইয়া সেই নির্দিষ্ট খর্জুর-বৃতলে উপবেশন করিলেন। আক্কাস একখণ্ড প্রস্তর ভূমি হইতে উঠাইয়া, তত্তলস্থ ঝর্ণার সুস্নিগ্ধ জলে জলপাত্র পূর্ণ করিয়া এবং থলিয়া হইতে কতকগুলি খোঁমা বাহির করিয়া মোস্লেমের সম্মুখে রাখিয়া দিলেন। মোস্লেম প্রথমে

জলপান করিয়া কথঞ্চি সুস্থ হইলেন। দুই একটি খোঁমা মুখে দিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভাই আব্বাস! এজিদের বিবাহ-পয়গাম (প্রস্তাব) লইয়া আমি জয়নাবের ভবনে যাত্রা করিতেছি।"

আব্বাস বলিলেন, "সে কী! আবদুল জাব্বার কী মরিয়াছে?"

মোস্‌লেম বলিলেন, "না, আবদুল জাব্বার মরে নাই! জয়নাবকে তালাক দিয়াছে।"

আব্বাস বলিলেন, "আহা! এমন সুন্দরী স্ত্রীকে কী দোষে পরিত্যাগ করিল? জয়নাবের মত পতিপরায়ণা ধর্মশীলা পতিপ্রাণা নম্রস্বভাবা রমণী এ প্রদেশে অতি কমই দেখা যায়। আবদুল জাব্বারের প্রাণ এত কঠিন, ইহা তো আমি আগে জানিতাম না। কোন্ প্রাণে সোনার জয়নাবকে পথের ভিখারিণী করিয়া বিষাদ সমুদ্রে ভাসাইয়া দিয়াছে?"

মোস্‌লেম বলিল, "ভাই! ঈশ্বরের কার্য মনুষ্যবুদ্ধির অগোচর। তিনি কি উদ্দেশ্য সাধন করিতে যে কি করেন, কাহার মনের কী গতি, কী কারণে কোন্ কার্যসাধনে কোন্ সময়ে কী কৌশলে কী-রূপ করিয়া যে কোন কার্যের অনুষ্ঠান করেন, তাহা তিনিই জানেন। আমরা ভ্রমপূর্ণ অজ্ঞ মানব, আমাদের এই ক্ষুদ্র মস্তকে এই ক্ষুদ্র চিন্তায় সেই অনন্ত বিশ্বকৌশলীর বিচিত্র কৌশলের অণুমাত্র বুঝিবার ক্ষমতাও নাই, সাধ্যও নাই!"

আব্বাস জিজ্ঞাসিলেন, "কত দিন আবদুল জাব্বার জয়নাবকে পরিত্যাগ করিয়াছে?"

"অতি অল্প দিন মাত্র।"

"বোধ হয়, এখন ইদ্দত্ (শাস্ত্রসঙ্গত বৈধব্য ব্রত) সময় উত্তীর্ণ হয় নাই?"

"প্রস্তাবে তো আর কোন বাধা নাই। ইদ্দত্ সময় উত্তীর্ণ হইলেই শুভকার্য সম্পন্ন হইবে।"

"ভাই মোস্‌লেম! আমিও তোমাকে আমার পক্ষে উকীল নিযুক্ত করিলাম। জয়নাবের নিকট প্রথমে এজিদের প্রস্তাব, শেষে আমার প্রার্থনার বিষয়ও প্রকাশ করিয়ো। রাজভোগ পরিত্যাগ

ভাই! আশাতেই সংসার, আশাতেই সুখ এবং আশাতেই জীবন, আশা কাহারই কম নহে। আমার কথা ভুলিয়ো না। জয়নাব রূপলাবণ্যে দেশবিখ্যাত, পুরুষমাত্রেরই চক্ষু জয়নাবরূপে মোহিত; স্বভাব, চরিত্র, ধীরতা এবং নম্রতাগুণে জয়নাব সকলের নিকটেই সমাদৃত; তাহা আমি বেশ জানি। এ অবস্থাতেও বোধ হয় আমার আশা দুরাশা নহে। দেখ ভাই! ভুলিয়ো না-মনের অধিকারী ঈশ্বর। তিনি যে দিকে মন ফিরাইবেন, যেদিকে চালাইবেন, তাহা নিবারণ করিতে এজিদের রূপের ক্ষমতা নাই, অর্থেরও কোনও ক্ষমতা নাই, সেই ক্ষমতাতীদের নিকটে কোন ক্ষমতারই ক্ষমতা নাই। যাহাই হউক, আমার প্রার্থনা জয়নাবের নিকট অবশ্যই জানাইও; আমার মাথা খাও, ঈশ্বরের দোহাই, এ বিষয়ে অবহেলা করিয়ো না।"

এইরূপ কথোপকথনের পর পরস্পর অভিবাদন করিয়া উভয়ে ভিন্ন ভিন্ন পথে চলিয়া গেলেন। মোস্‌লেম কিছুদূর যাইয়া দেখিলেন, মাননীয় ইমাম হাসান সশস্ত্র মৃগয়ার্থ বহির্গত হইয়াছেন। ইমাম হাসান এক্ষণে স্বয়ং মদিনার সিংহাসনে বসিয়া শাহীমুকুট ধারণ করিয়াছেন; রাজ্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। মোস্‌লেমকে দূর হতে আগমন করিতে দেখিয়া তিনি আলিঙ্গনার্থে হস্ত প্রসারণ করিলেন। মোস্‌লেম পদানত হইয়া হাসানের পদচুম্বন করিয়া জোড়করে সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন।

শাহজাদা হাসান বলিলেন, "ভাই মোস্‌লেম! আমার নিকট এত বিনয় কেন? কি বলিতে ইচ্ছা করিতেছ, অসঙ্কোচে প্রকাশ কর। তুমি তো আমার বাল্যকালের বন্ধু।"

মোস্‌লেম কহিলেন, "আপনি ধর্মের অবতার, ঐহিক পারত্রিক উভয় রাজ্যের রাজা; আপনার পদাশ্রয়েই সমস্ত মুসলমানের পরিত্রাণ। আপনার পবিত্র চরণযুগল দর্শনেই মহাপুণ্য,-আপনার পদধূলি পাপবিমোচনের উপযুক্ত মহৌষধি; আপনাকে অন্তরের সহিত ভক্তি করিতে কাহার না ইচ্ছা করে? আপনার পদসেবা করিতে কে না লালায়িত হয়?

আপনার পবিত্র উপদেশ শ্রবণ করিতে কে না সমুৎসুক হইয়া থাকে? আমি দাসানুদাস, আদেশের ভিখারী, আদেশ প্রতিপালনই আমার সৌভাগ্য।"

"আজ আমার শিকারযাত্রা সুযাত্রা। আজিকার প্রভাত আমার সুপ্রভাত। বহুদিনান্তরে আজ বাল্যসখার দেখা পাইলাম। এক্ষণে তুমি ভাই কোথায় যাইতেছ?"

"এজিদের পরিণয়ের পয়গাম জয়নাবের নিকট লইয়া যাইতেছি। হজরত মাবিয়ার আদেশ, যত শীঘ্র হয়, জয়নাবের অভিপ্রায় জানিয়া সংবাদ দিতে হইবে।"

"এজিদ্ যে কৌশলে এই ঘটনা ঘটাইয়াছে, তাহা সকলই আমি শুনিয়াছি। হজরত মাবিয়া যে যে কারণে এজিদের কার্যের প্রতিপোষকতা করিয়াছেন, তাহাও জানিয়াছি। অথবা মাবিয়া যে ঐ সকল ষড়যন্ত্রের মূল বৃত্তান্ত ঘুণাক্ষেরও অবগত নহেন, তাহাও আমার জানিতে বাকি নাই।"

"আক্কাসও জয়নাবের প্রার্থী। বিশেষ অনুনয় করিয়া এমন কি, ঈশ্বরের শপথ দিয়া তিনি বলিয়াছেন, অগ্রে এজিদের প্রস্তাব করিয়া পরিশেষে আমার প্রস্তাবটি করিয়ো। এজিদ্ এবং আক্কাস, উভয়েরই পয়গাম লইয়া আমি জয়নাবের নিকট যাইতেছি। তিনি যে কাহার প্রস্তাব গ্রাহ্য করিবেন, তাহা ঈশ্বরই জানেন।"

হাস্য করিয়া হাসান কহিলেন, "মোস্লেম! আক্কাসের প্রস্তাব লইয়া যাইতে যখন সম্মত হইয়াছ, তখন এ গরীবের কথাটিই বা বাকি থাকে কেন? আমিও তোমাকে উকীল নিযুক্ত করিলাম। সকলের শেষে আমার প্রার্থনাটিও জয়নাবকে জ্ঞাপন করিও। স্ত্রী-জাতি প্রায়ই ধনপিপাসু হয়, আবার কেহ কেহ রূপেরও প্রত্যাশী হইয়া থাকে। আমার না আছে ধন, না আছে রূপ। এজিদের তো কথাই নাই; আক্কাসও যেমন ধনবান, তেমনি রূপবান; অবশ্যই ইহাদের প্রার্থনা অগ্রগণ্য! জয়নাব-রত্ন ইহাদেরই হৃদয়ভাণ্ডারে থাকিবার উপযুক্ত ধন। সে

www.MurchOna.com

ভাণ্ডারে যত্নের ত্রুটি হইবে না, আদরেরও সীমা থাকিবে না। স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই বাহ্যিক সুখকেই যথার্থ সুখ বিবেচনা করিয়া থাকে। আমার গৃহে সাংসারিক সুখ যত হইবে তাহা তোমার অবিদিত কিছুই নাই। যদিও আমি মদিনার সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছি, কিন্তু ধরিতে গেলে আমি ভিখারী। আমার গৃহে ঈশ্বরের উপাসনা ব্যতীত কোন প্রকার সুখবিলাসের আশা নাই। বাহ্য জগতে সুখী হইবার এমন কোন উপকরণ নাই যে, তাহাতে জয়নাব সুখী হইবে। সকলের শেষে আমার এই প্রস্তাব জয়নাবকে জানাইতে ভুলিয়ো না। দেখ ভাই! মনে রাখিয়ো। ফিরিয়া যাইবার সময় যেন জানিতে পারি যে, জয়নাব কাহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন।"

এই বলিয়া পরস্পর অভিবাদনপূর্বক উভয়ে ভিন্ন ভিন্ন দিকে গমন করিলেন। পথিক যাইতেছেন। মনে মনে ভাবিতেছেন, "হাঁ! ঈশ্বরের কী অপূর্ব মহিমা! এক জয়নাব-রত্নের তিন প্রার্থী,-এজিদ্, আক্কাস আর মাননীয় হাসান। এজিদ্ তো পূর্ব হইতেই জয়নাবরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া বসিয়া আছে। যে দিন জয়নাবকে দেখিয়াছে, জয়নাবের অজ্ঞাতে যে দিন এজিদের নয়ন-চকোর জয়নাবের মুখচন্দ্রিমার পরিমলময় সুধা পান করিয়াছে, সেই দিন এজিদ্ জয়নাবকে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া জয়নাব-রূপ-সাগরে আত্ম-বিসর্জন করিয়াছে; জয়নাবকেই জপমালা করিয়া দিবানিশি জয়নাব নাম জপ করিতেছে। জয়নাব ধ্যান, জয়নাব জ্ঞান!-আক্কাস তো এত অর্থশালী, এমন রূপবান্ পুরুষ তাহারও মন আজ জয়নাব নামে গলিয়া গেল! ইমাম হাসান-যাঁহার পদছায়াতেই আমাদের মুক্তি, যাঁহার মাতামহ প্রসাদা আমরা এই অক্ষয় ধর্মের সুবিস্তারিত পবিত্র পথ দেখিয়া পরম কারুণিক পরমেশ্বরকে চিনিয়াছি, যাঁহার ভক্তের জন্যই সর্বদা স্বর্গের দ্বার বিমোচিত রহিয়াছে, এমন মহাপুরুষও জয়নাব লাভের অভিলাষী! অহো!-জয়নাব কী ভাগ্যবতী!" পথিক মনে মনে এইরূপ নানা কথা আন্দোলন করিতে করিতে পথবাহন করিতে লাগিলেন। চিন্তারও বিরাম নাই, গতির বিশ্রাম নাই।

পঞ্চম প্রবাহ

পতিবিয়োগে নারীজাতিকে চারি মাস দশ দিন বৈধব্যব্রত প্রতিপালন করিতে হয়। সামান্য বস্ত্র পরিধান করিয়া নিয়মিতাচারে মৃত্তিকায় শয়ন করিতে হয়, সুগন্ধতৈলস্পর্শ, চিকুরে চিরুণী দান, মেহেদি কি অন্য কোন প্রকারের অঙ্গরাগ শরীরে লেপন, যাহাতে স্ত্রীসৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, তৎসমুদায় হইতে একেবারে বর্জিত থাকিতে হয়। জয়নাবের বৈধব্যব্রত এখনও সম্পন্ন হয় নাই, পরিধানে মিলন বসন। আব্রু অর্থাৎ চক্ষু ও কর্ণের মধ্যস্থিত উভয় পার্শ্ব হইতে কপোল ও ওষ্ঠের নিম্ন দিয়া সমুদায় স্থানকে আব্রু কহে। এই আব্রুস্থান অপর পুরুষের চক্ষে পড়িলেই শাস্ত্রানুসারে মহাপাপ! স্ত্রীলোকের পদতলের উপরিস্থ সন্ধিস্থান উলঙ্গ থাকিলেও মহাপাপ! সমুদায় অঙ্গ বস্ত্রে আবৃত করিয়া যদি উপরি উক্ত স্থানদ্বয় অনাবৃত রাখে, তাহা হইলে তাহাকে উলঙ্গ জ্ঞান করিতে হয়। স্থূল কথা, মনিবন্ধ হইতে পায়ের গুলফ পর্যন্ত এবং নির্দিষ্ট আবরুস্থান বস্ত্রাবৃত না থাকিলে জাতীয় ধর্মানুসারে তাহাকে উলঙ্গ জ্ঞান করিতে হয়। এই প্রকারে বস্ত্রের ব্যবহার করিতে না পারা সত্ত্বেও আমাদের দেশে 'জানানা' রীতি প্রচলিত হইয়াছে। আবার কোন কোন দেশে শাস্ত্রের মর্যাদা রক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতায় বাধা দেওয়া অনুচিত বিবেচনায় 'বোর্কা' অর্থাৎ শরীরাবরণ বসনের সৃষ্টি হইয়াছে। উক্ত প্রদেশে সচরাচর প্রকাশ্য স্থানে বাহির হইতে হইলে বোর্কা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জয়নাব শাস্ত্রসঙ্গত বৈধব্য অবস্থায় শুভ্রবেশ পরিধান করিয়া ঈশ্বরের উপাসনায় দিনযামিনী যাপন করিতেছেন। হস্তে তস্‌বি (জপমালা), সংসারের সমুদায় কার্য পরিত্যাগ করিয়া অদৃষ্টের লিখন অখণ্ডনীয় বিবেচনাতেই আন্তরিক দুঃখ সহ্য করিয়া কেবলমাত্র ঈশ্বরের প্রতিই নির্ভর করিয়া আছেন। এত মলিনভাব, তথাচ তাঁহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও রূপমাধুর্যে মানুষমাত্রেই বিমোহিত।

মোস্‌লেম যথাসময়ে জয়নাবের ভবনে উপস্থিত হইলেন। স্বাধীন দেশ, স্বাধীন প্রকৃতি, নিজের ভাল মন্দ নিজের প্রতিই নির্ভর। বিশেষ পূর্ণবয়স্ক হইলে বিবাহবিষয়ে স্বেচ্ছাচারিতা

হইয়া থাকে, নিজের বিবেচনার প্রতিই সমস্ত নির্ভর করে। জয়নাব পিতার বর্তমানে ও দেশীয় প্রথানুসারে এবং শাস্ত্রসঙ্গত স্বাধীনভাবেই মোস্‌লেমের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতা অদূরে দণ্ডায়মান থাকিয়া উভয়ের কথোপকথন আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

মোস্‌লেম বলিলেন, "ঈশ্বরের প্রসাদে পথশ্রম দূর হইয়াছে। সত্যি! যে উদ্দেশ্যে আমি দৌত্য কর্মে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছি, একে একে নিবেদন করি, শ্রবণ করুন। যদিও আপনার বৈধব্যব্রত আজ পর্যন্ত শেষ হয় নাই, কিন্তু প্রস্তাবে অধর্ম নাই। আমাদের দামেস্কাধিপতি হজরত মাবিয়ার বিষয় আপনার অবিদিত কিছুই নাই; তাঁহার রাজ-ঐশ্বর্য সকলই আপনি জ্ঞাত আছেন, সেই দামেস্কাধিপতির একমাত্র পুত্র এজিদের বিবাহ পয়গাম লইয়া আমি আপনার নিকট আসিয়াছি। যিনি এজিদেক স্বামিত্বে বরণ করিবেন, তিনিই দামেস্করাজ্যের পাটরাণী হইবেন। রাজভোগ ও রাজপরিচ্ছদে তাঁহার সুখের সীমা থাকিবে না। আর অধিক কি বলিব, তিনিই সেই সুবিশাল রাজ্যের অধীশ্বরী হইবেন। আর একটি কথা। পথে আসিতে আসিতে প্রভু মোহাম্মদের প্রিয় পারিষদ আক্কাস আমাকে কহিলেন, তিনিও আপনার প্রার্থী। ঈশ্বর তাঁহাকে সৃষ্টি করিয়া পুরুষ জাতির সৌন্দর্যের অতুল আদর্শ দেখাইয়াছেন। তিনি অতুল বিভবের অধীশ্বর। তিনিও আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন। অধিকন্তু প্রভু মোহাম্মদের কন্যা বিবি ফাতেমার গর্ভজাত হজরত আলীর ঔরস-সম্ভূত-পুত্র মদিনাধিপতি হজরত হাসানও আপনার প্রার্থী কিন্তু এজিদের ন্যায় তাঁহার ঐশ্বর্য সম্পদ নাই, সৈন্য সামন্ত নাই, উজ্জ্বল রাজপ্রাসাদও নাই। এই সকল বিষয়ে সম্ভ্রমসম্পদশালী এজিদের সহিত কোন অংশেই তাঁহার তুলনা হয় না। তাঁহার দ্বারা ইহকালের সুখ সম্ভোগের কোন আশাই নাই, অথচ সেই হাসান আপনার প্রার্থী। এই আমার শেষ কথা। বিন্দুমাত্রও আমি গোপন করিলাম না-কিছুমাত্র অত্যুক্তি করিলাম না। এক্ষণে আপনার যেরূপ অভিরুচি।"

আদ্যোপান্ত সমস্ত শ্রবণ করিয়া জয়নাব অতি মৃদুস্বরে সুমধুর সম্ভাষণে বলিলেন, "আজ পর্যন্ত আমার বৈধব্যব্রত সম্পন্ন হয় নাই। ব্রতাবসানে অবশ্যই আমি স্বামী গ্রহণ করিব।

কিন্তু এ সময় যে বিষয়ে আলোচনা করিলেও আমার মনে মহা কষ্টের উদ্রেক হয়। কি করি, পিতার অনুরোধে এবং আপনার প্রস্তাবে অগত্যা মনের কথা প্রকাশ করিতে হইল। ঈশ্বর যে উদ্দেশ্যে আমাকে সৃজন করিয়াছেন, সে উদ্দেশ্যের গুহ্য কারণ কেবল তিনিই জানেন। আমি তাঁহার যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপকরণ, তাহা আমার জানিবার বা বুঝিবার ক্ষমতা নাই। আমি ক্ষুদ্র জীব, আমি কেন-অনেকে আপন আপন মূল্যের পরিমাণ বুঝিতে অক্ষম। দয়াময় ঈশ্বর আমাকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন, যে প্রকারে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে নিয়োজিত করিয়াছেন, বিধাতা অদৃষ্টফলকে যাহা যাহা অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা অখণ্ডনীয় এবং অনিবার্য। কাজেই সকল অবস্থাতেই সেই সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের নিয়োজিত কার্যে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া তাহাতেই পরিতৃপ্ত থাকা সর্বতোভাবে কর্তব্য। জীবন কয় দিনের? জীবনের আশা কী? এই চক্ষু মুদ্রিত হইলেই সকল আশা-ভরসা ফুরাইয়া যাইবে। তবে কয়েক দিনের জন্য দুরাশার বশবর্তী হইয়া অমূলক উচ্চ আশায় লালায়িত হইবার ফল কী? ধন, সম্পত্তি, রাজ্য বা রূপের আমি প্রত্যাশী নহি। বড় মানুষের মন বড় আশাও বড়; তাঁহাদের সকল কার্য আড়ম্বরবিশিষ্ট, অথচ কিছুই নহে। বিশ্বাসের ভাগ অতি অল্প। স্থূল কথা, বিষয়বিভব, রাজপ্রাসাদ এবং রাজভোগের লোভী আমি নহি। সে লোভ এ জীবনে কখনোই হইবে না। মনের কথা আজ অকপটে আপনার নিকট বলিলাম।"

মোস্‌লেম কহিলেন, "ইহাতে তো আপনার মনোগত ভাব স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম না?"

"ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট আর কি হইতে পারে? যিনি ঐহিক পারত্রিক উভয় রাজ্যের রাজা, তিনি যখন আমাকে দাসীশ্রেণীর মধ্যে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তখন আমার ন্যায় সৌভাগ্যবতী রমণী অতি কমই দেখিতে পাইবেন। আর ইহা কে না জানে যে, যাঁহার মাতামহের নিমিত্তই জগতের সৃষ্টি; আদিপুরুষ হযরত আদম জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়াই ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতাসূচক সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া মস্তক উত্তোলন করিয়াই সেই দয়াময়ের আসনের শিরোভাগে যাঁহার নাম প্রথমেই দেখিয়াছিলেন, তিনি সেই প্রভু হজরত মোহাম্মদের দৌহিত্র। তিনি যখন জয়নাবকে চাহিয়াছেন, তখন জয়নাবের স্বর্গসুখ ইহকালেই সমাগত।

পাপীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত কোথায় না আছে? কিন্তু সাধু পুরুষের পদাশ্রিত হইতে পারিলে পরকালের মুক্তিপথের পাপকন্টক বিদূরিত হইয়া স্বর্গের দ্বার পরিষ্কার থাকিবে। তাঁহারা যাহার প্রতি একবার সস্নেহ নয়নে দৃষ্টিপাত করিবেন, সেই ব্যক্তি নরকাগ্নি হইতে মুক্ত হইয়া প্রধান স্বর্গ জান্নাতে নীত হইবে। আর অধিক কী বলিব, আমার বৈধব্যব্রত পূর্ণ হইলেই প্রভু হাসান যে সময়ে আমাকে দাসীত্বে গ্রহণ করিবেন, আমি মনের আনন্দে সেই সময়েই সেই পবিত্র চরণে আত্মসমর্পণ করিব। অন্য কোন প্রার্থীর কথা আর মুখে আনিব না।"

মোস্‌লেম বলিল, "জয়নাব! তুমিই জগতে পবিত্র কীর্তি স্থাপন করিলে। জগ বিলয় পর্যন্ত তোমার এই অক্ষয়কীর্তি সকলের অন্তরে দেদীপ্যমান থাকিবে। ধনসম্পত্তি-সুখবিলাসের প্রত্যাশিনী হইলে না, রূপমাধুরীতেও ভুলিলে না, কেবল অনন্তধামের অনন্ত সুখের প্রত্যাশাতেই দৃঢ় পণ করিয়া পার্থিব সুখকে তুচ্ছজ্ঞান করিলে। আমি তোমাকে সহস্র বার অভিবাদন করি। আমার আর কোন কথা নাই। আমি বিদায় হইলাম।"

মোস্‌লেম বিদায় হইলেন। যথাসময়ে প্রথমে ইমাম হাসান, পরিশেষে আক্কাসের নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া অপূর্ব চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া দামেস্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ষষ্ঠ প্রবাহ

মোস্‌লেমকে জয়নাবের নিকটে পাঠাইয়া এজিদ্ প্রতিদিন দিন গণনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার গণনা অনুসারে যেদিন মোস্‌লেমের প্রত্যাগমন সম্ভব, সেদিন চলিয়া গেল। মোস্‌লেমের আগমন প্রতীক্ষায় এজিদ্ সূর্য অস্তের কামনা করিয়া সন্ধ্যাদেবীর প্রতীক্ষায় ছিলেন। তমোময়ী সন্ধ্যাও দিবাকরের অস্তাচলে গমনের সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দিলেন। কিন্তু এজিদ্ মোস্‌লেমকে দেখিতে পাইলেন না। তাহার পর ক্রমে সপ্তাহ যায়, মোস্‌লেমর সংবাদ নাই। যে পথ অতি কষ্টে এক দিনে অতিক্রম করা যায়, সে পথ এজিদ্ মনঃকল্পিত গণনায় অর্ধ দিনে আসিয়া, মোস্‌লেমর প্রত্যাগমন সম্ভব স্থির করিয়া যে আশ্বস্ত হইয়াছিলেন, সে

তাঁহার ভ্রম নহে। কারণ প্রণয়াকাঙ্খীর প্রাণ আকাঙ্খিত প্রণয়রত্ন লাভের সুসংবাদ শুনিতে অমূল্য সময়কে যত শীঘ্র হয়, দূর করিয়া একদিনে দুই তিন বার সূর্যকে উদয় অস্ত করিতে ইচ্ছা করে। আবার সুখসময়ের দীর্ঘতার জন্য অনেকে অনেক সময়ে লালায়িত হয়; ল্যাপল্যান্ডবাসীকে সহস্রবার ধন্যবাদ করে। ইহা চিরকালই প্রসিদ্ধি আছে যে, সুখসূর্য শীঘ্রই অস্তমিত হয়। সুখনিশি শীঘ্র শীঘ্র ঊষাকে আমন্ত্রণ করিয়া প্রভাতকে আনয়ন করে। সুখী দুঃখী পরস্পর সকলেরই আক্ষেপ এবং সকলেরই দুঃখ। কিন্তু স্বভাব কাহারো কথায় কর্ণপাত করে না। প্রণয়ীর প্রতি অথবা প্রণয়ের প্রতিও ফিরিয়া তাকায় না। বিরহীর দুঃখেও দুঃখিত হয় না। সময় যে নিয়মে যাইতেছে, সেই নিয়মে কতদিন যাইবে, তাহা কে বলিতে পারে? এজিদের মনে কত কথাই উদয় হইতেছে। কথা ভাঙ্গিবার একমাত্র দোসর মারওয়ান। সে মারওয়ানও এক্ষণে উপস্থিত নাই। নানাপ্রকার চিন্তায় চিন্তিত।

মাবিয়া পীড়িত। তাঁহার ব্যাধি সাংঘাতিক, বাঁচিবার আশা অতি কম। এজিদের সে দিকে দৃক্পাত নাই, পিতার সেবা-শুশ্রূষাতেও মন নাই; প্রস্ফুটিত গোলাপদলবিনিন্দিত জয়নাবের সুকোমল বদনমণ্ডলের আভা, সে আয়তলোচনার নয়নভঙ্গির সুদৃশ্য দৃশ্য,-দিবারাত্রি তাঁহার অন্তরপটে আঁকা! ভ্রূযুগলের অগ্রভাগ, যাহা সুতীক্ষ্ণ বাণের ন্যায় অন্তর ভেদ করিয়া অন্তরে রহিয়াছে, দিবারাত্রি সেই বিষেই বিষম কাতর। সেই নাসিকার সরলভাবে সর্বদাই আকুল। ঈষলোহিত অধরোষ্ঠ পুনঃ পুনঃ দেখিবার আশা সততই বলবতী। আজ পর্যন্ত চিকুরগুচ্ছের লহরীশোভা ভুলিতে পারেন নাই। সামান্য অলঙ্কার, যাহা জয়নাবের কর্ণে দুলিতে দেখিয়াছিলেন, সেই দোলায় তাঁহার মস্তক আজ পর্যন্ত অবিশ্রান্ত দুলিতেছে, ললাটের উপরিস্থিত মালার জালি ('জালি'-আরবদেশীয় অলঙ্কার) যাহা অর্ধচন্দ্রাকারে চিকুরের সহিত মিলিত হইয়া কিঞ্চিভাগ ললাটের শোভাবর্ধন করিয়াছিল, তাঁহার মনপ্রাণ সেই জালে আটক পড়িয়া আজ পর্যন্ত ছটফট্ করিতেছে। সেই হাসিপূর্ণ মুখখানির হাসির আভা, জয়নাবের অজ্ঞাতে একবার দেখিয়াছিলেন, কতবার নিদ্রা গিয়াছেন, কত শতবার চক্ষের পলক ফেলিয়াছেন, তথাচ সেই মধুর হাসির আভাটুকু আজ পর্যন্তও চক্ষের নিকট হইতে

সরিয়া যায় নাই, সমস্তই মনে জাগিতেছে। মোস্‌লেম আসিলেই জয়নাবের কথা শুনিবেন। কত আগ্রহে জয়নাব তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছে, কথার ছলে সে কথাটি অন্ততঃ দু'বার তিনবার দোহরাইয়া শুনিবেন। কি ভাবে বলিয়াছিল, মোস্‌লেমকে বারবার জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার আদি অন্ত তন্ন তন্ন রূপে শুনিবেন। প্রথম মিলনের নিশীথে জয়নাবকে কি বলিয়া সম্বোধন করিবেন, আজ পর্যন্তও তাহার মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সালেহার বিবাহের আদি অন্ত ঘটনা এবং তাঁহার ভগ্নীমাত্র কেহই নাই, অথচ সালেহা নাম-এই ষড়যন্ত্র যে কেবল জয়নাব লাভের জন্য হইয়াছিল, তাহা অকপটে বলিবেন কি না আজ পর্যন্তও স্থির করিতে পারেন নাই। এই সকল অমূলক চিন্তায় এবং মোস্‌লেমর প্রত্যাগমনের বিলম্বে পূর্ব হইতে আরো অস্থিরচিত্ত হইয়াছিলেন। আজ খাদ্যসামগ্রী যথাস্থানেই পড়িয়া রহিয়াছে, সেবকগণ প্রভুর আহারের প্রতীক্ষায় কিঞ্চি দূরে বসিয়া কত কি বলিতেছে, মৃদু ভাবে নানাপ্রকার অকথ্য কথনে এজিদের নিন্দা করিতেছে, 'ঈশ্বর দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছেন, কি করিব উপায় নাই', এই বলিয়া নিজ নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেছে। রজনী দ্বিপ্রহর গত হইল, তথাচ এজিদের চিন্তার শেষ হইল না। কখনো উঠিতেছেন, গৃহমধ্যে দুই চারি পদ চালনা করিয়া আবার বসিতেছেন, ক্ষণকাল ঐ উপবেশনশয্যাতেই শয়ন করিয়া এপাশ ওপাশ করিতেছেন। ক্ষুধাতৃষ্ণা থাকিলে অবশ্যই আহারের প্রতি মনোযোগ করিতেন। সমস্তই ভুল, কিছুতেই মন স্থির করিতে পারিতেছেন না।

সকল সময়েই সকল স্থানেই, এজিদের নিকট মারওয়ানের যাইবার অনুমতি ছিল। মারওয়ান আসিয়াই অভিবাদন করিয়া সম্মুখে উপবেশন করিলেন। এজিদের চিত্তচাঞ্চল্য দেখিয়া চিন্তিতভাবে বলিলেন, "যখন কোন পথ ছিল না, তখনই চিন্তিত হইবার কথা, এখন তো হস্তগত হইবারই অধিক সম্ভাবনা; এখন আর চিন্তা কী? বলুন তো জগতে সুখী হইতে কে না ইচ্ছা করে? আবার সে সুখ সামান্য সুখ নয়, একেবারে সীমার বহির্ভূত। অবস্থার একটু উচ্চ পরিবর্তন হইলেই লোকে মহা সুখী হয়; এ তো একটু পরিমাণ নয়, একেবারে পাটরাণী। বিশেষ স্ত্রীজাতি বাহ্যিক সুখপ্রিয়। আপনি কোন প্রকার সন্দেহ মনে স্থান দিবেন

না; নিশ্চয় জানিবেন, জয়নাব কখনোই অসম্মত হইবে না। আমি স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া দিতে পারি যে, জয়নাব আপনারই হইবে এবং আপনারই অঙ্ক শোভা করিবে।"

এজিদ্ বলিলেন, "সন্দিহান মনের সন্দেহ অনেক। সকলগুলি যে যথার্থ সন্দেহ, তাহা নহে। আমি সেজন্য ভাবিতেছি না। জয়নাবের বৈধব্যব্রত সমাধা হইতে এখনও অনেক বিলম্ব।"

"সেই বা আর কত দিন? সময় যাইতেছে, ফিরিতেছে না, এক ভাবেও থাকিতেছে না। সময়ে গতির বিশ্রাম নাই, ক্লান্তি নাই, শ্রান্তি নাই। অবশ্যই যাইবে, অবশ্যই বিধব্যব্রত সমাধা হইবে।"

এজিদ্ সর্বদাই চকিত। কোন প্রকারের শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিলেই এজিদের মন কাঁপিয়া উঠিত। কারণ আর কিছু নহে, কেবল মোস্লেমের আগমন সম্ভব। এজিদ্ উঠিয়া বসিলেন। বোধ হয় তাঁহার কানে কোন প্রকারের শব্দ প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা না হইলে উঠিয়া বসিলেন কেন? মারওয়ানের তত মনোযোগ নাই। এজিদ্ উঠিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার মাতার প্রধানা পরিচারিকা ত্রস্তে আসিতেছে। নিকটে আসিয়া বলিল, "শীঘ্র আসুন, মহারাজ আপনাকে মনে করিয়াছেন।"

এজিদ্ যে বেশে বসিয়াছিলেন, সেই বেশেই পিতার নিকটে গমন করিলেন। মারওয়ানকে বলিয়া গেলেন, "তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি আসিতেছি।" এই বলিয়া এজিদ্ চলিয়া গেলেন।

মাবিয়া পীড়িত শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, এজিদের মাতা শয্যার পার্শ্বে নিম্নতর আর একটি শয্যায় বসিয়া বিষন্নবদনে চাহিয়া আছেন। এজিদ্ সসম্ভ্রমে মাতার চরণ বন্দনা করিয়া নিকটেই বসিলেন। মাবিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "মোস্লেম ফিরিয়া আসিয়াছে।

(এজিদ্ চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, কাহাকেও দেখিলেন না।) জয়নাবের বুদ্ধিতে আমি শত শত ধন্যবাদ করি। এত অল্পবয়সে এত ধৈর্যগুণ কাহার? এমন ধর্মপরায়ণা-সতীসাধ্বীর নাম আমি কখনোই শুনি নাই। জয়নাবের প্রত্যেক কথায় মন গলিয়া যায়। ইচ্ছা হয় যে, ধর্মবিষয়ে উপদেশ তাহার নিকট আমরাও শিক্ষা করি। ঈশ্বর তাহাকে যেমন সুশ্রী করিয়াছেন, তেমনি বুদ্ধিমতী করিয়া আরো দ্বিগুণ রূপ বাড়াইয়া দিয়াছেন! আহা! তাহার ধর্মে মতি, ঈশ্বরের প্রতি অচলা ভক্তি এবং ধর্মনীতি সুনীতি কথা শুনিলে কে না তাহাকে ভালবাসিবে? আবদুল জাব্বার নিরপরাধে ঐ অবলা সতীর মনে যে দুঃখ দিয়াছে, তাহার প্রতিফল সে অবশ্যই পাইবে।"

এজিদ্ আসল কথার কিছুই সন্ধান পাইতেছে না। জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস হইতেছে না; মনের মধ্যে মনের ভাব তোলপাড় করিতেছে। কী বলিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহাও হঠা স্থির করিতে পারিলেন না। তবে মনে মনে একটু স্থির করিলেন, এত প্রশংসা কেবল আমার শিক্ষার নিমিত্ত। ইহার অর্থই এই যে, আমি তাহাকে বিশেষ আদরে রাখি ও যত্ন করি। এই ভাবিয়া বিশেষ আগ্রহে শুনিতে লাগিলেন।

এজিদের মাতা বলিলেন, "ধর্মে মতি অনেকেরই আছে, সুশ্রীও অনেক আছে।"

এজিদের অন্তরস্থিত জয়নাবের ভ্রূযুগলের অগ্রভাগস্থ সুতীক্ষ্ণ বাণ, যাহা অন্তরে বিঁধিয়াই ছিল, তাহাতে আঘাত লাগিল।

মাবিয়া কহিলেন, "অনেক আছে, বটে, কিন্তু এমন আর হইবে না। এই তো মহগুণের পরিচয় এখনই পাইলে। জয়নাব,-রূপ, ধন সম্পত্তির প্রত্যাশী নহে রাজরাণী হইতেও তাঁহার আশা নাই। যাঁহার পদাশ্রয় গ্রহণ করিলে পরকালে মুক্তি পাইবেন তাঁহার পয়গামই তিনি কবুল করিয়াছেন।"

এজিদ্ জিজ্ঞাস করিলেন, "কাহার পদাশ্রয় গ্রহণ করিলে পরকালে মুক্তি হয়? সে ব্যক্তি কে?"

মাবিয়া বলিলেন, "তিনি প্রভু মোহাম্মদের দৌহিত্র মাননীয় আলীর পুত্র হাসান। তুমি যাঁহাদের নাম শুনিতেও কষ্ট বোধ কর, জয়নাব স্ত্রীবুদ্ধি প্রভাবে সেই মহাত্মার গুণ জানিয়াই তাঁহার পয়গাম সন্তোষের সহিত স্বীকার করিয়াছেন। দেখ এজিদ্! তুমি আর হাসান হোসেনের প্রতি ক্রোধ করিয়ো না। মন হইতে সকল পাপ দূর কর। সত্যপথ অবলম্বন কর। পৈতৃক ধর্ম রক্ষা কর। পরকালের সুগম্য পথের দুরূহ কন্টক সত্যধর্মের জ্যোতিঃপ্রভাবে বিনষ্ট করিয়া স্বর্গের দ্বার আবিষ্কার কর। সেই সঙ্গে ন্যায়পথে থাকিয়া এই সামান্য রাজ্য রক্ষা কর। আমি আর কয়দিন বাঁচিব? আমি যে প্রকারে হাসান-হোসেনের আনুগত্য ও দাসত্ব স্বীকার করিলাম, তুমি তাহার চতুর্গুণ করিবে। তোমা অপেক্ষা তাঁহারা সকল বিষয়েই বড়?"

তখন এজিদের মুখে কথা ফুটিল, বাক্‌শক্তির জড়তা ঘুচিল। পিতৃবাক্যবিরোধী হইয়া বলিতে অগ্রসর হইলেন, "আমি দামেস্কের-রাজপুত্র। আমার রাজকোষ ধনে সদা পরিপূর্ণ, সৈন্য-সামন্তে সর্ববলে বলীয়ান্! আমার সুরম্য অত্যুচ্চ প্রাসাদ এদেশে অদ্বিতীয়। আমি সর্ববিষয়ে পরিপূর্ণ এবং অভাবশূন্য। আমি যার জন্য প্রাণ পর্যন্ত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত, আমি যার জন্য রাজ্যসুখ তুচ্ছ করিয়া এই কিশোর বয়সে জীবন পর্যন্ত বিসর্জন করিতে অগ্রগামী, যার জন্য এতদিন এত কষ্ট সহ্য করিলাম, সেই জয়নাবকে হাসান বিবাহ করিবে? এজিদের চক্ষে তাহা কখনোই সহ্য হইবে না। এজিদের প্রাণ কখনোই তাহা সহ্য করিতে পারিবে না। যে হাসানের একসন্ধ্যা আহারের সংস্থান নাই-উপবাস যাহাদের বংশের চিরপ্রথা, একটি প্রদীপ জ্বালিয়া রাত্রের অন্ধকার দূর করিতে যাহাদের প্রায় মতা হয় না, সেই হাসানকে এজিদ্ মান্য করিবে? মান্য করা দূরে থাকুক, জয়নাব লাভের প্রতিশোধ এবং সমুচিত শাস্তি অবশ্যই এজিদ্ তাহাদিগকে দিবে। আমার মনে যে ব্যথা দিয়াছে, আমি তাহা

অপেক্ষা শত সহস্রগুণে তাহাদের মনে ব্যথা দিব! এখনি হউক, বা দুদিন পরেই হউক, এজিদ্ বাঁচিয়া থাকিলে ইহার অন্যথা হইবে না, এই এজিদের প্রতিজ্ঞা।"

মাবিয়া অতি কষ্টে শয্যা হইতে উঠিয়া সরোষে বলিতে লাগিলেন, "ওরে নরাধম! কি বলিলি? রে পাষণ্ড! কি কথা আজ মুখে উচ্চারণ করিলি? হায়! হায়!! নূরনবী মোহাম্মদের কথা আজ ফলিল! তাঁর ভবিষ্যবাণী আজ সফল হইল। ওরে পাপাত্মা! তুই কিসের রাজা? তুই কোন্ রাজার পুত্র? তোর কিসের রাজ্য? তোর ধনাগার কোথায় রে বর্বর? তুই তো আজই জাহান্নামী (প্রধান নারকী) হইলি! আমাকে সঙ্গী করিলি। রে দুরাত্মা পিশাচ! তোকে সে দিন কে বাচাঁইল? হায়! হায়!! আমি তোর এই পাপমুখ দেখিয়াই হাতের অস্ত্র হাতে রাখিয়াছিলাম। তাহার ফল হাতে হাতেই পাইলাম। ওরে বিধর্মী এজিদ্! তোর পিতা যাঁহাদের দাসানুদাস, তুই কোন্ মুখে তাঁহাদের প্রতি এমন অকথ্য বলিলি? তোর নিস্তার কোন কালেই নাই-ইহলোকেও নাই, পরলোকেও নাই। তুই জানিস্, এ রাজ্য তোর পিতার নহে। সেই হাসানের পিতা আলী অনুগ্রহ করিয়া-ভৃত্যের কার্যে সন্তুষ্ট হইয়া প্রভু যেমন কিছু দান করেন,-সেইরূপে তোর পিতাকে কেবলমাত্র ভোগের জন্য এই রাজ্য দান করিয়াছেন। বল্ তো তুই কোন্ মুখে এমন কর্কশ শব্দ তাঁহাদের প্রতি ব্যবহার করিলি? আমার সম্মুখ হইতে দূর হ! তোর ও পাপমুখ আমি আর এ চে দেখিব না! আর দেখিব না! তুই দূর হ!"

এজিদ্ ম্লান্ মুখে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। এজিদের মাতা নানা প্রকার সান্ত্বনা করিয়া মাবিয়াকে বুঝাইতে লাগিলেন, "আপনি স্থির হউন। ইহাতে আপনার পীড়াই বৃদ্ধি হইবে। আপনি যত বেশি উত্তেজিত হইবেন, ততই আপনার পীড়া বৃদ্ধি হইবে।"

মাবিয়া বলিলেন, "পীড়ার বৃদ্ধি হউক, আর আমার প্রাণ বাহির হইয়াই যাউক, যে কথা আমি আজ শুনিয়াছি, তিলার্ধকাল বাঁচিতে আমার আর ইচ্ছা নাই।"-সজোরে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মাবিয়া দুই হস্ত তুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। "হে দয়াময়! হে করুণাময়! তুমি সর্বশক্তিমান!-আমাকে উদ্ধার কর। আমি যেন

এজিদের পাপমুখ আর না দেখি। এজিদের কথাও যেন কর্ণে না শুনি। এজিদ্ আজ আমার অন্তরে যে আঘাত দিয়াছে, আর ক্ষণকাল বাঁচিতেও আমার ইচ্ছা নাই। শীঘ্র আমাকে এই পাপপুরী হইতে উদ্ধার করিয়া লও।" হযরত মাবিয়া এই প্রকার কাতর উক্তিতে ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া ব্যাধিশয্যায় শয়ন করিলেন।

সপ্তম প্রবাহ

সময় যাইতেছে। যাহা যাইতেছে, তাহা আর ফিরিয়া আসিতেছে না। আজ যে ঘটনা হইল, কাল তাহা দুই দিন হইবে। ক্রমে দিনের পর দিন, সপ্তাহ, পক্ষ, মাস অতীত হইল, দেখিতে দেখিতে কালচক্রের অধীনে ব সরে পরিণত হইবে। ব সর, ব সর, অনন্ত ব সর। যে কোন ঘটনাই হউক, অবিশ্রান্ত গতিতে তাহা বহুদূরে বিনিক্ষিপ্ত হইতেছে। জয়নাবের বৈধব্যব্রত সাঙ্গ হইল। হাসান স্বয়ং জয়নাবের ভবনে যাইয়া জয়নাবকে বিবাহ করিয়া আনিলেন। প্রথমা স্ত্রী হাসনেবানু, দ্বিতীয়া জায়েদা, তৃতীয়া জয়নাব! হাসনেবানু প্রথমা স্ত্রী, তদ্গর্ভজাত একমাত্র পুত্র আবুল কাসেম। আবুল কাসেম পূর্ণবয়স্ক, সর্বগুণে গুণান্বিত। এ পর্যন্ত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন নাই। পিতার অনুবর্তী থাকিয়াই কালাতিপাত করিতেছেন। পুণ্যভূমি মদিনা অতি পবিত্র স্থান। লোকমাত্রেই ঈশ্বরভক্ত পাপশূন্য চরিত্র। কাসেম পবিত্র বংশে জন্মেয়াছেন। তাঁহার আপাদমস্তক পবিত্র। অস্ত্রবিদ্যাতেও বিশারদ। এই অমিত-তেজী মহাবীর কাসেমের কীর্তি বিষাদ-সিন্ধুর একটি প্রবল তরঙ্গ। পাঠকগণকে পূর্বেই তাহার কিঞ্চি পরিচয় দিয়া রাখিলাম। জায়েদার সন্তান-সন্ততি কিছুই নাই। এক বস্তুর দুই গ্রীবা হইলেই মহা গোলমাল উপস্থিত হয়। সপত্নীবাদ কোথায় না আছে? হাসনেবানু হাসানের প্রধানা স্ত্রী সকলের মাননীয়া। ত প্রতি জায়েদার আন্তরিক বিদ্বেষভাব থাকিলেও তাহা কার্যে পরিণত করিতে পারিতেন না। কিন্তু জয়নাবের সহিত তাঁহার সমভাব চলিতে

লাগিল। জায়েদা ভাবিয়াছিলেন, হাসান তাহাতেই অনুরক্ত। পূর্বে যাহা হইবার হইয়াছে, কিন্তু জায়েদা বাঁচিয়া থাকিতে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবেন না। এক্ষণে দেখিলেন, তাঁহার সে বিশ্বাস ভ্রমসঙ্কুল। এখন নিশ্চয়ই বুঝিলেন, হাসানের ভালবাসা আন্তরিক নহে;-আন্তরিক হইলে এরূপ ঘটিত না। এক মনও ভিন্ন ভিন্ন তিন ভাগে বিভক্ত করিতে পারিতেন না। ক্রমেই পূর্বভাবের অনেক পরিবর্তন দেখিলেন। হাসানের কথায়, কার্যে ভালবাসার কিছুই ত্রুটি পাইলেন না; তথাচ পূর্বভাব, পূর্ব প্রণয়, পূর্ব ভালবাসার মধ্যে কি যেন একটু ছিল তাহা নাই। সেই গৃহ, সেই স্বামী, সেই হাসান, সেই জায়েদা সকলই রহিয়াছে, তথাচ ইহার মধ্যে কি যেন অভাব রহিয়াছে। জায়েদা মনে মনে সাব্যস্ত করিলেন, এ দোষ আমার নয়, হাসানের নয়, এ দোষ জয়নাবের। জয়নাবকে যে এই দোষে দোষী সাব্যস্ত করিলেন আজিও করিলেন, কালিও করিলেন, জীবন শেষ পর্যন্ত করিয়া রাখিলেন। সে দোষ ক্রমেই অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া শত্রুভাব আসিয়া দাঁড়াইল। জয়নাব এক্ষণে তাঁহার দুই চরে বিষ। জয়নাবকে দেখিলেই তাঁহার মনের আগুন জ্বলিয়া উঠে। হাসনেবানুর ভয়ে যে আগুন এতদিন চাপা ছিল, ক্রমে ক্রমে জয়নাবের রূপরাশিজ্যোতিঃতেজে উত্তেজিত হইয়া সেই আগুন একেবারে জ্বলিয়া উঠিল। অন্তরে আগুন, মুখেও জয়নাব নাম শ্রবণে একেবারে আগুন হইয়া উঠিতেন। শেষে হাসনেবানু পর্যন্ত জানিতে পারিলেন যে, জায়েদা জয়নাবের নাম শুনিলেই জ্বলিয়া উঠে। হাসনেবানু কাহাকেও কিছু বলিতেন না; কিন্তু জয়নাবকে মনে মনে ভালবাসিতেন। হাসান জয়নাবকে পূর্ব হইতেই ভালবাসিতেন, যত্নও করিতেন, এখন পর্যন্তও তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। তথাপি জায়েদার মনে যে কি প্রকারের উদাসভাব উদয় হইয়াছে, তিনিই জানেন; আর কাহারো জানিবার শক্তি নাই।

এক অন্তরে দুই মূর্তির স্থাপন হওয়া অসম্ভব। ইহার পর তিনটি যে কি প্রকারের সঙ্কুলান হইল, সমভাবে সমশ্রেণীতে স্থান পাইল, তাহা আমাদের বুদ্ধিতে আসিল না; সুতরাং পাঠকগণকে বুঝাইতে পারিলাম না। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির ক্ষমতা কত? অপ্রশস্ত অন্তরের

আয়ত্তই বা কত যে, ঐ মহাপুরুষের কীর্তিকলাপে বুদ্ধি চালনা করি। মনের কথা মনেই থাকিল। হাসান প্রকাশ্যে স্ত্রীত্রয়ের মধ্যে যে কিছু ইতর বিশেষ জ্ঞান করিতেন, তাহা কেহ কখনোই জানিতে পারেন নাই। তিন স্ত্রীকেই সম-নয়নে দেখিতেন, সমভাবে ভালবাসিতেন, কিন্তু সেই সমান ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে হাসনেবানুকে অপেক্ষাকৃত অধিক মান্য করিতেন। জয়নাব সর্বাপেক্ষা সুশ্রী, স্বভাবত তাঁহাকে বেশি আদর ও বেশি যত্ন করেন, জায়েদার মনে এইটিই বদ্ধমূল হইল। প্রকাশ্য কোন বিষয়ে বেশি ভালবাসার চিহ্ন কখনো দেখিতে পান নাই, তথাচ তাঁহার মনে সন্দেহ ঘুচিল না। কোন দিন, জায়েদার প্রতি যত্নের ক্রুটি, কি কোন বিষয়ে ক্ষতি, কি অণুমাত্রও ভালবাসার লাঘব দেখিলাম না। তথাচ জয়নাব তাঁহার পরম শত্রু, চরে শূল, সুখ-পথের প্রধান কন্টক।

ইমাম হাসান ধর্মশাস্ত্রের অকাট্য বিধি উলঙ্ঘন করিয়া জয়নাবকে বিবাহ করেন নাই। ইচ্ছা হইলে এখনও চতুর্থ সংখ্যা পূর্ণ করিতে পারেন। ভালবাসার ন্যূনাধিক্যে তাঁহার কোন স্ত্রী তাঁহাকে কোন নিন্দা করিতে পারেন না। তবে জায়েদা এত বিষাদিনী হইলেন কেন? কেন জয়নাবকে বিষদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন? বোধ হয় জায়েদা ভাবিতেন যে, একটি স্ত্রীর তিনটি স্বামী হইলে সে স্ত্রীলোকটি যে প্রকার সুখী হয়, তিনটি স্ত্রীর এক স্বামীও, বোধ হয়, সেই প্রকার সুখভোগ করে। কিন্তু সেই স্বামীত্রয়ের মধ্যে যদি কোন বিষয়ে অসুবিধা কি কোন কারণে হিংসা, দ্বেষ ও ঈর্ষার প্রাদুর্ভাব হইয়া আত্মকলহ উপস্থিত হয় এবং একের অনিষ্ট চিন্তায় দ্বিতীয় যত্ন করে, তৃতীয় কাহারো স্বপক্ষে কি উভয়কে শত্রু মনে করিয়া শত্রুবিনাশে একেবারে কৃতসঙ্কল্প হয়, তবে আমারই বা না হইবে কেন? আমিও তো শরীরী, আমারও ক্ষুধা আছে, তৃষ্ণা আছে, মাংসপেশী, ধমনী, হৃদয়, শোণিত, অস্থি, চর্ম ও ইচ্ছা সকলই আছে, তবে মনোভাবের বিপর্যয় হইবে কেন? এক উপকরণে গঠিত শরীরে স্বাভাবিক নিয়ম লঙ্ঘন অথবা ভিন্ন ভাব হওয়া অসম্ভব। জগতে শত্রুও তিন প্রকার। প্রথমে প্রকৃত শত্রু, দ্বিতীয় শত্রুর বন্ধু, তৃতীয় মিত্রের শত্রু! এই সূত্র অনুসারে মৈত্রবন্ধন হইতে হাসান যেন অল্পে অল্পে সরিতে লাগিলেন।

স্বামীর নিরপেক্ষ ভালবাসা জায়েদা আর ভালবাসিলেন না, মনের কথা মনেই থাকিল। কোন দিন কোন প্রকারে কী কোন কথায় কী কোন কথার প্রসঙ্গেও সে কথা মুখে আনা দূরে থাকুক, কণ্ঠে পর্যন্তও আনিলেন না। স্ত্রীলোকমাত্রেই স্বভাবতঃ কিছু চাপা। তাহারা কাজকর্মে যেমন ভারী, পরিমাণেও তদপেক্ষা দ্বিগুণ ভারী; সহজে উঠাইতে কাহারো সাধ্য নাই। এক একটি স্ত্রীলোকের মনের কপাট খুলিয়া যদি বিশেষ তন্ন তন্ন ভাবে দেখা যায়, আর যাহা আছে, তাহা যদি চেনা যায়, তাহা হইলে অনেক বিষয়ে শিক্ষাও পাওয়া যায় এবং মনের অন্ধকার প্রায়ই ঘুচিয়া যায়। সে মনে না আছে, এমন জিনিসই নাই। সে হৃদয়ভাণ্ডারে না আছে, এমন কোন পদার্থই নাই। জয়নাব হাসনেবানুকে মনের সহিত ভক্তি করিতেন। জায়েদাকেও জ্যেষ্ঠ ভগ্নীর ন্যায় মান্যের সহিত স্নেহ করিতেন। কিছুদিন এই ভাবেই চলিল। কোন কালেই কোন প্রকার লোকের অভাব ছিল না, এজিদের চক্রান্তে আবদুল জাব্বারের দুরবস্থা হাসান পূর্বেই শুনিয়াছিলেন। আবার এখন পর্যন্ত জয়নাবের মোহিনী-মূর্তি এজিদের চক্ষে সর্বদা বিরাজ করিতেছে। তাঁহার বিবাহের পর এজিদের প্রতিজ্ঞা, মাবিয়ার র্ভৎসনা, সকল কথাই মদিনায় আসিয়াছে। কোন কথা শুনিতেই তাঁহার আর বাকি নাই। মাবিয়া দিন দিন ক্ষীণ ও বলহীন হইতেছেন, বাঁচিবার ভরসা অতি কমই আছে, তাহাও লোকমুখে শুনিতেছেন। এজিদের সহিত বাল্যকালে বাল্যক্রীড়া ঝগড়া বিবাদ হইত, এজিদ্ তাঁহাদের দুই ভ্রাতাকেই দেখিতে পারিতেন না, একথা লইয়াও সময়ে সময়ে গল্পচ্ছলে জয়নাবকে শুনাইতেছেন। এক্ষণে জয়নাবলাভে বঞ্চিত হইয়া শত্রুভাব সহস্রগুণে এজিদের অন্তরে দৃঢ়রূপে স্থায়ী হইয়াছে, তাহাও জয়নাবকে বলিতেন। হাসান অনেক লোকের মুখে অনেক কথা শুনিলেন; সে সকল কথায় মনোযোগ, কি বিশ্বাস করিয়া তাহার আদি অন্ত তন্ন তন্ন করিয়া কখনোই শুনিলেন না। সাধারণের মুখে এক কথার শাখা-প্রশাখা বাহির হইয়া শত সহস্র পত্রে পরিণত হয়। সে সময় মূল কথার অণুমাত্রও বিশ্বাসের উপযুক্ত থাকে না। হাসান তাহাই বিবেচনা করিয়া এক কর্ণে শুনিলেন, অন্য কর্ণে বাহির করিয়া দিলেন। ধর্মোপদেশ, ধর্মচর্চাই জীবনের একমাত্র কার্য মনে করিয়া ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ

করিয়াছিলেন। যদিও মদিনার রাজা, কিন্তু রাজসিংহাসনের পারিপাট্য নাই, সৈন্য সামন্ত ধন জন কিছুই নাই। কিন্তু আবশ্যক হইলে ঈশ্বরপ্রসাদে অভাবও নাই। মদিনাবাসীরা হাসান-হোসেন দুই ভ্রাতার আজ্ঞাবহ কিঙ্কর, তাঁহাদের কার্যে, তাঁহাদের বিপদে বিনা অর্থে, বিনা স্বার্থে, বিনা লাভে জীবন দিতে প্রস্তুত।

হাসান সন্ধ্যাকালীন উপাসনা সমাধা করিয়া তস্বি (জপমালা) হস্তে উপাসনা-মন্দিরের সম্মুখে পদচালনা করিয়া ঈশ্বরের নাম জপ করিতেছেন, এমন সময় একজন ফকির জাতীয় প্রথানুসারে অভিবাদন করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। ফকিরের মলিন বেশ, শতগ্রন্থিযুক্ত পিরহান, মলিন বস্ত্রে শির আবৃত, গলায় প্রস্তরের তস্বি, হস্তে কাষ্ঠযষ্টি। হাসানের কিঞ্চিদূরে দণ্ডায়মান হইয়া সেই বৃদ্ধ বলিলেন, "প্রভো! আমি একটি পর্বতের উপর বসিয়াছিলাম। দেখি যে, একজন কাসেদ্ আসিতেছে, হঠাৎ ঈশ্বরের নাম করিয়া সেই কাসেদ্ ভূতলে পতিত হইল। কারণ কিছুই জানিতে পারিলাম না। নিকটস্থ হইয়া দেখি যে, একটি লৌহশর তাহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া পৃষ্ঠদেশ পার হইয়া, কঠিন প্রস্তর খণ্ড বিদ্ধ করিয়াছে। শোণিতের ধারা বহিয়া চলিতেছে। কোথা হইতে কে শর নিপে করিল, এমন লঘুহস্তে শর নিক্ষেপে সুনিপুণ যে, এক বাণে পথিকের হৃদয় বিদ্ধ করিয়া পৃষ্ঠ পর্যন্ত ভেদ করিল। তখনও তাহার প্রাণ বিয়োগ হয় নাই। দুই একটি কথা অস্ফুট স্বর যাহা শুনিলাম, আর ভাবেও যাহা বুঝিতে পারিলাম, তাহার মর্ম এই যে হজরত মাবিয়া আপনার নিকট কাসেদ্ পাঠাইয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত পীড়িত, বাঁচিবার ভরসা অতি কম। জীবনে শেষ দেখাশুনার জন্যই আপনাকে সংবাদ দিতে বোধ হয়, কাসেদ্ আসিতেছিল, আমি দ্রুতগামী অশ্বের পদধ্বনি শুনিয়া সম্মুখে লক্ষ্য করিলাম। দেখিলাম, এজিদ্ অশ্বোপরি বীরসাজে ধনুহস্তে বেগে আসিতে। পৃষ্ঠের বাম পার্শ্বে তূণীর ঝুলিতেছে, দেখিয়াই পর্বতের আড়ালে লুকাইলাম। আড়াল হইতে দেখিলাম, এজিদ্ অশ্ব হইতে নামিয়া পথিকের কটিবন্ধ খুলিয়া, একখানি পত্র লইয়া, অশ্বে কষাঘাত করিতে করিতে চক্ষুর অগোচর হইল। আপনার নিকট সেই সংবাদ

দিতে আসিয়াছি। আর আমার কোন কথা নাই।" এই বলিয়া আগন্তুক ফকির পুনারভিবাদন করিয়া একটু দ্রুতপদে চলিয়া গেল। হাসান ভাবিতে লাগিল ফকির কে? কেনই-বা আমাকে এ সংবাদ দিতে আসিয়াছিল? কথার স্বর ও মুখচ্ছবি একেবারে অপরিচিত বলিয়াও বোধ হইল না। অনেকণ পর্যন্ত ফকিরের বিষয় চিন্তা করিয়া তিনি শেষে সাব্যস্ত করিলেন যে, ফকির আর কেহই নয়, এ সেই আবদুল জাব্বার। একে একে আবদুল জাব্বারের অবয়ব ভাবভঙ্গি কথার স্বরে নিশ্চয়ই প্রমাণ হইল যে, আর কেহই নয়, এ সেই আবদুল জাব্বার। কী আশ্চর্য! মানুষের অবস্থা কখন কিরূপ হয় কিছুই জানিতে পারা যায় না। হজরত মাবিয়ার কথা যেরূপ শুনিলাম ইহাতে তাহার জীবনাশা অতি কমই বোধ হয়। যাহা হউক, হোসেনের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা করিতে হয় করিব; এই বলিয়া ত৾া৾ নিজ গৃহাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

সপ্তম প্রবাহ

সময় যাইতেছে। যাহা যাইতেছে, তাহা আর ফিরিয়া আসিতেছে না। আজ যে ঘটনা হইল, কাল তাহা দুই দিন হইবে। ক্রমে দিনের পর দিন, সপ্তাহ, পক্ষ, মাস অতীত হইল, দেখিতে দেখিতে কালচক্রের অধীনে ব৾সরে পরিণত হইবে। ব৾সর, ব৾সর, অনন্ত ব৾সর। যে কোন ঘটনাই হউক, অবিশ্রান্ত গতিতে তাহা বহুদূরে বিনিপ্তি হইতেছে। জয়নাবের বৈধব্যব্রত সাঙ্গ হইল। হাসান স্বয়ং জয়নাবের ভবনে যাইয়া জয়নাবকে বিবাহ করিয়া আনিলেন। প্রথমা স্ত্রী হাসনেবানু, দ্বিতীয়া জায়েদা, তৃতীয়া জয়নাব! হাসনেবানু প্রথমা স্ত্রী, তদ্গর্ভজাত একমাত্র পুত্র আবুল কাসেম। আবুল কাসেম পূর্ণবয়স্ক, সর্বগুণে গুণান্বিত। এ পর্যন্ত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন নাই। পিতার অনুবর্তী থাকিয়াই কালাতিপাত করিতেছেন। পুণ্যভূমি মদিনা অতি পবিত্র স্থান। লোকমাত্রেই ঈশ্বরভক্ত পাপশূন্য চরিত্র। কাসেম পবিত্র বংশে জন্মেয়াছেন। তাঁহার আপাদমস্তক পবিত্র। অস্ত্রবিদ্যাতেও বিশারদ। এই অমিত-তেজী

মহাবীর কাসেমের কীর্তি বিষাদ-সিন্ধুর একটি প্রবল তরঙ্গ। পাঠকগণকে পূর্বেই তাহার কিঞ্চি পরিচয় দিয়া রাখিলাম। জায়েদার সন্তান-সন্ততি কিছুই নাই। এক বস্তুর দুই গ্রীবা হইলেই মহা গোলমাল উপস্থিত হয়। সপত্নীবাদ কোথায় না আছে? হাসনেবানু হাসানের প্রধানা স্ত্রী সকলের মাননীয়া। তপ্রতি জায়েদার আন্তরিক বিদ্বেষভাব থাকিলেও তাহা কার্যে পরিণত করিতে পারিতেন না। কিন্তু জয়নাবের সহিত তাঁহার সমভাব চলিতে লাগিল। জায়েদা ভাবিয়াছিলেন, হাসান তাহাতেই অনুরক্ত। পূর্বে যাহা হইবার হইয়াছে, কিন্তু জায়েদা বাঁচিয়া থাকিতে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবেন না। এক্ষণে দেখিলেন, তাঁহার সে বিশ্বাস ভ্রমসঙ্কুল। এখন নিশ্চয়ই বুঝিলেন, হাসানের ভালবাসা আন্তরিক নহে;-আন্তরিক হইলে এরূপ ঘটিত না। এক মনও ভিন্ন ভিন্ন তিন ভাগে বিভক্ত করিতে পারিতেন না। ক্রমেই পূর্বভাবের অনেক পরিবর্তন দেখিলেন। হাসানের কথায়, কার্যে ভালবাসার কিছুই ত্রুটি পাইলেন না; তথাচ পূর্বভাব, পূর্ব প্রণয়, পূর্ব ভালবাসার মধ্যে কি যেন একটু ছিল তাহা নাই। সেই গৃহ, সেই স্বামী, সেই হাসান, সেই জায়েদা সকলই রহিয়াছে, তথাচ ইহার মধ্যে কি যেন অভাব রহিয়াছে। জায়েদা মনে মনে সাব্যস্ত করিলেন, এ দোষ আমার নয়, হাসানের নয়, এ দোষ জয়নাবের। জয়নাবকে যে এই দোষে দোষী সাব্যস্ত করিলেন আজিও করিলেন, কালিও করিলেন, জীবন শেষ পর্যন্ত করিয়া রাখিলেন। সে দোষ ক্রমেই অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া শত্রুভাব আসিয়া দাঁড়াইল। জয়নাব এক্ষণে তাঁহার দুই চরে বিষ। জয়নাবকে দেখিলেই তাঁহার মনের আগুন জ্বলিয়া উঠে। হাসনেবানুর ভয়ে যে আগুন এতদিন চাপা ছিল, ক্রমে ক্রমে জয়নাবের রূপরাশিজ্যোতিঃতেজে উত্তেজিত হইয়া সেই আগুন একেবারে জ্বলিয়া উঠিল। অন্তরে আগুন, মুখেও জয়নাব নাম শ্রবণে একেবারে আগুন হইয়া উঠিতেন। শেষে হাসনেবানু পর্যন্ত জানিতে পারিলেন যে, জায়েদা জয়নাবের নাম শুনিলেই জ্বলিয়া উঠে। হাসনেবানু কাহাকেও কিছু বলিতেন না; কিন্তু জয়নাবকে মনে মনে ভালবাসিতেন। হাসান জয়নাবকে পূর্ব হইতেই ভালবাসিতেন, যত্নও করিতেন, এখন পর্যন্তও তাহার

কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। তথাপি জায়েদার মনে যে কি প্রকারের উদাসভাব উদয় হইয়াছে, তিনিই জানেন; আর কাহারো জানিবার শক্তি নাই।

এক অন্তরে দুই মূর্তির স্থাপন হওয়া অসম্ভব। ইহার পর তিনটি যে কি প্রকারের সঙ্কুলান হইল, সমভাবে সমশ্রেণীতে স্থান পাইল, তাহা আমাদের বুদ্ধিতে আসিল না; সুতরাং পাঠকগণকে বুঝাইতে পারিলাম না। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির ক্ষমতা কত? অপ্রশস্ত অন্তরের আয়ত্তই বা কত যে, ঐ মহাপুরুষের কীর্তিকলাপে বুদ্ধি চালনা করি। মনের কথা মনেই থাকিল। হাসান প্রকাশ্যে স্ত্রীত্রয়ের মধ্যে যে কিছু ইতর বিশেষ জ্ঞান করিতেন, তাহা কেহ কখনোই জানিতে পারেন নাই। তিন স্ত্রীকেই সম-নয়নে দেখিতেন, সমভাবে ভালবাসিতেন, কিন্তু সেই সমান ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে হাসনেবানুকে অপেক্ষাকৃত অধিক মান্য করিতেন। জয়নাব সর্বাপেক্ষা সুশ্রী, স্বভাবত তাঁহাকে বেশি আদর ও বেশি যত্ন করেন, জায়েদার মনে এইটিই বদ্ধমূল হইল। প্রকাশ্য কোন বিষয়ে বেশি ভালবাসার চিহ্ন কখনো দেখিতে পান নাই, তথাচ তাঁহার মনে সন্দেহ ঘুচিল না। কোন দিন, জায়েদার প্রতি যত্নের ত্রুটি, কি কোন বিষয়ে ক্ষতি, কি অণুমাত্রও ভালবাসার লাঘব দেখিলাম না। তথাচ জয়নাব তাঁহার পরম শত্রু, চরে শূল, সুখ-পথের প্রধান কন্টক।

ইমাম হাসান ধর্মশাস্ত্রের অকাট্য বিধি উলঙ্ঘন করিয়া জয়নাবকে বিবাহ করেন নাই। ইচ্ছা হইলে এখনও চতুর্থ সংখ্যা পূর্ণ করিতে পারেন। ভালবাসার ন্যূনাধিক্যে তাঁহার কোন স্ত্রী তাঁহাকে কোন নিন্দা করিতে পারেন না। তবে জায়েদা এত বিষাদিনী হইলেন কেন? কেন জয়নাবকে বিষদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন? বোধ হয় জায়েদা ভাবিতেন যে, একটি স্ত্রীর তিনটি স্বামী হইলে সে স্ত্রীলোকটি যে প্রকার সুখী হয়, তিনটি স্ত্রীর এক স্বামীও, বোধ হয়, সেই প্রকার সুখভোগ করে। কিন্তু সেই স্বামীত্রয়ের মধ্যে যদি কোন বিষয়ে অসুবিধা কি কোন কারণে হিংসা, দ্বেষ ও ঈর্ষার প্রাদুর্ভাব হইয়া আত্মকলহ উপস্থিত হয় এবং একের অনিষ্ট চিন্তায় দ্বিতীয় যত্ন করে, তৃতীয় কাহারো স্বপক্ষে কি উভয়কে শত্রু মনে করিয়া

শত্রুবিনাশে একেবারে কৃতসঙ্কল্প হয়, তবে আমারই বা না হইবে কেন? আমিও তো শরীরী, আমারও ক্ষুধা আছে, তৃষ্ণা আছে, মাংসপেশী, ধমনী, হৃদয়, শোণিত, অস্থি, চর্ম ও ইচ্ছা সকলই আছে, তবে মনোভাবের বিপর্যয় হইবে কেন? এক উপকরণে গঠিত শরীরে স্বাভাবিক নিয়ম লঙ্ঘন অথবা ভিন্ন ভাব হওয়া অসম্ভব। জগতে শত্রুও তিন প্রকার। প্রথমে প্রকৃত শত্রু, দ্বিতীয় শত্রুর বন্ধু, তৃতীয় মিত্রের শত্রু! এই সূত্র অনুসারে মৈত্রবন্ধন হইতে হাসান যেন অল্পে অল্পে সরিতে লাগিলেন।

স্বামীর নিরপেক্ষ ভালবাসা জায়েদা আর ভালবাসিলেন না, মনের কথা মনেই থাকিল। কোন দিন কোন প্রকারে কী কোন কথায় কী কোন কথার প্রসঙ্গেও সে কথা মুখে আনা দূরে থাকুক, কণ্ঠে পর্যন্তও আনিলেন না। স্ত্রীলোকমাত্রেই স্বভাবতঃ কিছু চাপা। তাহারা কাজকর্মে যেমন ভারী, পরিমাণেও তদপেক্ষা দ্বিগুণ ভারী; সহজে উঠাইতে কাহারো সাধ্য নাই। এক একটি স্ত্রীলোকের মনের কপাট খুলিয়া যদি বিশেষ তন্ন তন্ন ভাবে দেখা যায়, আর যাহা আছে, তাহা যদি চেনা যায়, তাহা হইলে অনেক বিষয়ে শিক্ষাও পাওয়া যায় এবং মনের অন্ধকার প্রায়ই ঘুচিয়া যায়। সে মনে না আছে, এমন জিনিসই নাই। সে হৃদয়ভাণ্ডারে না আছে, এমন কোন পদার্থই নাই। জয়নাব হাসনেবানুকে মনের সহিত ভক্তি করিতেন। জায়েদাকেও জ্যেষ্ঠ ভগ্নীর ন্যায় মান্যের সহিত স্নেহ করিতেন। কিছুদিন এই ভাবেই চলিল। কোন কালেই কোন প্রকার লোকের অভাব ছিল না, এজিদের চক্রান্তে আবদুল জাব্বারের দুরবস্থা হাসান পূর্বেই শুনিয়াছিলেন। আবার এখন পর্যন্ত জয়নাবের মোহিনী-মূর্তি এজিদের চক্ষে সর্বদা বিরাজ করিতেছে। তাঁহার বিবাহের পর এজিদের প্রতিজ্ঞা, মাবিয়ার র্ভ□সনা, সকল কথাই মদিনায় আসিয়াছে। কোন কথা শুনিতেই তাঁহার আর বাকি নাই। মাবিয়া দিন দিন ক্ষীণ ও বলহীন হইতেছেন, বাঁচিবার ভরসা অতি কমই আছে, তাহাও লোকমুখে শুনিতেছেন। এজিদের সহিত বাল্যকালে বাল্যক্রীড়া ঝগড়া বিবাদ হইত, এজিদ্ তাঁহাদের দুই ভ্রাতাকেই দেখিতে পারিতেন না, একথা লইয়াও সময়ে সময়ে গল্পচ্ছলে জয়নাবকে শুনাইতেছেন। এক্ষণে জয়নাবলাভে বঞ্চিত হইয়া শত্রুভাব সহস্রগুণে এজিদের অন্তরে দৃঢ়রূপে

স্থায়ী হইয়াছে, তাহাও জয়নাবকে বলিতেন। হাসান অনেক লোকের মুখে অনেক কথা শুনিলেন; সে সকল কথায় মনোযোগ, কি বিশ্বাস করিয়া তাহার আদি অন্ত তন্ন তন্ন করিয়া কখনোই শুনিলেন না। সাধারণের মুখে এক কথার শাখা-প্রশাখা বাহির হইয়া শত সহস্র পত্রে পরিণত হয়। সে সময় মূল কথার অণুমাত্রও বিশ্বাসের উপযুক্ত থাকে না। হাসান তাহাই বিবেচনা করিয়া এক কর্ণে শুনিলেন, অন্য কর্ণে বাহির করিয়া দিলেন। ধর্মোপদেশ, ধর্মচর্চাই জীবনের একমাত্র কার্য মনে করিয়া ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। যদিও মদিনার রাজা, কিন্তু রাজসিংহাসনের পারিপাট্য নাই, সৈন্য সামন্ত ধন জন কিছুই নাই। কিন্তু আবশ্যক হইলে ঈশ্বরপ্রসাদে অভাবও নাই। মদিনাবাসীরা হাসান-হোসেন দুই ভ্রাতার আজ্ঞাবহ কিঙ্কর, তাঁহাদের কার্যে, তাঁহাদের বিপদে বিনা অর্থে, বিনা স্বার্থে, বিনা লাভে জীবন দিতে প্রস্তুত।

হাসান সন্ধ্যাকালীন উপাসনা সমাধা করিয়া তস্বি (জপমালা) হস্তে উপাসনা-মন্দিরের সম্মুখে পদচালনা করিয়া ঈশ্বরের নাম জপ করিতেছেন, এমন সময় একজন ফকির জাতীয় প্রথানুসারে অভিবাদন করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। ফকিরের মলিন বেশ, শতগ্রন্থিযুক্ত পিরহান, মলিন বস্ত্রে শির আবৃত, গলায় প্রস্তরের তস্বি, হস্তে কাষ্ঠযষ্টি। হাসানের কিঞ্চিৎ দূরে দণ্ডায়মান হইয়া সেই বৃদ্ধ বলিলেন, "প্রভো! আমি একটি পর্বতের উপর বসিয়াছিলাম। দেখি যে, একজন কাসেদ্ আসিতেছে, হঠাৎ ঈশ্বরের নাম করিয়া সেই কাসেদ্ ভূতলে পতিত হইল। কারণ কিছুই জানিতে পারিলাম না। নিকটস্থ হইয়া দেখি যে, একটি লৌহশর তাহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া পৃষ্ঠদেশ পার হইয়া, কঠিন প্রস্তর খণ্ড বিদ্ধ করিয়াছে। শোণিতের ধারা বহিয়া চলিতেছে। কোথা হইতে কে শর নিপে করিল, এমন লঘুহস্তে শর নিক্ষেপে সুনিপুণ যে, এক বাণে পথিকের হৃদয় বিদ্ধ করিয়া পৃষ্ঠ পর্যন্ত ভেদ করিল। তখনও তাহার প্রাণ বিয়োগ হয় নাই। দুই একটি কথা অস্ফুট স্বর যাহা শুনিলাম, আর ভাবেও যাহা বুঝিতে পারিলাম, তাহার মর্ম এই যে হজরত মাবিয়া আপনার নিকট কাসেদ্

পাঠাইয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত পীড়িত, বাঁচিবার ভরসা অতি কম। জীবনে শেষ দেখাশুনার জন্যই আপনাকে সংবাদ দিতে বোধ হয়, কাসেদ্ আসিতেছিল, আমি দ্রুতগামী অশ্বের পদধ্বনি শুনিয়া সম্মুখে লক্ষ্য করিলাম। দেখিলাম, এজিদ্ অশ্বোপরি বীরসাজে ধনুহস্তে বেগে আসিতে। পৃষ্ঠের বাম পার্শ্বে তূণীর ঝুলিতেছে, দেখিয়াই পর্বতের আড়ালে লুকাইলাম। আড়াল হইতে দেখিলাম, এজিদ্ অশ্ব হইতে নামিয়া পথিকের কটিবদ্ধ খুলিয়া, একখানি পত্র লইয়া, অশ্বে কষাঘাত করিতে করিতে চক্ষুর অগোচর হইল। আপনার নিকট সেই সংবাদ দিতে আসিয়াছি। আর আমার কোন কথা নাই।" এই বলিয়া আগন্তুক ফকির পুনারভিবাদন করিয়া একটু দ্রুতপদে চলিয়া গেল। হাসান ভাবিতে লাগিল ফকির কে? কেনই-বা আমাকে এ সংবাদ দিতে আসিয়াছিল? কথার স্বর ও মুখচ্ছবি একেবারে অপরিচিত বলিয়াও বোধ হইল না। অনেকণ পর্যন্ত ফকিরের বিষয় চিন্তা করিয়া তিনি শেষে সাব্যস্ত করিলেন যে, ফকির আর কেহই নয়, এ সেই আবদুল জাব্বার। একে একে আবদুল জাব্বারের অবয়ব ভাবভঙ্গি কথার স্বরে নিশ্চয়ই প্রমাণ হইল যে, আর কেহই নয়, এ সেই আবদুল জাব্বার। কী আশ্চর্য! মানুষের অবস্থা কখন কিরূপ হয় কিছুই জানিতে পারা যায় না। হজরত মাবিয়ার কথা যেরূপ শুনিলাম ইহাতে তাহার জীবনাশা অতি কমই বোধ হয়। যাহা হউক, হোসেনের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা করিতে হয় করিব; এই বলিয়া ত৾না৾ নিজ গৃহাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

অষ্টম প্রবাহ

মাবিয়া পীড়িত; এক্ষণে নিজবলে আর উঠিবার শক্তি নাই। এজিদের মুখ দেখিবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। দামেস্করাজ্য যাঁহাদের পৈতৃক রাজ্য, তাঁহাদিগকে দিয়া যাইবেন, মনে মনে স্থির করিয়া হাসান-হোসেনকে আনিবার জন্য কাসেদ্ পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা এ পর্যন্ত আসিতেছেন না, সেজন্য মহাব্যস্ত ও চিন্তিত। সেই কাসেদের অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছে,

তাহা এ পর্যন্ত কিছুই জানিতে পারেন নাই| প্রধান উজির হামান্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাসান-হোসেনের এত দিন না-আসিবার কারণ কী?"

হামান্ উত্তর করিলেন, "কাসেদ্ যদি নির্বিঘ্নে মদিনায় যাইয়া থাকে, তবে হাসান-হোসেনের না-আসিবার কারণ আমার বুদ্ধিতে আসিতেছে না| আপনার পীড়ার সংবাদ পাইয়া তাঁহারা যে নিশ্চিন্তভাবে রহিয়াছেন, ইহা কখনোই বিশ্বাস্য নহে| আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, কাসেদের কোন অমঙ্গল ঘটিয়া থাকিবে|"

এজিদ্ সেই রাত্রি হইতে আর মাবিয়ার সম্মুখে যাইতেন না| গুপ্তভাবে অর্থা মাবিয়ার দৃষ্টির অগোচরে কোন স্থানে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তাঁহার প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন| হামানের সঙ্গে যে কথা কহিতেছেন, তাহাও তিনি তাঁহার নির্দিষ্ট স্থানে থাকিয়া সমুদয় শুনিতেছেন| মাবিয়া ক্ষণকাল পরে আবার মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন, "এ রাজ্যে মঙ্গলের আর সম্ভাবনা নাই| নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, কাসেদ্ কোন বিপদে পড়িয়াছে; তাঁহারা মদিনায় না থাকিলে অবশ্যই কাসেদ্ ফিরিয়া আসিত| তাহা যাহাই হউক, আমার চিরবিশ্বাসী বহুদর্শী মোস্‌লেমকেই পুনরায় মদিনায় পাঠাও| আর হাসান-হোসেনের নিকট আমার পক্ষ হইতে একখানি প্রার্থনাপত্র লিখিয়া মোস্‌লেমের সঙ্গে দাও| তাহাতে লিখিয়া দিও যে, আমার বাঁচিবার আশা নাই| পাপময় জগ পরিত্যাগের পূর্বে আপনাদের উভয় ভ্রাতাকে একবার স্বচক্ষে দেখিতে ইচ্ছা করি| আরো একটি কথা আমি স্থির সঙ্কল্পে মনস্থ করিয়াছি-আপনাদের এই পৈতৃক দামেস্করাজ্য আপনাদিগকে প্রত্যর্পণ করিব, আমার আর রাখিবার সাধ্য নাই| এ কথাও লিখিয়ো যে, আপনাদিগকে এই সিংহাসনে বসিতে দেখিলেই আমার জীবন সার্থক হইবে| হামান! মোস্‌লেমকে বিশেষ সাবধানে মদিনায় পাঠাইও| নানা প্রকারের সন্দেহ আমার মনে উপস্থিত ও উদয় হইয়াছে| (এজিদ্ এই মাত্র শুনিয়া হামানের অদৃশ্যে তথা হইতে অতি ত্রস্তে প্রস্থান করিলেন|) এত গোপনে মোস্‌লেমকে পাঠাইবে যে, তাহার সন্ধান

আর একটি প্রাণীও না জানিতে পারে।" হামান বিদায় হইলেন এবং রাজাদেশ প্রতিপালন করিয়া তখনি মোস্লেমকে মদিনায় পাঠাইলেন।

ইমামভক্ত মোস্লেম ঊর্ধ্বশ্বাসে মদিনাভিমুখে চলিলেন। মোস্লেম পাঠকগণের অপরিচিত নহেন। ক্রমে রাজধানী ছাড়িয়া তিনি একটি প্রশস্ত বালুকাময় প্রান্তরের মধ্য দিয়া যাইতেছেন। বালুকাময় ভূমি রৌদ্রের উত্তাপে অগ্নিময় হইয়া মোস্লেমর গমনে বিশেষ বাধা দিতেছে। কি করেন শীঘ্র যাইতে হইবে, কোন দিকে লক্ষ্য নাই, অবিশ্রান্ত যাইতেছেন। অনেক স্থলেই ভূমি সমতল নহে, স্থানে স্থানে প্রস্তরকণার ন্যায় স্তূপাকার বালুকারাশি, পরিণামে প্রস্তরে পরিণত হইবে বলিয়া ভূমি হইতে শিরোত্তোলন করিয়া রহিয়াছে। মোস্লেম দেখিলেন তাঁহার দণি পার্শ্বস্থ স্তূপাকারের আড়াল হইতে চারিজন অস্ত্রধারী পুরুষ বেগে আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। ঐ আক্রমণকারীদিগের মুখ বস্ত্র দ্বারা এরূপে আবৃত যে, তাহাদের স্বরূপ, রূপ ও আকৃতি কিছুই দেখা যাইতেছে না।

মোস্লেম জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "তোমরা কে? কেনই বা আমার গমনে বাধা দিতেছ?"

তাহাদের মধ্য হইতে একজন গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিল, "মোস্লেম! তোমার সৌভাগ্য যে আজ তুমি কাসেদ্ পদে বরিত হইয়াছ। তাহা না হইলে জিজ্ঞাসা করার অবসর পাইতে না, 'তোমরা কে?' এ কথা উচ্চারিত হওয়ার পূর্বেই তোমার শির বালুকায় গড়াগড়ি যাইত, দেহটিও দিব্বি লোহিত রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া ধরাশায়ী হইয়া থাকিত। পরিশ্রম করিয়া আর হাঁটিয়া কষ্ট করিতে হইত না। যাহা হউক, যদি কিছুদিন জগতের মুখ দেখিতে চাও, তবে আর এক পদও অগ্রসর হইও না।"

"কেন হইব না? আমি রাজ-কাসেদ্ হজরত মাবিয়ার পীড়ার সংবাদ লইয়া মদিনা শরিফে ইমাম হাসান-হোসেনের নিকট যাইতেছি, কাহার সাধ্য আমার গতি রোধ করে?"

এই বলিয়াই মোস্‌লেম যাইতে অগ্রসর হইলেন৷ তাহারাও বাধা দিতে লাগিল৷

মোস্‌লেম অসি নিষ্কোষিত করিয়া বলিলেন, "কার সাধ্য? কে মোস্‌লেমের পথরোধ করে? গমনে কে বাধা দেয়?" এই বলিয়া মোস্‌লেম চলিলেন; এত দ্রুতবেগে মোস্‌লেমের তরবারি সঞ্চালিত হইতে লাগিল যে, পরিষ্কৃত অসির চাক্‌চিক্যে সকলের চক্ষে ধাঁধা লাগিয়া গেল, এক পদও আর মোস্‌লেমের দিকে কেহ অগ্রসর হইতে পারিল না৷

উহার মধ্য হইতে একজন হঠা মুখের বস্ত্র খুলিয়া বলিতে লাগিল, "মোস্‌লেম তোমার চক্ষু কোথায়?"

মোস্‌লেমের চক্ষু যেমন তাহার মুখের প্রতি পড়িল, অমনি তরবারি হস্ত হইতে নিক্ষেপ করিয়া অভিবাদনপূর্বক করজোড়ে দণ্ডায়মান রহিলেন৷ এজিদের আদেশে সঙ্গীরা মোস্‌লেমের অঙ্গ হইতে অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লইল৷ মাবিয়ার পত্রখানি এজিদ্‌ স্বহস্তে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, বলিলেন, "যতদিন মাবিয়ার মৃত্যু না হয়, ততদিন তোমাকে বন্দি অবস্থায় নির্জন কারাবাসে থাকিতে হইবে৷ তুমি তো বড় ঈশ্বরভক্ত, মাবিয়ার মৃত্যু কামনাই তোমার আজ হইতে প্রার্থনার এক প্রধান অঙ্গ করিয়া দিলাম৷ যাও, ঐ লৌহশৃঙ্খল পরিয়া অনুচরদিগের সহিত মহানন্দে নাচিতে নাচিতে যেখানে উহারা লইয়া যায়, সেখানে গমন কর৷"

মোস্‌লেম কিছুই বলিলেন না৷ দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া যেন কাষ্ঠ-পুত্তলিকার ন্যায় এজিদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন৷ অনুচরেরা লৌহশৃঙ্খলে মোস্‌লেমের হস্তপদ বন্ধন, শেষে গলদেশে শিকল বাঁধিয়া লইয়া চলিল৷-হায় রে স্বার্থ!! এজিদ্‌ বংশীবাদন করিয়া সঙ্কেত করিবামাত্র একটি বৃহ বালুকাস্তূপের পার্শ্ব হইতে এক ব্যক্তি অশ্ব লইয়া উপস্থিত হইল৷ এজিদ্‌ অশ্বারোহণে নগরাভিমুখে চলিয়া আসিলেন৷ চারিজন প্রহরী মোস্‌লেমকে বন্দি করিয়া ঘিরিয়া লইয়া চলিল৷

নবম প্রবাহ

দামেস্ক রাজপুরীমধ্যে পুরবাসিগণ, দাসদাসীগণ, মহা ব্যতিব্যস্ত। সকলেই বিষাদিত। মাবিয়ার জীবন সংশয়, বাক্‌রোধ হইয়াছে, চক্ষুতারা বিবর্ণ হইয়া ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে, কথা কহিবার শক্তি নাই। এজিদের জননী নিকটে বসিয়া স্বামীর মুখে শরবত দিতেছেন, দাস-দাসীগণ দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে, আত্মীয়স্বজনেরা মাবিয়ার দেহ বেষ্টন করিয়া একটু উচ্চৈঃস্বরে ঈশ্বরের নাম করিতেছেন। হঠা মাবিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া "লা ইলাহা ইলাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্" এই শব্দ করিয়া উঠিলেন; সকলে গোলযোগ করিয়া ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে বলিয়া উঠিলেন, "এবার রক্ষা পাইলেন; এবারে আল্লাহ্ রেহাই দিলেন!" আবার কিঞ্চি বিলম্বে ঐ কয়েকটি কথা ভক্তির সহিত উচ্চারিত হইল। সেবারে আর বিলম্ব হইল না! অমনি আবার ঐ কয়েকটি কথা পুনর্বার উচ্চারণ করিলেন। কেহ আর কিছুই দেখিলেন না। কেবল ওষ্ঠ দুইখানি একটু সঞ্চালিত হইল মাত্র। ঊর্ধ্ব চক্ষু নীচে নামিল। নামিবার সঙ্গে সঙ্গেই চক্ষের পাতা অতি মৃদু মৃদু ভাবে আসিয়া চক্ষুর তারা ঢাকিয়া ফেলিল। নিশ্বাস বন্ধ হইল। এজিদের জননী মাবিয়ার বক্ষে হস্ত দিয়া দেখিয়াই কাঁদিয়া উঠিলেন। সকলেই মাবিয়ার জন্য কাঁদিতে লাগিলেন। এজিদ্ অশ্ব হইতে নামিয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া দেখিলেন, মাবিয়ার চক্ষু নিমীলিত, বক্ষঃস্থল অস্পন্দ; একবার মস্তকে, একবার বক্ষে হাত দিয়াই চলিয়া গেলেন। কিন্তু কেহই এজিদের চক্ষে জল দেখিতে পায় নাই। এজিদ্ পিতার মৃত দেহ যথারীতি স্নান করাইয়া 'কাফন' (কাফন-শবাচ্ছাদন বসন) দ্বারা শাস্ত্রানুসারে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া মৃতদেহের সদ্গতির উপাসনা (জানাজা) করাইতে তাবুতে (শেষ শয়নাসন) শায়ী করাইয়া সাধারণ সম্মুখে আনয়ন করিলেন। বিনা আহ্বানে শত শত ধার্মিক পুরুষ আসিয়া জানাজাক্ষেত্রে মাবিয়ার বস্ত্রাবৃত শবদেহের সমীপে ঈশ্বরের আরাধনার নিমিত্ত দণ্ডায়মান হইলেন। সকলেই করুণাময় ভগবানের নিকট দুই হস্ত তুলিয়া মাবিয়ার আত্মার মুক্তি প্রার্থনা করিলেন। পরে নির্দিষ্ট স্থানে 'দাফন' (মৃত্তিকা প্রোথিত) করিয়া সকলেই স্ব-স্ব গৃহে চলিয়া গেলেন।

মাবিয়ার জীবনের লীলাখেলা একেবারে মিটিয়া গেল। ঘটনা এবং কার্য স্বপ্নব কাহারো কাহারো মনে জাগিতে লাগিল। হাসান-হোসেন মদিনা হইতে দামেস্কের নিকট পর্যন্ত আসিয়া মাবিয়ার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে আর নগরে প্রবেশ করিলেন না। মাবিয়ার জন্য অনেক দুঃখ প্রকাশ করিয়া পুনর্বার মদিনায় যাত্রা করিলেন। মাবিয়া জগতের চক্ষু হইতে অদৃশ্য হইয়াছেন; রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া যে স্থানে গিয়াছেন, তথা হইতে আর ফিরিবেন না, এজিদের মুখও আর দেখিবেন না, এজিদকে পাপকার্য হইতে বিরত এবং হাসান-হোসেনের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ নিবারণ করিতেও আর আসিবেন না, এজিদকে র্ভসনাও আর করিবেন না। এজিদ্ মনে মনে এই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া দামেস্ক রাজসিংহাসনে উপবেশন করিলেন। রাজমুকুট শিরে শোভা পাইতে লাগিল। সত্যবাদী, নিরপেক্ষ ও ধার্মিক মহাত্মাগণ; যাঁহারা হযরত মাবিয়ার স্বপক্ষ ছিলেন, তাঁহাদের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। আমরাও বিষাদ-সিন্ধুর তটে আসিলাম; এজিদ্ এক্ষণে স্বাধীন রাজ্যের রাজা। কখন কাহার ভাগ্যে কি হয়, ইহা ভাবিয়া সকলেই ব্যাকুল। রাজদরবার লোকে লোকারণ্য। পূর্বদিন ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে, শহরের সম্ভ্রান্ত লোকমাত্রই দরবারে উপস্থিত হইবেন। অনেকের মনেই অনেক কথা উঠিল, কি করেন রাজ-আজ্ঞা-নিয়মিত সময়ে সকলেই 'আম' দরবারে উপস্থিত হইলেন। এজিদ্ও উপযুক্ত বেশভূষায় ভূষিত হইয়া সিংহাসনোপরি উপবেশন করিলেন। প্রধানমন্ত্রী মারওয়ান দরবারস্থ সম্ভ্রান্ত-মহোদয়গণকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "আজ আমাদের কী সুখের দিন, আজ আমরা এই দামেস্কের সিংহাসনে নবীনরাজের অধিবেশন দেখিলাম। উপযুক্ত পাত্রেই আজ রাজসিংহাসন সুশোভিত হইয়াছে। সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণ! আজ হইতে আপনাদের দুঃখ ঘুচিল। দামেস্করাজ্যে আজ হইতে যে সুখ-সূর্যের উদয় হইল, তাহা আর অস্তমিত হইবে না। আপনারা এই নবোদিত সূর্যকে কায়মনে পুনরায় অভিবাদন করুন!" সভাস্থ সকলেই নতশিরে এজিদ্কে অভিবাদন করিলেন। মারওয়ান পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "মহোদয়গণ! আমার একটি কথা আছে। আজ মহারাজ এজিদ্ নবীন রাজদণ্ড হস্তে করিয়াছেন, আজই একটি গুরুতর বিচার ভার ইহাকে

বহন করিতে হইতেছে। আপনাদের সম্মুখে রাজবিদ্রোহীর বিচার করিবেন, এই অভিপ্রায়েই আপনাদের আহ্বান করা হইয়াছে।"

মারওয়ানের পূর্ব আদেশানুসারে প্রহরীরা মোস্‌লেমকে বন্ধনদশায় রাজসভায় আনিয়া উপস্থিত করিল। সভাস্থ সকলে মোসলেমের দুরবস্থা দেখিয়া একেবারে বিস্ময়াপন্ন হইলেন। মাবিয়ার এত বিশ্বাসী প্রিয়পাত্র, এত সম্মানাস্পদ, এত স্নেহাস্পদ, সেই মোসলেমের এই দুরবস্থা? কী আশ্চর্য! আজিও মাবিয়ার দেহ ভূগর্ভে বিলীন হয় নাই, অনেকেই আজ পর্যন্ত শোকবস্ত্র পরিত্যাগ করেন নাই, মাবিয়ার নাম এখনো সকলের জিহ্বাগ্রেই রহিয়াছে? আজ সেই মাবিয়ার প্রিয় বন্ধুর এই দুর্দশা! কী সর্বনাশ! এজিদের অসাধ্য কী আছে? অনেকেই মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, আর মঙ্গল নাই। দামেস্ক রাজ্যের আর মঙ্গল নাই। কী পাষাণ হৃদয়! উঃ!! এজিদ্‌ কী পাষাণহৃদয়!!! কাহারো মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিবার সাহস হইল না; সকলেই কেবল মনে মনে ঈশ্বরের নাম জপ করিতে লাগিলেন; মোস্‌লেম চিন্তায় ও মনস্তাপে ক্ষীণকায় হইয়াছেন, এজিদ্‌ বলিয়াছেন, মাবিয়ার মৃত্যুতেই তাঁহার মুক্তি কিন্তু মাবিয়া আছেন কি-না, মোস্‌লেম তখন তাহাও নিশ্চয় করিতে পারিলেন না। কেহ কোন কথা তাঁহাকে বলিতে পারিবেন না এবং তাঁহার কথাও কেহ জানিতে পারিবেন না,-পূর্ব হইতেই এজিদের এই আজ্ঞা ছিল। সুতরাং মোস্‌লেমকে কোন কথা বলে কাহার সাধ্য?

নগরের প্রায় সমুদয় ভদ্রলোককে একত্র দেখিয়া মোস্‌লেম কিছু আশ্বস্ত হইলেন। মনে মনে জানেন, তিনি কোন অপরাধে অপরাধী নহেন। রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছেন, ইহাতে যদি এজিদ্‌ অন্যায়াচরণ করেন, তবে একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহাকেও কিছু বলিবেন না, মুক্তিলাভের প্রার্থনাও করিবেন না। মাবিয়ার আজ্ঞামাত্রেই হাসান-হোসেনের নিকট মদিনায় যাইতেছিলেন; ইহাতে যদি অপরাধের কার্য হয়, আর সেই অপরাধেই যদি প্রাণ যায়, তাহাও স্বীকার, তথাপি চিত্ত বিচলিত করিবেন না, মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সভ্যগণকে সম্বোধনপূর্বক মারওয়ান কহিলেন, "এই

ব্যক্তি রাজবিদ্রোহী, আজ ইহারই বিচার হইবে। আমাদের নবদণ্ডধর আপনাদের সম্মুখে ইহার বিচার নিষ্পত্তি করিবেন, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়।"

এজিদ্ বলিলেন, "এই কাসেদ্ বিশ্বাসী নহে। যাহারা ইহাকে বিশ্বাসী বলিয়া স্থির করিয়াছে এবং ইহার অনুকূলে যাহারা কিছু বলিবে তাহারাও বিশ্বাসী নহে। আমার বিবেচনায় ইহার স্বপ লোকমাত্রেই অবিশ্বাসী-রাজবিদ্রোহী।"

সকলের শরীর রোমাঞ্চিত হইল, ভয়ে হৃদয় কাঁপিতে লাগিল, আকণ্ঠ শুকাইয়া গেল। যাঁহারা মোসলেমের সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মুখ একেবারে বন্ধ হইয়া গেল।

এজিদ্ পুনর্বার বলিতে লাগিলেন, "এই মিথ্যাবাদী বিশ্বাসঘাতক, আমার বিবাহ পয়গাম লইয়া জয়নাবের নিকট গিয়াছিল। আমার পয়গাম গোপন করিয়া আমার চিরশত্রু হাসান, যাহার নাম শুনিলে আমার দিগ্বিদিক্ জ্ঞান থাকে না, সেই হাসানের পয়গাম জয়নাবের নিকট বলিয়া, জয়নাবের সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছে। আমি নিশ্চয় জানি, আমার পয়গাম জয়নাবের কর্ণগোচর হয় নাই। আমার নাম শুনিলে জয়নাব কখনোই হাসানকে 'কবুল' করিত না। হাসানের অবস্থা জয়নাবের অবিদিত কিছুই নাই। কেবল মিথ্যাবাদীর চক্রান্তে জয়নাবরত্ন শত্রুহস্তে পতিত হইয়াছে। আরো কথা আছে। এই মিথ্যাবাদী যাহা বলে, তাহাই যদি সত্য বিবেচনা করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও ইহার অপরাধ আরো গুরুতর হইয়া দাঁড়ায়। আমার চিরশত্রুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া আমারই সর্বনাশ করিয়াছে। হাসানের পয়গাম জয়নাবের নিকট লইয়া যাইতে আমি ইহাকে নিয়োজিত করি নাই। ইহার অপরাধের শাস্তি হওয়া আবশ্যক। না জানিয়া এই কার্য করিয়াছে, তাহাও বলিতে পারি না। জয়নাব লাভের জন্য আমি যাহা করিয়াছি, তাহা কে না জানে? মোস্লেম কি জানে না যে, যে জয়নাবের জন্য আমি সর্বস্ব পণ করিয়া শেষে জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত

ছিলাম, সেই জয়নাবের বিবাহে আমার পক্ষে উকীল নিযুক্ত হইয়া অপরের সঙ্গে বিবাহ স্থির করিয়া আসিল, ইহা অপেক্ষা বিশ্বাসঘাতকতা আর কি আছে? আর একটি কথা। এই সকল কুকার্য করিয়াও এই ব্যক্তি ক্ষান্ত হয় নাই; আমারই সর্বনাশের জন্য,-আমাকেই রাজ্য হইতে বঞ্চিত করিবার নিমিত্ত, আমাকেই পথের ভিখারী করিবার আশয়ে, মাবিয়ার পত্র লইয়া হাসানের নিকট মদিনায় যাইতেছিল। অতএব আমার এই আজ্ঞা যে, অবিলম্বেই মোসলেমের শিরচ্ছেদন করা হউক।" সরোষে কাঁপিতে কাঁপিতে এজিদ্ পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "সে দণ্ড বধ্যভূমিতে হইবে না, অন্য কোন স্থানেও হইবে না, এই সভাগৃহে আমার সম্মুখেই আমার দণ্ডাজ্ঞা প্রতিপালিত হউক।"

মারওয়ান বলিলেন, "রাজাজ্ঞা শিরোধার্য। কিন্তু প্রকাশ্য দরবারে দণ্ডবিধান রাজনীতি বিরুদ্ধ।"

এজিদ্ বলিলেন, "আমার আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়। যে ইহার বিরোধী হইবে, তাহারও ঐ শাস্তি। মারওয়ান! সাবধান!"

সকলের চক্ষু যেন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। এজিদের মুখের কথা মুখে থাকিতে থাকিতেই অভাগ্য মোসলেমের ছিন্নশির ভূতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল! জিঞ্জিরাবদ্ধ দেহ শোণিতাক্ত হইয়া সভাতলে পড়িয়া সভ্যগণের মোহ ভঙ্গ করিল! তাঁহারা চাহিয়া দেখিলেন, মোস্লেম আর নাই। রক্তমাখা দেহ মস্তক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ধরাতলে গড়াগড়ি যাইতেছে! মোসলেমের পবিত্র শোণিত-বিন্দুর পরমাণু অংশে দামেস্ক-রাজ-ভবনের পবিত্রতা, সিংহাসনের পবিত্রতা, দরবারের পবিত্রতা, ধর্মাসনের পবিত্রতা, মাবিয়া যাহা বহু কষ্টে সঞ্চয় করিয়াছেন, সেই সমস্ত পবিত্রতা আজ মোস্লেমের ঐ শোণিতবিন্দুর প্রতি পরমাণুতে মিশিয়া বিকট অপবিত্রতার আসন পাতিয়া দিল। মোস্লেমের দেহবিনির্গত রক্তাধারে "এজিদ্! ইহার শেষ আছে!" এই কথা কয়েকটি প্রথম অঙ্কিত হইয়া রক্তস্রোত সভাতলে বহিয়া চলিল। এজিদ্ সগর্বে বলিতে লাগিলেন, "অমাত্যগণ! প্রধান প্রধান সৈনিক ও সৈন্যাধ্যগণ! এবং সভাস্থ মহোদয়গণ! আপনারা সকলেই মনোযোগপূর্বক শ্রবণ করুন।

আমার আজ্ঞা যে কেহ অমান্য করিবে, যে কেহ তাহার অণুমাত্র অবহেলা করিবে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই মোস্‌লেমের ন্যায় শাস্তি ভোগ করিবে। আমার ধনবল, সৈন্যবল, বাহুবল, সকলই আছে, কোন বিষয়ে আমার অভাব নাই। হাসান-হোসেনের যাহা আছে, তাহা কাহারো অজ্ঞান নাই। সেই হাসানের এত বড় সাহস! এত বড় স্পর্ধা! ভিখারিণীর পুত্র হইয়া রাজরাণীর পাণিগ্রহণ!-যে জয়নাব রাজরাণী হইত, সেই ভিখারিণীর পুত্র তাহারই পাণিগ্রহণ করিয়াছে। আমি উহার বিবাহের সাধ মিটাইব। জয়নাবকে লইয়া সুখভোগ করিবার সমুচিত প্রতিফল দিব। কে রক্ষা করিবে? কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে? এজিদ্‌ জগতে থাকিতে জয়নাবকে লইয়া সে কখনোই সুখী হইতে পারিবে না। এখনো সে আশা আমার অন্তরে আছে, যে আশা একপ্রকার নিরাশ হইয়াছে, হাসান বাঁচিয়া থাকিতে জয়নাব লাভ হইবার আর সম্ভাবনা নাই। তথাচ সেই মহা-আসক্তি আগুনে এজিদের অন্তর সর্বদা জ্বলিতেছে। যদি আমি মাবিয়ার পুত্র হই, তবে হাসান-হোসেনের বংশ একেবারে নিপাত না করিয়া জগ পরিত্যাগ করিব না। শুধু হাসানের মৃতদেহ দেখিয়াই যে, সে মহাগ্নি নির্বাপিত হইবে, তাহা নহে; হাসানের বংশ মধ্যে সকলের মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিয়াই যে এজিদ্‌ ক্ষান্ত হইবে তাহাও নহে। মোহাম্মদের বংশের একটি প্রাণী বাঁচিয়া থাকিতে এজিদ্‌ ক্ষান্ত হইবে না; তাহার মনোবেদনাও মন হইতে বিদূরিত হইবে না। আমার অভাব কী? কাহারো সাহায্য চাহি না; হিতোপদেশ অথবা পরামর্শের প্রত্যাশা রাখি না। যাহা করিব, তাহা মনেই থাকিল। তবে এইমাত্র বলি যে, হাসান-হোসেনের এবং তাহাদের বংশানুবংশ আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের প্রতি এজিদ্‌ যে দৌরাত্ম্য-অগ্নি জ্বালাইয়া দিবে, যদি তাহা কখনো নিবিয়া যায়, যাইতে পারে, কিন্তু সে তাপ 'রোজ কিয়ামত' জগতের শেষ দিন পর্যন্ত মোহাম্মদীয়গণের মনে একইভাবে জাগরিত থাকিবে। আবার যাহারা হাসান-হোসেনের বেশি ভক্ত, তাহারা আজন্মকাল ছাতি পিটিয়াও 'হায় হাসান! হায় হোসেন!' বলিয়া কাঁদিতে থাকিবে।"

সভ্যগণকে এই সকল কথা বলিয়া এজিদ্ পুনরায় মারওয়ানকে বলিল, "হাসান-হোসেনের নিকট যে পত্র পাঠাইবে, সেই পত্রখানা পাঠ করিয়া ইহাদিগকে একবার শুনাইয়া দাও, ইহাদিগের মধ্যে মোহাম্মদভক্ত অনেক আছেন|" মারওয়ান পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন,-

"হাসান! হোসেন!

তোমরা কি এ পর্যন্ত শুন নাই যে, মহারাজাধিরাজ এজিদ্ নামদার মধ্যাহ্নকালীন সূর্যসম দামেস্কসিংহাসনে বিরাজ করিতেছেন| অধীনস্থ রাজা প্রজা মাত্রেই তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়া কেহ বা উপঢৌকন প্রেরণ, কেহ বা স্বয়ং আসিয়া অবনতশিরে চির-অধীনতা স্বীকার করিয়াছেন; আপন আপন রাজ্যের নির্ধারিত দেয় করে দামেস্ক রাজভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছেন| তোমাদের মক্কা-মদিনার খাজনা আজ পর্যন্ত না আসিবার কারণ কি? স্বয়ং মহারাজাধিরাজ দামেস্কাধিরাজের দরবারে উপস্থিত হইয়া, নতশিরে ন্যূনতা স্বীকারে রাজসিংহাসন চুম্বন কর| আর এই পত্র প্রাপ্ত হইয়া এজিদ্ নামদারের নামে খো৆বা পাঠ করিবে, ইহার অন্যথাচরণ হইলেই রাজদ্রোহীর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে|

মারওয়ান, প্রধানমন্ত্রী|"

পত্র পাঠ শেষ হইল| তখনই উপযুক্ত কাসেদের হস্তে পত্র দিয়া নবীন রাজা সভাভঙ্গের অনুমতি করিলেন| অনেকেই বিষাদনেত্রে অশ্রুপাত করিতে করিতে সভাগৃহ হইতে বহির্গত হইলেন|

দশম প্রবাহ

নূরনবী মোহাম্মদের রওজায় অর্থা৆ সমাধি প্রাঙ্গণে হাসান-হোসেন, সহচর আবদুল্লাহ্ ওমর এবং আবদুর রহমান একত্র বসিয়া পরামর্শ করিতেছেন| যখন কোন বিপদভার মস্তকে আসিয়া পড়ে, কোনরূপ গুরুতর কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে হয়, অথবা কোন অভাবনীয় চিন্তা, স৆যুক্তি, স৆পরামর্শ করিবার আবশ্যক হইয়া উঠে, হাসান-হোসেন উভয়ে মাতামহের

সমাধিপ্রাঙ্গণে আসিয়া যুক্তি, পরামর্শ এবং কর্তব্য বিষয়ে মত স্থির করিতেন। আজ কিসের মন্ত্রণা? কী বিপদ? বাহ্যিকভাবে, মুখের আকৃতিতে স্পষ্টই যেন কোন ভয়ানক চিন্তার চিত্র চিত্রিত। কী চিন্তা? পাঠক! ঐ দেখুন, সমাধিপ্রাঙ্গণের সীমানির্দিষ্ট স্থানের নিকটে দেখুন, কে দাঁড়াইয়া আছে।

পাঠক! যে লোক দাঁড়াইয়া আছে, উহাকে কি কখনো দেখিয়াছেন? একটু স্মরণ করুন, অবশ্যই মনে পড়িবে। এই আগন্তুক দামেস্কের কাসেদ। আর হাসানের হস্তে ঐ যে কাগজ দেখিতেছেন, ঐখানি সেই পত্র-যাহা দামেস্কের রাজদরবারে মারওয়ানের মুখে শুনিয়াছিলেন। ওমর বলিলেন, "কালে আরো কতই হইবে! এজিদ্ মাবিয়ার পুত্র। যে মাবিয়া নূরনবী হজরত মোহাম্মদের প্রধান ভক্ত ছিলেন, দেহ-মন-প্রাণ সকলই আপনাদের মাতামহের চরণে সমর্পণ করিয়াছিলেন, আজ তাঁহার পুত্র মক্কা-মদিনার খাজনা চাহিতেছে, তাহার নামে খো্বা পাঠ করিতে লিখিয়াছে। কী আশ্চর্য! কালে আরো কতই হইবে, তাহা কে বলিতে পারে?"

আবদুর রহমান বলিলেন, "এজিদ্ পাগল হইয়াছে! নিশ্চয় পাগল! পাগল ভিন্ন আর কী বলিব? এই অসীম জগতে এমন কেহই নাই যে, আমরা বাঁচিয়া থাকিতে মক্কা-মদিনার কর চাহিতে পারে? এজিদ্ যে মুখে এই সকল কথা বলিয়াছে, সেই মুখের শাস্তি বিশেষ করিয়া দেওয়া উচিত। ইহার পরামর্শ আর কি? আমার মতে, কাসেদকে পত্রসহ অপমান করিয়া তাড়াইয়া দেওয়াই সমুচিত বিধি। ঐ পাপপূর্ণ কথা-অঙ্কিত পত্র পুণ্যভূমি মদিনায় থাকিবার উপযুক্ত নহে।"

ওমর বলিলেন, "ভাই! তোমার কথা আমি অবহেলা করিতে পারি না। দুরাত্মার কী সাহস! কোন্ মুখে এমন কথা উচ্চারণ করিল; কি সাহসে পত্র লিখিয়া কাসেদের হস্তে দিয়া পাঠাইল! উহার নিকট কি কোন ভাল লোক নাই? এক মাবিয়ার সঙ্গে সঙ্গে দামেস্ক হইতে কি সকলেই চলিয়া গিয়াছে?"

আবদুর রহমান বলিলেন, "পশুর নিকটে কি মানুষের আদর আছে? হামান্-নামমাত্র মন্ত্রী৷ হামানের কোন কথাই এজিদ্ শুনিতে চায় না৷ মারওয়ানই আজকাল দামেস্কের প্রধানমন্ত্রী, সভাসদ, প্রধান মন্ত্রদাতা, এজিদের প্রধান গুরু; বুদ্ধি, বল, যাহা কিছু সকলই মারওয়ান৷ এই তো লোকের মুখে শুনিতে পাই৷"

হাসান বলিলেন, "এ যে মারওয়ানের কার্য তাহা আমি আগেই জানিতে পারিয়াছি৷ তাহা যাহাই হউক, পত্র ফিরিয়া দেওয়াই আমার বিবেচনা৷"

হজরত ইমাম হাসানের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হজরত হোসেন একটু রোষভাবে বলিতে লাগিলেন, "আপনারা যাহাই বলুন, আর যাহাই বিবেচনা করুন, পত্রখানা শুদ্ধ ফেরত দেওয়া আমার ইচ্ছা নহে৷ কমজা বাঁদীবাচ্চা কী ভাবিয়াছে? ওর এতদূর স্পর্ধা যে, আমাদিগকে উহার অধীনতা স্বীকার করিতে পত্র লিখে? আমরা উহাকে শাহানশাহা (সম্রাট্) বলিয়া মান্য করিব? যাহাদের পিতার নামে দামেস্করাজ্য কাঁপিয়া উঠিয়াছে, তাহাদের আজ এতদূর অপমান!-যাঁহার পদভরে দামেস্ক রাজ্য দলিত হইয়া বে সিংহাসন পাতিয়া বসিবার স্থান দিয়াছে, নিয়মিতরূপে কর যোগাইয়াছে, আমরা তাঁহারই সন্তান, তাঁহারই উত্তরাধিকারী, আমরাই দামেস্কের রাজা, দামেস্কের সিংহাসন আমাদেরই বসিবার স্থান৷ কমজা কাফের সেই সিংহাসনে বসিয়া আমাদেরই মক্কা-মদিনার খাজনা চাহিয়াছে, ইহা কি সহ্য হয়?" হাসান বলিলেন, "ভ্রাতঃ! একটু বিবেচনা করিয়া কার্য করাই ভাল; আমরা অগ্রে কিছুই বলিব না, এজিদ্ যাহা লিখিয়াছেন, তাহার কোন উত্তরও করিব না! দেখি, কোন্ পথে যায়, কি উপায় অবলম্বন কর!"

আবদুর রহমান বলিলেন, "ভ্রাতঃ! আপনার কথা যুক্তিসঙ্গত৷ কিন্তু বিষধর সর্প যখন ফণা উঠাইয়া দাঁড়ায়, অমনি তাহার মাথা চূর্ণ করা আবশ্যক, নতুবা সময় পাইলে নিশ্চয়ই দংশন করে৷ এজিদ্ নিশ্চয়ই কালসর্প৷ উহার মস্তক প্রথম উত্থানেই চূর্ণ করিয়া ফেলা বিধেয়; বিশেষতঃ আপনার প্রতি উহার বেশি লক্ষ্য৷"

গম্ভীরভাবে হাসান কহিলেন, "আর একবার পরীক্ষা করিয়া দেখি; এখনো সে সময় হয় নাই। এবারে নিরুত্তরই সদুত্তর মনে করিয়াছি।"

হোসেন বলিলেন, "আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য। কিন্তু একেবারে নিরুত্তর হইয়া থাকা আমার বিবেচনায় যুক্তিযুক্ত নহে। আপনার আদেশ লঙ্ঘন করিব না। আমি কাসেদকে বিদায় করিতেছি। পত্রখানা আমার হস্তে প্রদান করুন।"

হোসেনের হস্তে পত্র দিয়া হাসান রওজা হইতে নিকটস্থ উপাসনা মন্দিরাভিমুখে চলিয়া গেলেন। কাসেদ্‌কে সম্বোধন করিয়া হোসেন বলিতে লাগিলেন, "কাসেদ্! আজ আমি রাজনীতির মস্তকে শত পদাঘাত করিতাম, আজ আমি চিরপদ্ধতি প্রাচীন নীতি উপেক্ষা করিয়া এ পত্রের সমুচিত উত্তর বিধান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াও ভ্রাতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন মহাপাপ জানিয়া তোমার প্রাণ তোমাকে অর্পণ করিলাম। কমজা এজিদ্ যে পত্র দিয়া তোমাকে মদিনায় পাঠাইয়াছে, ইহার প্রতি অক্ষরে শত শত বার পাদুকাঘাত করিলেও আমার ক্রোধের অণুমাত্র উপশম হয় না। কি করি, ধর্মগ্রন্থে লিখিত ভাষার অক্ষর ইহাতে সন্নিবেশিত আছে মনে করিয়াই তাহা করিলাম না। ফিরিয়া গিয়া সেই কমজাকে এই সকল কথা অবিকল বলিয়ো এবং দেখাইও যে, তাহার পত্রের উত্তর এই।-"

এই কথাগুলি বলিয়া পত্রখানি শতখণ্ড করিয়া কাসেদের হস্তে দিয়া হোসেন আবার কহিলেন, "যাও!-ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া যাও যে, আজ এই উপস্থিত সন্ধ্যাতেই তোমার জীবনের শেষসন্ধ্যা হইতে মুক্তি পাইলে!" হোসেন এই বলিয়া, কাসেদের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিলেন।

এদিকে সন্ধ্যাকালীন উপাসনা সময়ে আহ্বানসূচক সুমধুর ধ্বনি (আজান) ঘোষিত হইল; সকলেই উপাসনা করিতে গমন করিলেন। কাসেদের প্রত্যাগমনের পূর্বেই এজিদ্ সমরসজ্জায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সৈন্যগণের পরিচ্ছদ, অস্ত্রশস্ত্রের পারিপাট্য, আহারীয় দ্রব্যের সংগ্রহ, পানীয় জলের সুযোগ, দ্রব্যজাত বহনোপযোগী বাহন ও বস্ত্রাবাস প্রভৃতি যাহা যাহা

আবশ্যক, ত৷সমস্তই প্রস্তুত করিয়াছিলেন৷ তিনি নিশ্চয়ই জানিয়াছিলেন যে, পত্র পাইয়া হাসান-হোসেন একেবারে জ্বলিয়া উঠিবে৷ কাসেদের প্রাণ লইয়া দামেস্কে ফিরিয়া আসা সন্দেহ বিবেচনা করিয়া গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াছিলেন৷ ভাবিয়াছিলেন, নিশ্চয়ই যুদ্ধ হইবে৷ কেবল সংবাদপ্রাপ্তির অপেক্ষায় ছিলেন মাত্র৷

একদিন আপন সৈন্য-সামন্তগণকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া প্রথমতঃ অশ্বারোহী সৈন্যদিগের যুদ্ধকৌশল ও অস্ত্রচালনা দেখিয়া পরে পদাতিক সৈন্যের ব্যূহনির্মাণের নৈপুণ্য, আত্মরক্ষা করিয়া বিপক্ষের প্রতি অস্ত্রচালনের সুকৌশল এবং সমরপ্রাঙ্গণে পদচালনার চাতুর্য দেখিয়া এজিদ্ মহানন্দে বলিতে লাগিলেন, "আমার এই শিক্ষিত সৈন্যগণের অস্ত্রের সম্মুখে দাঁড়ায়, এমন বীরপুরুষ আরব দেশে কে আছে? এমন সুশিক্ষিত সাহসী সৈন্য কাহার আছে? ইহাদের নির্মিত ব্যূহ ভেদ করিয়া যুদ্ধ জয়ী হওয়া কাহার সাধ্য? হাসান তো দূরের কথা, তাহাদের পিতা যে অত বড় যোদ্ধা ছিল, সেই আলীও যদি কবর হইতে উঠিয়া যুদ্ধক্ষেত্রর সম্মুখীন হয়, তাহা হইলেও তাহাদের পরাজয় ভিন্ন জয়ের আশা নাই৷"

এজিদ্ এইরূপ আত্মগৌরব ও আত্মপ্রশংসায় মত্ত ছিলেন, এমন সময়ে মদিনা হইতে কাসেদ আসিয়া সমুচিত অভিবাদনপূর্বক এজিদের হস্তে প্রত্যুত্তরপত্র দিয়া, হোসেন যাহা যাহা বলিয়াছিলেন অবিকল বলিল৷

এজিদ্ ক্রোধে অধীর হইয়া কিঞ্চি৷ উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "সৈন্যগণ! তোমরা আমার দক্ষিণ বাহু, তোমরাই আমার একমাত্র ভরসা৷ আমি তোমাদিগকে যথাযোগ্য পুরস্কারে পুরস্কৃত করিয়াছি, পূর্ব হইতেই বেতন সংখ্যা দ্বিগুণ করিয়া দিয়াছি, যে যেমন উপযুক্ত, তাহাকে সেই প্রকার সম্মানে সম্মানিত করিয়াছি৷ এতদিন তোমাদিগকে যত্ন করিয়া প্রতিপালন করিয়াছি৷ আজ আমার এই আদেশ যে, এই সজ্জিত বেশ আর পরিত্যাগ করিয়ো না, হস্তস্থিত অসিও আর কোষে রাখিয়ো না৷ ধনুর্ধরগণ! তোমরা আর তূণীরের দিকে লক্ষ্য করিয়ো না৷ মদিনা সম্মুখ ভিন্ন আর পশ্চা৷ করিয়ো না৷ এই বেশেই এই যাত্রাই শুভযাত্রা জ্ঞান করিয়া হাসান-হোসেন-বধে এখনই যাত্রা কর৷ যত শীঘ্র পার প্রথমে হাসানের মস্তক

আনিয়া আমাকে দেখাও। লক্ষ টাকা পুরস্কার। আমি নিশ্চয়ই জানি, তোমরা মনোযোগী হইয়া একটু চেষ্টা করিলেই উভয়ের মস্তক তোমাদের হস্তেই দামেস্কে আনীত হইবে। আমার মন ডাকিয়া বলিতেছে, তোমাদের তরবারি সেই উভয় ভ্রাতার শোণিতপানে লোলুপ রহিয়াছে।"

সৈন্যগণকে ইহা বলিয়া মন্ত্রীকে বলিতে লাগিলেন, "ভাই মারওয়ান! তুমি আমার বাল্য সহচর। আজ তোমাকেই আমার প্রতিনিধিস্বরূপ এই বীরদলের অধিনায়ক হইতে হইবে। তোমাকেই সৈনাপত্যের ভার দিয়া, হাসান-হোসেনের বধসাধনের জন্য মদিনায় পাঠাইতেছি। যদি এজিদের মান রক্ষা করিতে চাও, যদি এজিদের অন্তরাগ্নি নির্বাণ করিতে চাও, যদি এজিদের মনের দুঃখ দূর করিতে চাও, যদি এজিদের জয়নাবলাভের আশাতরী বিষাদ-সিন্ধু হইতে উদ্ধার করিতে চাও, তবে এখনই অগ্রসর হও, আর পশ্চাতে ফিরিয়ো না। পূর্ব হইতেই সকলই আমি সমুচিতরূপে আয়োজন করিয়া রাখিয়াছি, আজ এজিদের প্রাণ তোমারই হস্তে সমর্পিত হইল। যেদিন হাসান-হোসেনের মৃত্যুসংবাদ এই নগরে আসিবে, সেইদিন জানিও যে এজিদ পুনর্জীবিত হইয়া দামেস্করাজ-ভাণ্ডারের অবারিত দ্বার খুলিয়া বসিবে। সংখ্যা করিয়া, কী হস্তে তুলিয়া দিবে না, সকলেই যথেচ্ছরূপে যথেচ্ছ বস্তু গ্রহণ করিবে; কাহারো আদেশের অপেক্ষায় থাকিবে না। মারওয়ান! সকল কার্যে ও সকল কথাতেই 'যদি' নামে একটি শব্দ আছে। জগতে আমি যদি কিছু ভয় করি, তবে ঐ 'যদি' শব্দেই সময়ে সময়ে আমার প্রাণ কাঁপিয়া উঠে। যদি যুদ্ধে পরাস্ত হও, নিরুৎসাহ হইও না, হাসান-হোসেনের বধ-সঙ্কল্প হইতে কখনোই নিরাশ হইও না, দামেস্কেও ফিরিয়ো না। মদিনার নিকটবর্তী কোন স্থানে থাকিয়া তোমার চিরবন্ধুর চিরশত্রুর প্রাণসংহার করিতে যত্ন করিও। ছলে হউক, বলে হউক, কৌশলে হউক, কিংবা অর্থেই হউক, প্রথমে হাসানের জীবন-প্রদীপ তোমার হস্তে নির্বাণ হওয়ার শুভ সংবাদ আমি শুনিতে চাই। হাসানের প্রাণবিয়োগজনিত জয়নাবের পুনর্বৈধব্যব্রত আমি সানন্দচিত্তে শুনিতে চাই। আর কী বলিব? তোমার অজানা আর কী আছে?"

সৈন্যদিগকে সম্বোধন করিয়া মারওয়ান বলিতে লাগিলেন, "বীরগণ! তোমাদের প্রভুর আজ্ঞা সকলেই স্বকর্ণে শুনিলে। আমার আর বলিবার কিছুই নাই। ভ্রাতৃগণ! এখন একবারে দামেস্করাজের জয়নাদে আকাশ ফাটাইয়া, জগ কাঁপাইয়া, মনের আনন্দে, দ্বিগুণ উসাহে এখনই যাত্রা কর। মারওয়ান ছায়ার ন্যায় তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে।" সৈন্যগণ বীরদর্পে ঘোরনাদে বলিয়া উঠিল, "জয় মহারাজ এজিদের জয়! জয় মহারাজ দামেস্করাজের জয়!!"

কাড়া-নাকাড়া, ডঙ্কা, গুড়্‌গুড়্‌ শব্দে বাজিয়া যেন বিনা মেঘে মেঘগর্জনের ন্যায় অবিরত ধ্বনিত হইতে লাগিল। আজ অকস্মা বিনা মেঘে হৃদয়কম্পন বজ্রধ্বনির ন্যায় ভীমনাদ শ্রবণে নগরবাসীরা ভয়াকুলচিত্তে বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, গগনে মেঘের সঞ্চারমাত্র নাই, কিন্তু রাজপথ প্রস্তর রেণু ও বালুকাকণাতে অন্ধকার; অসংখ্য সেনা রণবাদ্যে মাতিয়া শুভসূচক বিজয় নিশান উড়াইয়া মদিনাভিমুখে চলিয়াছে; নগরবাসিগণের মধ্যে কাহারো মনে ব্যথা লাগিল, কাহারো চক্ষু জলে পূরিল, কেহ কেহ এজিদের জয়রব করিয়া আনন্দানুভব করিল।

এজিদ্‌ মহোসাহে নগরের অন্তঃসীমা পর্যন্ত সৈন্যদিগের সঙ্গে সঙ্গে যাইয়া, মারওয়ান, সৈন্যগণ ও সৈন্যাধ্য অলিদের নিকট বিদায় হইয়া নগরে ফিরিয়া আসিলেন।

একাদশ প্রবাহ

মদিনাবাসীরা কিছুদিন এজিদের পত্র লইয়া বিশেষ আলোচনা করিলেন। সর্বসাধারণের অন্তরেই এজিদের পত্রের প্রতি ছত্র, প্রতি অক্ষর, সুতীক্ষ্ণ তীরের ন্যায় বিঁধিয়াছিল। হাসান-হোসেনের প্রতি এজিদ্‌ যেরূপ অপমানসূচক কথা ব্যবহার করিয়াছে, তাহার শাস্তি কোথায় হইবে, ঈশ্বর যে কী শাস্তি প্রদান করিবেন, তাঁহারা তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। প্রাচীনেরা দিবারাত্রি হাসান-হোসেনের মঙ্গলকামনায় ঈশ্বরসমীপে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। পূর্ণবয়স্কেরা বলিতে লাগিলেন, "আমরা বাঁচিয়া থাকিতে কাহার সাধ্য ইমাম হাসান-হোসেনের প্রতি দৌরাত্ম্য করে? আমরা বাঁচিয়া থাকিতে যে নরাধম ইমামের প্রতি

অযথা ব্যবহার করিবে, তাহাকে শীঘ্রই নরকের জ্বলন্ত অগ্নিরাশির মধ্যে জ্বলিতে হইবে৷" নব্য যুবকেরা বলিতে লাগিলেন, "দামেস্কের কাসেদকে একবার দেখিতে পাইলে মদিনার খাজনা দিয়া বিদায় করিতাম৷ এত দিতাম যে, বহন করিয়া লইয়া যাইতে তাহার শক্তি থাকিত না৷ দেহটি এখানে রাখিয়া শুদ্ধ প্রাণ লইয়া দামেস্কে ফিরিয়া যাইতে হইত৷ স্ত্রীপুরুষমাত্রেই এজিদের নামে শত শত পাদুকাঘাত করিয়াছিলেন৷ কিছুদিন গত হইল, দামেস্কে আর কোন সংবাদ নাই৷ এজিদের আন্দোলন ক্রমে ক্রমে অনেক পরিমাণে কমিয়া আসিল৷

মদিনাবাসীরা আপন আপন গৃহে শুইয়া আছেন, নিশা প্রায় অবসান হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় সহসা নাকাড়ার শব্দ শুনিতে পাইয়া অগ্রে প্রান্তসীমাবাসীরা জাগিয়া উঠিলেন৷ অসময়ে রণবাদ্যের কোন কারণই নির্ণয় করিতে পারিলেন না৷ প্রভাত নিকটবর্তী৷ ইহার সঙ্গে সঙ্গে সেই বাজনাও নিকটবর্তী হইতে লাগিল৷ সূর্যোদয় পর্যন্ত নগরের প্রায় সমস্ত লোকের কানেই সেই তুমুল ঘোর রণবাদ্য প্রবেশ করিয়া দীর্ঘসূত্রীরও নিদ্রাভঙ্গ করিল৷ অনেকে নগরের বাহির হইয়া দেখিলেন যে, বহুসংখ্যক সৈন্য বীরদর্পে গম্য পথ অন্ধকার করিয়া নগরাভিমুখে আসিতেছে৷ সূর্যদেব সহস্র কিরণে মদিনাবাসীদিগকে নিজ মূর্তি দেখাইয়া এজিদের চিহ্নিত পতাকা ও সৈন্যদিগের নূতন সজ্জাও দেখাইলেন৷ সকলেই স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন যে, হাসান-হোসেনকে নির্যাতন এবং তাঁহাদের প্রাণহরণ মানসে এজিদ্ সসৈন্যে সমরে আসিতেছেন৷

আবদুর রহমান আর বিলম্ব করিলেন না৷ দ্রুতগমন করিয়া হাসান-হোসেনের নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত জানাইলেন৷ তাঁহারাও আর কালবিলম্ব না করিয়া এজিদের বিরুদ্ধে জেহাদ (ধর্মযুদ্ধ) ঘোষণা করিয়া যুদ্ধের আয়োজনে ব্যতিব্যস্ত হইলেন৷ মুহূর্ত মধ্যে মদিনার ঘরে ঘরে জেহাদ রবের প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল৷ মোহাম্মদীয়গণ জেহাদের নাম শুনিয়া আহ্লাদে

নাচিয়া উঠিলেন। বিধর্মীর অস্ত্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করিলেই শহীদ (ধর্মযুদ্ধে শোণিতপাতে প্রাণত্যাগে মুক্ত) হইব, স্বর্গের দ্বার শহীদদিগের নিমিত্ত সর্বদাই খোলা রহিয়াছে, ধর্মযুদ্ধে বিধর্মীর অস্ত্রাঘাতে রক্তপ্রবাহে মোহাম্মদীয়গণের সমুদয় পাপবিধৌত হইয়া পবিত্রভাবে পুণ্যাত্মা-রূপধারণে নির্বিচারে যে স্বর্গসুখে সুখী হয়, ইহা মুসলমান মাত্রেরই অন্তরে জাগিতেছে এবং অনন্তকাল পর্যন্ত জাগিবে।

মদিনার বালক, বৃদ্ধ, পূর্ণবয়স্ক সকলেই রণবেশে সুসজ্জিত হইতে লাগিলেন। নগরবাসীরা হাসান-হোসেনকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন। ঘোষণা প্রচার হইতে হইতেই সহস্রাধিক লোক কাহারো আদেশের অপেক্ষা না করিয়া যাহার যে অস্ত্র আয়ত্ত ছিল, যাহার যে অস্ত্র সংগ্রহ ছিল, যে যাহা নিকটে পাইল, তাহাই লইয়া বেগে শত্রুর উদ্দেশে ধাইয়া চলিল। তদ্দৃষ্টে এজিদের সৈন্যগণ আর অগ্রসর হইল না; গমনে ক্ষান্ত দিয়া শিবির নির্মাণে প্রবৃত্ত হইল। নগরবাসীরাও শত্রুপক্ষকে নিরুদ্যম দেখিয়া আর অগ্রসর হইলেন না, নগরেও আর ফিরিলেন না, বৃক্ষমূলে প্রস্তরোপরি স্ব স্ব সুযোগমত স্থান নির্ণয় করিয়া হজরত ইমাম হাসানের অপেক্ষায় রহিলেন। এজিদের সৈন্যগণ বহুমূল্য বস্ত্রাদি দ্বারা শিবির রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, এ সংবাদ হোসেনের নিকট পাঠাইলেন।

হাসান ও আবদুর রহমান প্রভৃতি আত্মীয়-স্বজন সমভিব্যাহারে রওজা-মোবারকে যাইয়া হাসান প্রথমেই ঈশ্বরের উপাসনা করিলেন, "দয়াময়! আমার ধনবল, বুদ্ধিবল, সৈন্যবল কিছুই নাই। তোমার আজ্ঞানুবর্তী দাসানুদাস আমি। তুমি দয়া করিয়া এ দাসের অন্তরে যে বল দিয়াছ, সেই ধর্মবলেই আমার সাহস এবং উৎসাহ। দয়াময়! সেই বলের বলেই আমি এজিদেক-এক এজিদ্ কেন, শত শত এজিদেক তোমার কৃপায় তুচ্ছ জ্ঞান করি। কেবল তোমার নাম ভরসা করিয়াই অসীম শত্রুপথে যাইতেছি। তুমিই সহায়, তুমিই রক্ষাকর্তা।"

সকলেই "আমিন আমিন" বলিয়া পরে নূরনবী মোহাম্মদের গুণানুবাদ করিয়া একে একে অশ্বারোহণে রাজপথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নগরবাসীরা ব্যগ্রতা-সহকারে তাঁহাদের

চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। বলিতে লাগিল, "আমরা বাঁচিয়া থাকিতে আপনাকে শত্রুসম্মুখে যাইতে দিব না। আমরা এই চলিলাম। পৃষ্ঠে আঘাত লইয়া আর ফিরিব না। আঘাতিত দেহ আর মদিনাবাসীদিগকে দেখাইব না। হয় মারিব! নয় মরিব!!"

হাসান অশ্ব হইতে নামিয়া বলিলেন, "ভ্রাতৃগণ! ঈশ্বরের রাজ্যে বাস করিয়া ঈশ্বরের কার্যে জীবন শেষ করাই জীবের কর্তব্য! লোকে আমাকে মদিনার রাজা বলে, কিন্তু ভ্রাতৃগণ। তোমরা তাহা কখনোই কর্ণে স্থান দিয়ো না। এ জগতে কেহ কাহারো রাজা নহে, সকলেই সেই মহাধিরাজ সর্বরাজাধিরাজ ওয়াহদাহু লা শরিকালাহু (একমেবাদ্বিতীয়ম্) দয়াময়ের রাজ্যের প্রজা; সকলেই সেই মহান্ রাজার সৃষ্ট, তাঁহার শক্তি মহান্! আমরা সেই রাজার রাজ্যের প্রজা। সাধ্যানুসারে সেই সর্বশক্তিমান, অদ্বিতীয় মহারাজের ধর্মরাজ্য রক্ষণাবেক্ষণ করাই আমাদের সর্বতোভাবে কর্তব্য এবং তাহাই আমাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। সেই ধর্মরাজ্যের বিরোধী হইয়াও অনেক নরাধম এই অস্থায়ী রাজ্যে বাস করিতেছে। আজ তোমার যে নরাধমের বিরুদ্ধে একাগ্রচিত্তে অগ্রসর হইয়াছ, তাহার ধনবল, সৈন্যবল, এত অধিক হয় যে, মনে ধারণা করিতেও শঙ্কা বোধ হয়। যদিও আমাদের অর্থ নাই, যুদ্ধের উপকরণ নাই, বাহ্যিক আড়ম্বরও নাই, তথাচ আমাদের একমাত্র ভরসা-সেই অদ্বিতীয় ভগবান। তাঁহার নামই আমাদের আশ্রয়। সেই নাম সহায় করিয়াই আমরা তাঁহার ধর্মরাজ্য রক্ষা করিব। ভ্রাতৃগণ! যে পাপাত্মার সৈন্যগণ এই পবিত্র ভূমি,-আমাদের জন্মভূমি আক্রমণ করিবার আশা নগরের বাহিরে শিবির স্থাপন করিয়া রহিয়াছে, সেই বিধর্মী এজিদ্ মদিনার খাজনা আমার নিকট চাহিয়া পাঠাইয়াছিল। আমি তাহার উত্তর দিই নাই; সেই আক্রোশে এবং বিবি জয়নাব আমার সহধর্মিণী হইয়াছে, সেই ক্রোধে এজিদ্ আমার প্রাণবধ করিবে। তাহা হইলে এজিদের উভয় উদ্দেশ্যই সাধিত হইবে। কারণ আমার অভাবে মদিনার সিংহাসন তাহারই অধিকৃত হইবে মনে করিয়াছে। সেই বিধর্মী এজিদ্ নূরনবী হজরত মোহাম্মদের বিরোধী ঈশ্বরের বিরোধী পবিত্র কোরানের বিরোধী। নরাধম এমনি পাপী যে,

ভ্রমেও কখনো ঈশ্বরের নাম মুখে আনে না। ভাই সকল! আমরা যে রাজ্যে বাস করি, যে রাজা আমাদের সুবিধার জন্য কত উপকরণ, কত সুখসামগ্রী সৃষ্টি করিয়াছেন, বিনা স্বার্থে, বিনা প্রত্যুপকারের আশয়ে যে রাজা অকাতরে কত কী দান করিয়াছেন, আমরা আজ পর্যন্ত সে দানের উদ্দেশ্যের কণামাত্রও বুঝিয়া উঠিত পারি নাই। সেই অদ্বিতীয় রাজার বিরুদ্ধাচারী আজ পুণ্যভূমি মদিনা আক্রমণ করিতে,-আমাদের স্বাধীনতা হরণ করিতে,-ধর্মপথে বাধা দিতে,-মূল উদ্দেশ্য-আমার জীবন-প্রদীপ নির্বাণ করিতে অগ্রসর হইয়াছে; মহাশক্তিসম্পন্ন মহাপ্রভু জগৎপিতার নামে কত কলঙ্ক রটাইয়াছে। তিনি মহান্, তাঁহার মহিমা অপার, তাঁহাতে ক্রোধ, বিরাগ, অপমান কিছুই নাই। কিন্তু আমরা সহ্যগুণবিহীন মানব,-আমাদের রিপু-সংযম অসাধ্য। যে কেহ ঈশ্বরের বিরোধী, আমরা তাহার বিরোধী। আমরা কি সেই বিরোধীর প্রতিবিধান করিব না? আমাদের অস্ত্র কি চিরকালই কোষে আবদ্ধ থাকিবে? বিধর্মীর মুণ্ডপাত করিতে সেই অস্ত্র কি নিষ্কোষিত হইয়া কাফেরের রক্তে রি ত হইবে না? ঈশ্বরের প্রসাদে জয়-পরাজয় উভয়ই আমাদের মঙ্গল। যদি তাঁহার কৃপায় বিধর্মীয় রক্ত আজ মদিনাপ্রান্তরে বহাইতে পারি, ধর্ম রা ও জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষা করিতে বিধর্মীর অস্ত্রে যদি আত্মবিসর্জন হয়, তাহাতেও অক্ষয় স্বর্গলাভ। ভ্রাতৃগণ! আজ আমাদের এই স্থির প্রতিজ্ঞা যে, হয় জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া মহম্মদীয় ধর্মের উৎকর্ষ সাধন করিব, না হয় অকাতরে রক্তস্রোতে আমাদের এই অস্থায়ী দেহ খণ্ডে খণ্ডে ভাসাইয়া দিব।"

এই পর্যন্ত শুনিয়াই শ্রোতাগণ সমস্বরে "আল্লাহু আক্বার!" বলিয়া পাগলের ন্যায় কাফেরের মুণ্ডপাত করিতে ছুটিলেন। হাসান সকলকে একত্র শ্রেণীবদ্ধ করিয়া লইয়া সমরেক্ষেত্র যাইতে মনস্থ করিয়াছিলেন; তাহা আর হইল না; কেহই আর তাঁহার কথা শুনিল না।

হাসান-হোসেন ও আবদুর রহমান পুনরায় অশ্বারোহণে কিঞ্চিৎ দূর গমন করিয়া যে দৃশ্য দর্শন করিলেন, তাহাতে হাসান আর অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিলেন না। আবদুর রহমানকে বলিলেন, "ভাই! তুমি যত শীঘ্র পার, হোসেনের সহিত যাইয়া মদিনাবাসীদের পৃষ্ঠপোষক

হও। আমি অবলাগণকে সান্ত্বনা করিয়া আসিতেছি। ইহাদের এ বেশে আমার চক্ষে বড়ই কষ্টকর বোধ হইতেছে। আমি বাঁচিয়া থাকিতে ইহাদের হস্তে অস্ত্রভার সহিতে হইল, ভাই ইহা অপেক্ষা আর দুঃখ কী? তোমরা যাও আর অপেক্ষা করিয়ো না।"

এই কথা বলিয়া অশ্ব হইতে নামিয়াই ইমাম হাসান অতি বিনীতভাবে নারীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগ্নিগণ! নগরের প্রান্তভাগে মহাশত্রু। নগরবাসীরা আজ শত্রুবধে উন্মত্ত, জন্মভূমি রক্ষা করিতে মহাব্যস্ত। এই বিপদ সময়ে তোমরা এ বেশে কোথা যাইতেছ?"

স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে একজন বলিলেন,-"হজরত! আর কোথা যাইব? আপনার এই মহাবিপদকালেও কী আমরা অবলাচারের বাধ্য হইয়া অন্তঃপুরেই আবদ্ধ থাকিব? ভ্রাতা, পুত্র, স্বামী সকলকেই শত্রুমুখে পাঠাইয়াছি, ফিরিয়া আসিতে পাঠাই নাই; একেবারে চিরবিদায় প্রদান করিয়াছি;-আর আমাদের পৃথিবীতে থাকিবার প্রয়োজন কী? আপনার জন্য স্বামী, পুত্র, ভ্রাতা যে পথে যাইবে, আমরাও সেই পথের অনুসরণ করিব; বিপদ সময়ে অবশ্যই কিছু না কিছু সাহায্য করিতে পারিব। আর তাহারাই যদি বিধর্মীর রক্তে রঞ্জিত হইয়া ধর্মরক্ষা ও জন্মভূমি রক্ষা করিতে পারে, তবে আমরাই-বা কাফেরের মাথা কাটিতে অস্ত্র গ্রহণ করিব না কেন? নূরনবী হজরত মোহাম্মদের পবিত্র দেহ যে মদিনা ক্রোড়ে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, রোজকেয়ামত পর্যন্ত থাকিবে, সেই মদিনা এজিদ্ অধিকার করিবে? যে মদিনার পবিত্রতা-গুণে জগতের চারি খণ্ড হইতে কোটি কোটি ভক্ত কত কষ্ট স্বীকার করিয়া সুদ্ধ একবার রওজা-শরিফ দর্শন করিতে আসিতেছে, সেই পবিত্র ভূমি কাফেরের পদস্পর্শে কলঙ্কিত হইবে? এ কথা শুনিয়া কে স্থির হইয়া ঘরে থাকিতে পারে? দুনিয়া কয় দিনের? আরো দেখুন, আমরা অবলা, পরাধীনা; যাহাদের মুখাপেক্ষী তাহারাই অস্ত্রসম্মুখে দাঁড়াইল, তখন আমরা শূন্যদেহ লইয়া কেন আর ঘরে থাকিব?"

আর একটি স্ত্রীলোক কহিলেন, "হজরত! আমরা যে কেবল সন্তান-সন্ততি প্রতিপালন করিতেই শিখিয়াছি, তাহা মনে করিবেন না, এই হস্ত বিধর্মীর মস্তক চূর্ণ করিতেও সম; এই অস্ত্রে কাফেরের মুণ্ডপাত করিতেও জানি। সামান্য রক্তবিন্দু দেখিলেই আমাদের মন কাঁপিয়া

www.MurchOna.com

উঠে, অঙ্গ শিহরিয়া উঠে, হৃদয়ে বেদনা লাগে; কিন্তু কাফেরের লোহিত-তরঙ্গের শোভা দর্শনে আনন্দে ও উ□সাহে মন যেন নাচিতে থাকে।"

বিস্মিত হইয়া হাসান বলিলেন, "আমি আপনাদের অনুগত এবং আজ্ঞাবহ। আমি বাঁচিয়া থাকিতে বিধর্মীবধে আপনাদিগকে অস্ত্র ধরিতে হইবে না। আমার বংশ বাঁচিয়া থাকিতে আপনাদিগকে এ বেশ পরিতে হইবে না। ভগ্নিগণ! আপনারা ঘরে বসিয়া ঈশ্বরের নিকট ধর্ম ও জন্মভূমির রার জন্য কায়মনে প্রার্থনা করুন। আমরা অস্ত্রমুখে দাঁড়াইব; আপনারা ঈশ্বরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমাদিগকে রা করিবেন। আমি মিনতি করিয়া বলিতেছি, আপনারা শত্রুসম্মুখীন হইয়া আমার মনে বেদনা প্রদান করিবেন না।"

প্রথমা স্ত্রী সবিনয়ে বলিলেন, "আপনার আদেশ প্রতিপালন করিলাম; কিন্তু ইহা নিশ্চয়ই জানিবেন যে, মদিনার একটি অবলার প্রাণ দেহে থাকিতে এজিদ্ কদাচ নগরের সীমায় আসিতে পারিবে না।" এই কথা বলিয়া স্ত্রীলোকেরা দুই হস্ত তুলিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "এলাহি! আজ আপনার নামের উপর নির্ভর করিয়া হাসানকে শত্রুসম্মুখে দিলাম। হাসানের প্রাণ, পবিত্র ভূমি মদিনার স্বাধীনতা এবং ধর্ম রা করিতে ভ্রাতা, পুত্র ও স্বামীহারা হইলে আমরা কাতর হইব না। এলাহি! স্বামী, পুত্র, ভ্রাতৃগণ বিধর্মীর অস্ত্রে প্রাণত্যাগ করিলে আমাদের চে কখনোই জল আসিবে না-কিন্তু মদিনা নগর কাফেরের পদস্পৃষ্ট হইলে আমরা অকাতরে প্রাণ বিসর্জন করিব। এলাহি! হাসানের প্রাণ আমাদের প্রার্থনীয়। সে প্রাণ রক্ষা হইলেই সকল রক্ষা হইবে। এলাহি! হাসানের প্রাণ রক্ষা কর। মদিনার পবিত্রতা রক্ষা কর! নূরনবী হজরত মোহাম্মদের রওজার পবিত্রতা রা কর।"

এই প্রকারে উপাসনা শেষ করিয়া নগরবাসিনী কামিনীগণ হাসানকে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন, "এলাহীর অনুগ্রহ কবচ আপনার শরীর রক্ষা করুক। বাহুবলে হজরত আলীর

দৃষ্টি হউক৷ বিবি ফাতেমা খাতুনে জান্নাত আপনার ক্ষুৎপিপাসা নিবারণের প্রতি দৃষ্টি রাখুন৷ শত্রুবিজয়ী হইয়া আপনি নির্বিঘ্নে নগরে আগমন করুন৷"

এইরূপ আশীর্বাদ করিয়া কামিনীগণ স্ব-স্ব নিকেতনে চলিয়া গেলেন৷ হাসানও 'বিস্‌মিল্লাহ্' বলিয়া অশ্বে আরোহণ করিলেন৷ মুহূর্তমধ্যে নগরপ্রান্তে আসিয়া ভীষণতর শব্দ শুনিতে শুনিতে যুদ্ধক্ষেত্রের নিকটস্থ হইলেন৷ দেখিলেন যে, বিষমবিক্রমে মদিনাবাসীরা বিপক্ষগণকে আক্রমণ করিয়াছে যুদ্ধের রীতিনীতির প্রতি কাহারো লক্ষ্য নাই৷ কেবল মার মার শব্দ, অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা ও মুহূর্তে মুহূর্তে 'আল্লাহ্' রবে চতুর্দিক কাঁপাইয়া তুলিতেছে৷ রণভূমিতে শোণিতের প্রবাহ ছুটিয়াছে সে অভাবনীয় ভয়ানক দৃশ্য দেখিয়া হাসান নিস্তব্ধভাবে অশ্বপৃষ্ঠে উপবিষ্ট রহিলেন, যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলেন না৷

মদিনাবাসীরা শত্রুদিগকে প্রায় শেষ করিয়া ফেলিয়াছে৷ শত শত বিধর্মীর মস্তকোচ্ছেদন করিয়া শেষে নিজে নিজে 'শহীদ' হইতেছে৷ কেহ কাহারো কথা শুনিতেছে না, কিছু বলিতেছে না, জিজ্ঞাসাও করিতেছে না৷ হোসেনের চালিত তরবারি বিদ্যুতের ন্যায় চমকিতেছে৷ শত্রুপক্ষীয়েরা যে পলাইয়া প্রাণ রা করিবে, তাহারও উপায় নাই৷ তবে বহুদূর হইতে যাহার সেই ঘূর্ণিত তরবারির চাকচিক্য দেখিয়াছিল কেবল তাহারাই, কেহ জঙ্গলে, কেহ পর্বতগুহায় লুকাইয়া প্রাণ রক্ষা করিল৷

হোসেনের অশ্ব শ্বেতবর্ণ; শরীরও শ্বেতবসনে আবৃত৷ এক্ষণে বিধর্মী বিপক্ষরে রক্তে একেবারে তাহা লোহিত বর্ণে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু স্থানে স্থানে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুভ্রাংশে আরও অধিক শোভা হইয়াছে সেই শোভা বিধর্মীর পকে ভীষণভাবে প্রতিফলিত হইতেছে৷ অশ্বের পদ নিক্ষিপ্ত রক্তমাখা বালুকার উৎক্ষিপ্ততা দেখিয়াই অনেকে ছিন্ন দেহের আবরণে লুকাইয়া হোসেনের তরবারি হইতে প্রাণ বাঁচাইতেছে৷ বামে দক্ষিণে হোসেনের দৃষ্টি নাই৷ যাহাকে সম্মুখে পাইতেছেন, তাহাতেই নরকে পাঠাইতেছেন৷

হাসান অনেকক্ষণ পর্যন্ত একস্থানে দাঁড়াইয়া ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া এই ভীষণ যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন। হস্তপদ খণ্ডিত অগণিত দেহ, শোণিত-প্রবাহে ডুবিয়া, কতক অর্ধাংশ ডুবিয়া রক্তস্রোতে নিন্মস্থানে গড়াইয়া যাইতেছে। মদিনাবাসীদের মুখে কেবল "মার! মার! কোথায় এজিদ্? কোথায় মারওয়ান?" এইমাত্র রব। মধ্যে মধ্যে নানাপ্রকারের ভীষণতর কাতর স্বর হাসানের কর্ণগোচর হইতে লাগিল।

মদিনাবাসীরা প্রথমে বিধর্মীর মস্তক ভিন্ন আর কিছুই দেখেন নাই; ক্রমে দুই একটির প্রতি দৃষ্টি। হোসেন ও আবদুর রহমান প্রভৃতিকে দেখিয়াছিলেন; অথচ কেহ কাহারো কোন সন্ধান লন নাই। জিজ্ঞাসাও করেন নাই। এক্ষণে পরস্পর পরস্পরের সহিত দেখা হইতে লাগিল। যাহারা তাঁহাদের দৃষ্টিপথের প্রতিবন্ধকতা জন্মাইয়াছিল, ঈশ্বর কৃপায় তাহারা আর নাই, প্রায় সকলেই রক্তস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। ক্রমে সকলেই একত্র হইতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে হাসানেরও দেখা পাইলেন। সকলেই উচ্চৈঃস্বরে ঈশ্বরের নাম করিয়া জয়ধ্বনির সহিত "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্" বলিয়া যুদ্ধে ক্ষান্ত দিলেন। অনন্তর রক্তমাখা শরীরে আঘাতিত অঙ্গে মনের আনন্দে হাসানের সহিত আলিঙ্গন করিলেন। হাসানও সকলকে আশীর্বাদ করিয়া সমস্বরে ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বালক, বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোকেরা পথের দুই পার্শ্ব হইতে ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতার উপাসনা (শোক্‌রাণা) করিয়া বিজয়ী বীরপুরুষগণকে মহানন্দে অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। জাতীয় ধর্ম ও জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া বীরগণ বিজয় পতাকা উড়াইয়া গৃহে আসিতেছেন, সে সময়ে "বাগে এরামের" (স্বর্গীয় উপবনের) পুষ্প তাঁহার মস্তকে বর্ষণ করিতে পারিলেও সকলের মনের আশা মিটিত না। নগরবাসীরা কি করেন, মদিনাজাত যাহা আমাদের পারিজাত পুষ্প, মনের আনন্দে, মহা উৎসাহে সেই পুষ্পগুচ্ছ বৃষ্টি করিয়া অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। বিজয়ী বীরগণ একেবারে প্রভু মোহাম্মদের রওজা শরিফে আসিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিলেন। শেষে হাসান-হোসেন ও আবদুর রহমানের নিকট বিদায় হইয়া সকলেই স্ব স্ব গৃহে গমনপূর্বক পরিবারমধ্যে

সাদরে গৃহীত হইলেন। মদিনার প্রতি গৃহ, প্রতি দ্বার, প্রতি পল্লী ও প্রতি পথ এককালে আনন্দময় হইয়া উঠিল।

মদিনাবাসীরা বিজয়-নিশান উড়াইয়া রণভূমি পরিত্যাগ করিলে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন মৃতদেহ মধ্যে প্রাণের ভয়ে যাঁহারা লুকাইয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে তাঁহারা মস্তক উত্তোলন করিয়া দেখিলেন, আর জনপ্রাণীমাত্র যুদ্ধেক্ষেত্র নাই। সহস্র সহস্র মস্তক ও সহস্র সহস্র দেহ রক্তমাখা হইয়া বিকৃতভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। কেহ অশ্বসহ দ্বিখণ্ডিত হইয়া অশ্বদেহে চাপা পড়িয়াছে, কাহারো খণ্ডিত হস্ত পড়িয়া রহিয়াছে; শরীরের চিহ্নমাত্র নাই! কোন শরীরে হস্ত নাই, কাহারো জঙ্ঘা কাটিয়া কোথায় পড়িয়াছে, অপরাংশ কোন অশ্বের পশ্চা পদের সহিত রক্তে জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে। অশ্বদেহে মনুষ্যমস্তক, মনুষ্যদেহে অশ্বমস্তক সংযোজিত হইয়াছে, এইরূপ শোচনীয় অবস্থা অবলোকন করিয়া হতাবশিষ্ট সেনাগণ কি করিবে, কোন উপায়ই নির্ধারণ করিতে পারিল না। ক্রমে ক্রমে দুইটি তিনটি করিয়া একত্র হইলেন। পর্বতগুহায় যাঁহারা লুকাইয়া ছিলেন, তাঁহারাও যুদ্ধক্ষেত্রের নীরব নিস্তব্ধভাব বুঝিয়া ক্রমে ক্রমে বাহির হইলেন। তন্মধ্যে মারওয়ান ও ওত্বে অলীদ উভয়েই ছিলেন। সঙ্গীদিগের এই হৃদয়বিদারক অবস্থা দেখিয়া তাঁহারা কিছুই দুঃখিত হইলেন না। কেবল মারওয়ান বলিলেন, "ভাই অলীদ! মদিনাবাসীর অস্ত্রে এত তেজ, হোসেনের এত পরাক্রম, ইহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। যাহা হইবার হইয়াছে, গত বিষয়ের চিন্তায় আর ফল কি? পুনরায় চেষ্টা। মহারাজ এজিদের আজ্ঞা মনে কর। যে 'যদি' শব্দে তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, তাহাই যদি সফল হইল, তবে ইহা তো নূতন ঘটনা নহে। মহারাজের শেষ আজ্ঞা পর্যন্ত পরীক্ষা করিয়া যাইব,-জীবন লইয়া আর দামেস্কে যাইব না; এ মুখ আর দামেস্কবাসীকে দেখাইব না। পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করিব, পুনরায় হাসান-বধ চেষ্টা করিব। মহারাজ এজিদের অভাব কিসের? সৈন্যগণ! তোমরা একজন এখনই দামেস্কনগরে যাত্রা কর। যাহা স্বচক্ষে দেখিলে ভাগ্যবলে মুখে বলিতেও সময় পাইলে, অবিকল মহারাজ সমীপে এই মহাযুদ্ধের অবস্থা বলিয়ো। আর বলিয়ো যে, মারওয়ান মরে নাই, হাসানের প্রাণ সংহার না করিয়া সে

মদিনা পরিত্যাগ করিবে না। আরো বলিয়ো যে, মহারাজের শেষ আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেই সে এক্ষণে প্রস্তুত হইয়াছে। যত শীঘ্র হয়, পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মদিনায় প্রেরণ করুন। আর যাহা স্বচক্ষে দেখিলে, কিছুই গোপন করিও না, তৎসমস্তই অকপটে প্রকাশ করিয়া বলিয়ো।"

মারওয়ানের আজ্ঞামাত্র এম্‌রান নামক এক ব্যক্তি দামেস্কে যাত্রা করিলেন। মারওয়ান ছদ্মবেশে নগরের কোন এক গুপ্ত স্থানে অলীদের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। আর আর সঙ্গীরা নিকটস্থ পর্বতগুহায় মারওয়ানের আদেশক্রমে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

দ্বাদশ প্রবাহ

ঋণের শেষ, অগ্নির শেষ, ব্যাধির শেষ, শত্রুর শেষ থাকিলে ভবিষ্যতে মহাবিপদ। পুনরায় তাহা বর্ধিত হইলে আর শেষ করা যায় না। রাত্রি দুই প্রহর; মদিনাবাসীরা সকলেই নিদ্রিত; মারওয়ান ছদ্মবেশে নগরভ্রমণ করিয়া আসিতেছেন, কতই সন্ধান, কতই গুপ্ত মন্ত্রণা অবধারণ করিতেছেন, কাহারো নিকট মনের কথা ভাঙ্গিতে সাহস পান না। মদিনা তন্নতন্ন করিয়াও আজ পর্যন্ত মনোমত লোক খুঁজিয়া পান নাই। কেবল একটি বৃদ্ধা স্ত্রীর সহিত কথায় কথায় অনেক কথার আলাপ করিয়াছেন; আকার ইঙ্গিতে লোভও দেখাইয়াছেন; কিন্তু কোথায় নিবাস, কোথায় অবস্থিতি, তাহার কিছুই বলেন নাই। অথচ বৃদ্ধার বাড়ি ঘর গোপনভাবে দেখিয়া আসিয়াছেন। বিশেষ অনুসন্ধানে বৃদ্ধার সাংসারিক অবস্থাও অনেক জানিতে পারিয়াছেন। আজ নিশীথসময়ে বৃদ্ধার সহিত নগরপ্রান্তে নির্দিষ্ট পর্বতগুহার নিকট দেখা হইবে এরূপ কথা স্থির আছে। মারওয়ান নিয়মিত সময়ের পূর্বে বৃদ্ধার বাটীর নিকটে গোপন ভাবে যাইয়া সমুদয় অবস্থা জানিয়া আসিতেছেন যে, বৃদ্ধার কথায় কোনরূপ সন্দেহ আছে কি না? সমুদয় দেখিয়া শুনিয়া শীঘ্র শীঘ্র ফিরিয়া আসিতেছেন, নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই গিরিগুহার নিকট যাইয়া বৃদ্ধার অপেক্ষায় থাকিবেন।

সেই স্ত্রীলোকটির নাম মায়মুনা। মায়মুনার কেশপাশ শুভ্র বলিয়াই লেখক তাহাকে বৃদ্ধা বলিয়াই সম্বোধন করিয়াছেন। কিন্তু মায়মুনা বাস্তবিকই বৃদ্ধা নহে। মারওয়ান চলিয়া গেলে তাহার কিছুক্ষণ পরেই একটি স্ত্রীলোক স্বদেশীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া অন্যমনস্কভাবে কি যেন চিন্তা করিতে করিতে রাজপথ দিয়া যাইতেছে; আবরু অনাবৃত। ক্ষণে ক্ষণে আকাশে লক্ষ্য করিয়া সেই স্ত্রীলোক চন্দ্র ও "আদম সুরাতের" (নরাকার নক্ষত্রের) প্রতি বার বার দৃষ্টি করিতেছে। তাহার আর কোন অর্থ নাই, বোধ হয়, নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইবার আশঙ্কা। অর্থলোভে পাপকার্যে রত হইবে, তাহাই আলোচনা করিয়া অন্যমনস্কে যাইতেছে। তারাদল এক এক বার চক্ষু বুঝিয়া ইঙ্গিতে যেন তাহাকে নিষেধ করিতেছে। প্রকৃতি স্বাভাবিক নিস্তব্ধতার মধ্য হইতেও যেন "না-না" শব্দে বারণ করিতেছে। মায়মুনা কর্ণে টাকার সংখ্যা শুনিতে ব্যস্ত, সে বারণ শুনিবে কেন? মন সেই নির্দিষ্ট পর্বতগুহার নিকট; এ সকল নিবারণের প্রতি সে মন কি আকৃষ্ট হইতে পারে? নগরের বাহির হইয়া একটু দ্রুতপদে চলিতে লাগিল।

নির্দিষ্ট গিরিগুহার নিকটে মারওয়ান অপেক্ষা করিতেছিলেন, মায়মুনাকে দেখিয়া তাঁহার মনের সন্দেহ একেবারে দূর হইল। উভয়ে একত্র হইলেন, কথাবার্তা চলিতে লাগিল। মায়মুনা বলিল, "আপনার কথাবার্তার ভাবে আমি অনেক জানিতে পারিয়াছি। আমাকে যদি বিশ্বাস করেন, তবে একটি কথা আগে বলি।"

মারওয়ান কহিলেন, "তোমাকে বিশ্বাস না করিলে মনের কথা ভাঙ্গিব কেন? তোমার কথাক্রমে এই নিশীথসময়ে জনশূন্য পর্বতগুহার নিকটেই-বা আসিব কেন? তোমার যাহা ইচ্ছা বল।"

মায়মুনা কহিল, "কার্য শেষ করিলে তো দিবেনই, কিন্তু অগ্রে কিছু দিতে হইবে। দেখুন, অর্থই সকল। আমি নিতান্ত দুঃখিনী, আপনার এই কার্যটি সহজ নহে। কত দিনে যে শেষ করিতে পারিব, তাহার ঠিক নাই। এই কার্যের জন্যই আমাকে সর্বদা চিন্তিত থাকিতে

হইবে। জীবিকানির্বাহের জন্য অন্য উপায়ে একবারে হস্তসঙ্কোচ করিতে হইবে। দিবারাত্রি কেবল এই মন্ত্রণা, এই কথা লইয়াই ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইবে। আপনিই বিবেচনা করুন ইহার কোনটি অযথার্থ বলিলাম?"

কথার ভাব বুঝিয়া কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা মায়মুনার হস্তে দিয়া মারওয়ান বলিলেন, "যদি কৃতকার্য হইতে পার, সহস্র সুবর্ণ মোহর তোমার জন্য ধরা রহিল।"

মোহরগুলি রুমালে বাঁধিয়া মায়মুনা বলিল, "দেখুন। যার দুই-তিনটি স্ত্রী, তার প্রাণবধ করিতে কতক্ষণ লাগে? সে তো 'আজরাইলকে' (যমদূতকে) সর্বদা নিকটে বসাইয়া রাখিয়াছে। তার প্রাণ রক্ষা হওয়াই আশ্চর্য নয়।"

মারওয়ান কহিলেন, "তাহা নয় বটে, কিন্তু লোকটি আবার কেমন? যেমন লোক, স্ত্রীরাও তেমনি। দুই তিনটি স্ত্রী হওয়া আর ভয়ের কারণ কি?"

মায়মুনা কহিল, "ও কথা বলিবেন না, পয়গম্বরই হউন, ইমামই হউন, ধার্মিক পুরুষই হউন, আর রাজাই হউন, এক প্রাণ কয়জনকে দেওয়া যায়? ভাগী জুটিলেই নানা কথা, নানা গোলযোগ। সপত্নীবাদ না আছে, এমন স্ত্রী জগতে জন্মে নাই। সপত্নীর মনে ব্যথা দিতে কোন সপত্নীর ইচ্ছা নাই? আমি সে কথা এখন কিছুই বলিব না; আপনার প্রতিজ্ঞা যেন ঠিক থাকে।"

মারওয়ান বলিলেন, "এখানে তুমি আর আমি ভিন্ন কেহই নাই,-এ প্রতিজ্ঞার সাক্ষী কাহাকে করি? ঐ অনন্ত আকাশ, ঐ অসংখ্য তারকারাজী, ঐ পূর্ণচন্দ্র, আর এই গিরিগুহা, আর এই রজনী দেবীকেই সাক্ষী করিলাম। হাসানের প্রাণবধ করিতে পারিলেই আমি তোমাকে সহস্র মোহর পুরস্কার দিব। তৎসম্বন্ধে তুমি যখন যাহা বলিবে, সকলই আমি প্রতিপালন করিব। আর একটি কথা। এই বিষয় তুমি আমি ভিন্ন আর কেহই জানিতে না পারে।"

মায়মুনা বলিল, "আমি এ কথায় সম্মত হইতে পারি না। কেহ জানিতে না পারিলে কার্য উদ্ধার হইবে কি প্রকারে? তবে এই পর্যন্ত বলিতে পারি, আসল কথাটি আর একজনের কর্ণ ভিন্ন দ্বিতীয়জনের কর্ণে প্রবেশ করিবে না।"

"সে তোমার বিশ্বাস। কার্য উদ্ধারের জন্য যদি কাহারো নিকট কিছু বলিতে হয় বলিয়ো; কিন্তু তিনজন ভিন্ন আর একটি প্রাণীও যেন জানিতে না পারে।"

মায়মুনা বলিল, "হজরত! আমাকে নিতান্ত সামান্য স্ত্রীলোক মনে করিবেন না। দেখুন, রাজমন্ত্রীরা রাজ্য রক্ষা করে, যুদ্ধবিগ্রহ বা সন্ধির মন্ত্রণা দেয়, নির্জনে বসিয়া কত প্রকারে বুদ্ধির চালনা করে, আমার এ কার্য সেই রাজকার্যের অপেক্ষা কম নহে। যেখানে অস্ত্রের বল নাই, মহাবীরের বীরত্ব নাই, সাহস নাই, সাধ্য নাই, সেইখানেই এই মায়মুনা। শত অর্গলযুক্ত দ্বারও অতি সহজে খুলিয়া থাকি। যেখানে বায়ুর গতিবিধি নাই, সেখানেও আমি অনায়াসে গমন করি। যে যোদ্ধার অন্তর পাষাণে গঠিত, তাহার মন গলাইয়া মোমে পরিণত করিতে পারি। যে কুলবধূ সূর্যের মুখ কখনো দেখে নাই, চেষ্টা করিলে তাহার সঙ্গেও দুটো কথা কহিয়া আসিতে পারি। নিশ্চয় জানিবেন, পাপশূন্য দেহ নাই, লোকশূন্য জগ নাই। যেখানে যাহা খুঁজিবেন, সেইখানেই তাহা পাইবেন।"

মারওয়ান কহিলেন, "মুখে অনেকেই অনেক কথা বলিয়া থাকে, কার্যে তাহার অর্ধেক পরিমাণ সিদ্ধ হইলেও জগতে অসুখের কারণ থাকিত না, অভাবের নামও কেহ মুখে আনিত না। তোমার কথাও রহিল, আমার কথাও থাকিল। রাত্রিও প্রায় শেষ হইয়া আসিল। ঐ দেখ, শুকতারা পূর্বগগনে দেখা দিয়াছে। শীঘ্র শীঘ্র নগর মধ্যে যাওয়াই উচিত। আমি তোমার বাটীর সন্ধান লইয়াছি। আবশ্যক মত যাইব, এবং গুপ্ত পরামর্শ আবশ্যক হইলে নিশীথ সময়ে উভয়ে এই গিরিগুহার সন্নিকটে আসিয়া সমুদয় কথাবার্তা কহিব ও শুনিব।" এই বলিয়া মারওয়ান বিদায় হইলেন। মায়মুনাও বাটীতে গেল। গৃহমধ্যে শয্যার উপর

বসিয়া মোহরগুলি দীপালোকে এক এক করিয়া গণিয়া যথাস্থানে স্থাপনপূর্বক আপনাআপনি বলিতে লাগিল-

"হাসান আমার কে? হাসানকে মারিতে আর আমার দুঃখ কী? আর ইহাও এক কথা, আমি নিজে মারিব না, আমি কেবল উপলক্ষ মাত্র| আমার পাপ কি?" মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিতে করিতে মায়মুনা শয়ন করিল|

রাত্রি প্রভাত হইল| নগরস্থ উপাসনা-মন্দিরে প্রভাতীয় উপাসনার জন্য ভক্তবৃন্দ সুস্বরে আহ্বান করিতেছে| "নিদ্রাপেক্ষা ধর্মালোচনা অতি উৎকৃষ্ট" আরব্য ভাষায় একথার ঘোষণা করিতেছে| ক্রমে সকলেই জাগিয়া উঠিল| নিত্যক্রিয়াদি সমাধা করিবার পর সকলের মুখেই শত সহস্র প্রকার ঈশ্বরের নাম ঘোষিত হইতে লাগিল| কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি যুবক, কি যুবতী, সকলেই ঈশ্বরের গুণগান করিয়া বিশ্রামদায়িনী বিভাবরীকে বিদায় দান করিলেন| সকলেই যেন ঈশ্বরের নামে তৎপর, ঈশ্বরের প্রেমে উৎসাহী|

মদিনাবাসীমাত্রেই ঈশ্বরের উপাসনায় ব্যতিব্যস্ত, কেবল মায়মুনা ঘোর নিদ্রায় অভিভূতা| এই মাত্র শয়ন করিয়াছে, উপাসনার সময়ে উঠিতে পারে নাই| নিদ্রাভঙ্গের পরেই তাহাকে যে ভয়ানক পাপকার্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে,-যে সাংঘাতিক কার্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহা ভাবিলে হৃদয় শুষ্ক হয়! অর্থলোভে পুণ্যাত্মা হাসানের প্রাণবিনাশে হস্ত প্রসারণ করিবে| ওঃ পাষাণীর প্রাণ কী পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন! নিরপরাধে পবিত্র দেহের সংহার করিবে, এ পাপ কী একটুও তাহার মনে হইতেছে না! অকাতরে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছে! কি আশ্চর্য! রমণীর প্রাণ কি এতই কঠিন হইতে পারে?

মায়মুনা নিদ্রিত অবস্থাতেই শয্যাপরিস্থ উপাধান চাপিয়া ধরিয়া গোঙাইতে গোঙাইতে বলিতে লাগিল, "আমি নহি, আমি নহি! মারওয়ান;-এজিদের প্রধান উজির মারওয়ান|" দুই তিনবার মারওয়ানের নাম করিয়া মায়মুনার নিদ্রাভঙ্গ হইল| নিদ্রিত অবস্থায় কি স্বপ্ন দেখিয়াছিল, কী কারণে ভয় পাইয়াছিল, কী কষ্টে পড়িয়াছিল, কে কী বলিল, মায়মুনার

মনই তাহা জানে। মায়মুনা নিস্তব্ধ হইয়া শয্যাপরি বসিয়া রহিল। এক দৃষ্টে কী দেখিল, কী ভাবিল, নিজেই জানিল; শেষে বলিয়া উঠিল, "স্বপ্নসকল অমূলক চিন্তা। বুদ্ধিহীন মূর্খেরাই স্বপ্ন বিশ্বাস করিতে থাকে। যাহাই আমার কপালে থাকুক, আমি স্বপ্নে যাহা দেখিলাম, সে ভয়ে হাজার মোহরের লোভ কখনোই পরিত্যাগ করিতে পারিব না। এ কী কম কথা! একটা নয়, দুটো নয়, দশ শত মোহর! প্রস্তরাঘাতে মারিবে,-যে দিবে সেই মারিবে। এ কী কথা!"-এই বলিয়াই অন্য গৃহে গমন করিল। কিঞ্চি বিলম্বে নূতন আকারে, নূতন বেশে, গৃহ হইতে বহির্গত হইল। মায়মুনা এখন ধীরা, নম্র-স্বভাবা, সর্বাঙ্গে 'বোর্কা' (আপাদমস্তক আবরণ বসন) বোর্কা ব্যবহার না করিয়া স্ত্রীলোকেরা প্রকাশ্য রাজপথে গমনাগমন করিলে রাজবিধি অনুসারে দণ্ডনীয় হইতে হয়। সেইজন্যই মায়মুনা বোর্কা ব্যবহার করিয়া বহির্গত হইল।

ত্রয়োদশ প্রবাহ

মায়মুনা আজ কী উদ্দেশ্য সাধন করিতে বহির্গত,-কোথায় যাইতেছে, তাহা পাঠকগণ বোধ হয়, বুঝিয়া থাকিবেন। মায়মুনা ইমাম হাসানের অন্তঃপুরে প্রায়ই যাতায়াত করিত। হাসনেবানুর নিকট তাহার আদর ছিল না। হাসনেবানুকে দেখিলেই সে ভয়ে জড়সড় হইত। জয়নাবের নিকটেও কয়েক দিন চক্ষের জল ফেলিয়া সপত্নীর নিন্দাবাদ করিয়াছিল। হাসনেবানু থাকিতে কাহারো সুখ নাই, এই প্রকার আরো দুই একটা মন ভাঙানো মন্ত্র আওড়াইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে সুফল ফলে নাই। বরং যাহা শুনিয়াছিল, তাহাতে জয়নাবের নিকট চক্ষের জল ফেলিতে আর সাহস করিত না। নিতান্ত আবশ্যক না হইলে জয়নাবের নিকটে আর যাইতও না। জায়েদা তাহার পুরাতন ভালবাসা। জায়েদার সঙ্গে বেশি আলাপ, বেশি কথা, বেশি কান্না। মায়মুনাকে পাইলেই জায়েদা মনের কপাট খুলিয়া বসিতেন। পূর্ব কথা, জয়নাব আসিবার পূর্বে হাসানের ভালবাসা, হাসানের আদর-যত্ন, আর এখনকার অবস্থা বলিতে বলিতে জায়েদা দুই-এক ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিতেন, মায়মুনাও সেই

কান্নায় যোগ দিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু ফুলাইত। জায়েদা ভাবিয়াছিলেন, মদিনার মধ্যে যদি কেহ তাঁহাকে ভালবাসে, তবে সে মায়মুনা। তাঁহার অন্তরের দুঃখে যদি কেহ দুঃখিত হয়, তবে সে মায়মুনা। দুটা মুখের কথা কহিয়া সান্ত্বনা করিবার যদি কেহ থাকে, তবে সে মায়মুনা। কোনরূপ উপকারের আশা থাকিলেও সেই মায়মুনা। মায়মুনা ভিন্ন সে সময়ে আপন বলিতে আর কাহাকেও চক্ষে দেখেন নাই। মায়মুনাকে দেখিয়াই ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মায়মুনা! এ কয়েকদিন দেখি নাই কেন?"

মায়মুনা উত্তর করিল, "তোমার কাজ না করিয়া কেবল যাওয়া আসায় লাভ কি? তুমি তো বলিয়াই মনের ভাব পাতলা করিয়াছ, এখন ভোগ আমার, কষ্ট আমার, মেহনত আমার। তা বোন্! তোমার জন্য যদি আমার ঘরকন্না রসাতলে যায়, দিন-দুনিয়ার খারাবি হয়, তাহাও স্বীকার, তথাপি যাহাতে হয়, আমি তোমার উপকার করিবই করিব। আমি ভুলি নাই।"

জায়েদা কহিলেন, "সে সকল কথা আর আমার মনে নাই। পাগলের মত একদিন কী বলিয়াছিলাম, তুমি তাই মনে করিয়া রাখিয়াছ; যাক্ ও-কথা যাক্ ও-কথা তুমি আর কখনো মনে করিয়ো না; কোন চেষ্টা করিয়ো না। আমার মাথা খাও আর ও-কথা মুখেও আনিয়ো না। কৌশলে স্বামী বশ, মন্ত্রের গুণ স্বামীর মন ফিরান, মন্ত্রে ভালবাসা, ঔষধের গুণে স্বামী বশে আনা,-এ সকল বড় লজ্জার কথা। স্বাভাবিক মনে যে আমার হইল না, তাহার জন্য আর কেন? সকলই অদৃষ্টের লেখা। আমি যত্ন করিলে আর কী হইবে? জয়নাবকে মারিয়াই বা কেন পাপের বোঝা মাথায় করিব? ঈশ্বর তাহাকে স্বামী সোহাগিনী করিয়াছেন, তাহাতে যে বাধা দিবে, সেই অধঃপাতে যাইবে। আমি সমুদয় বুঝিয়া একেবারে নিরস্ত হইয়াছি। যে আমার হইল না, আমার মুখের দিকে যে ফিরিয়া তাকাইল না, তাহাকে ঔষধে বশ করিয়া লাভ কী? বোন! সে বশ কয় দিনের? সে ভালবাসা কয় মুহূর্তের? যদি মন্ত্রে গুণ থাকে, যদি ঔষধের ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলেও সে কি আর যথার্থ ভালবাসার

মত হয়? ধ'রে-বেঁধে, আর মনের ইচ্ছায় যে কত প্রভেদ, তাহা বুঝিতেই পার। মানিলাম, ঔষধে মন ফিরাইবে, নূতন ভালবাসার সহিত শত্রুভাব জন্মাইয়া দিবে; কিন্তু আমাকে যে ভালবাসিবে, তাহার ঔষধ কী? তাহাও যেন হইল, কারণ আমি হাতে করিয়া খাওয়াইব, আমাকেই ভালবাসার ভার সহিতে হইবে, কিন্তু ঔষধ তো আর চিরকাল পেটে থাকিবে না। ক্রমে ঔষধের গুণ কমিতে থাকিবে, ভালবাসাও কমিতে থাকিবে;-শেষে আবার যে সেই-বরং বেশিরই সম্ভাবনা।"

ব্যঙ্গচ্ছলে মায়মুনা জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কী আপস্ হইয়াছে, না ভাগ-বন্টন-বিলি-ব্যবস্থা করিয়া ভাগাভাগী করিয়া লইয়াছ?-কিংবা মনের মোকদ্দমার সালিসী নিষ্পত্তি হইয়া মিট্‌মাট হইয়া গিয়াছে?"

জায়েদা উত্তর করিলেন, "ভাগ-বন্টন করি নাই, আপসও করি নাই; মিটমাটও করি নাই, এ জীবনে তাহা হইবে না, জায়েদা বাঁচিয়া থাকিতে স্বামী ভাগ করিয়া লইবেও না। মনের খেদে আর কি করি বোন! দেখেশুনে একেবারে আশা-ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়া বসিয়াছি। স্বামীর নাম আর করিব না, স্বামীর কথাও আর মুখে আনিব না। যাহাদের স্বামী, যাহাদের ঘরকন্না, তাহারাই থাকুক, তাহারাই সুখভোগ করুক। জায়েদা আজিও যে ভিখারিণী, কালিও সেই ভিখারিণী।"

মায়মুনা কহিল, "এত উদাস হইও না। যাহা কর, বুদ্ধি স্থির করিয়া আগুপাছু বিবেচনা করিয়া করিয়ো। তোমার শত্রু অনেক মিত্রও অনেক। মনে করিলে তুমি রাজরাণী, আবার মনে না করিলে তুমি পথের ভিখারিণী। আবার বোন! আমি তো দেখিতেছি, বড় ইমাম যে চক্ষে জয়নাবকে দেখেন, তোমাকেও সেই চক্ষে দেখিয়া থাকেন। আবার সেই চক্ষে হাসনেবানুকেও দেখিয়া থাকেন। কোন বিষয়েই তো ভিন্ন ভাব দেখিতে পাই না। শুনিতে পাই, জয়নাবকেই তিনি বেশি ভালবাসেন; কিন্তু কই? আমি তো তাহার কিছুই দেখিতে পাই না; বরং দেখিতে পাই, তোমার প্রতিই তাঁহার টান অধিক।"

ঈষ hাস্য করিয়া জায়েদা কহিলেন, "তুমি কি বুঝিবে? প্রকাশ্যে কিছু ইতরবিশেষ দেখিতে পাও না, তাহা ঠিক। ভিতরে যে কি আছে তাহা কে বুঝিবে? লোকের নিন্দা, ধর্মের ভয়, কাহার না আছে? বিশেষত ইহারা ইমাম। প্রকাশ্যে সকল স্ত্রীকে সমান দেখেন। কিন্তু দেখাও অনেক প্রকার আছে। ধর্মরা, লোকের মনে প্রবোধ, আমাদের মন বুঝান, অনায়াসেই হয়; কিন্তু উহার মধ্যে যে একটু গুহ্য ভাব আছে, তাহা আমি মুখে বলিতে পারি না। উপমার কোন সামগ্রী সম্মুখেও নাই যে, তাহা দেখাইয়া তোমাকে বুঝাইব। এখন তিনি কথা কহেন, কিন্তু পূর্বেকার সে স্বর নাই, সে মিষ্টতাও নাই। ভালবাসেন, কিন্তু তাহাতে রস নাই। আদর করেন, কিন্তু সে আদরে মন গলে না, বরং বিরক্তিই জন্মে। আগে জায়েদার নিকট সময়ের দীর্ঘতা আশা করিতেন; এখন যত কম হয়, ততই মঙ্গল, তাহাই ইচ্ছা। পূর্বে কথাবার্তাতেই রাত্রি প্রভাত হইয়াছে, তবুও সে কথার ইতি হয় নাই-মনের কথাও ফুরায় নাই; এখন জায়েদার শয্যায় শয়ন করিলে ডাকিয়া নিদ্রা ভঙ্গ করিতে হয়। প্রভাতী উপাসনার সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায়, ঊষাকালে একত্র শয়ন করিয়া আছেন, কিন্তু উপাসনার ব্যাঘাত নাই। ঘরের কথা, মনের কথা, কে বুঝিবে বল দেখি? আমার দুঃখ অপরে কী বুঝিবে বল দেখি? কাহাকেই-বা বলিব? জগতে আমার বলিবার কেহই নাই। মনে কোন আশাও নাই। এখন শীঘ্র শীঘ্র মরণ হইলে আমি নিস্তার পাই।"

কাঁদিয়া কাঁদিয়া মায়মুনা বলিতে লাগিলেন, "জায়েদা! তুমি কেন মরিতে চাও? তুমি মনে করিলে কী-না করিতে পার? ইচ্ছা করিলেই তোমার দুঃখ দূর হয়; তুমি মনে করিলেই তোমার শত্রুর মুখে ছাই পড়ে। আমি তো আগেই বলিয়াছি, তোমার মনই সকল। মনে করিলেই তুমি রাজরাণী, মনে না করিলেই ভিখারিণী।"

জায়েদা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মনে করিলেই যদি মনের দুঃখ যায় তবে জগতে কে না মনে করে?"

মায়মুনা উত্তর করিল, "আমি তো আর দশ টাকা লাভের জন্য তোমার মনোমত কথা বলিতেছি না। যাহা বলি, মন ঠিক করিয়া একবার মনে কর দেখি, তোমার মনের দুঃখ কোথায় থাকে?"

জায়েদা কহিলেন, "তোমার কোন্ কথাটা আমি মনের সহিত শুনি নাই, মায়মুনা? তুমি আমার পরম হিতৈষিণী। যাহা বলিবে, তাহার অন্যথা কিছুতেই করিব না।"

মায়মুনা কহিল, "যদি মনে না লাগে, তবে করিয়ো না। কিন্তু মন হইতে কখনোই মুখে আনিতে পারিবে না। ধর্ম সাক্ষী করিয়া আমার নিকট প্রতিজ্ঞা কর, এখনি বলিতেছি।"

জায়েদা কহিলেন, "প্রতিজ্ঞা আর কি, তোমারই মাথায় হাত দিয়া বলিতেছি, যাহা বলিবে, তাহাই করিব; সে কথা কাহারো নিকট ভাঙ্গব না।"

উত্তম সুযোগ পাইয়া মায়মুনা অতি মৃদু স্বরে অনেক মনের কথা বলিল! জায়েদাও মনোনিবেশপূর্বক শুনিতে শুনিতে শেষের একটি কথায় চমকিয়া উঠিলেন,-চমকিতভাবে একদৃষ্টে মায়মুনার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। ভয়ে থতমত খাইয়া বলিলেন, "শেষের কার্যটি জায়েদা প্রাণ থাকিতে হইবে না। এই দুঃখে যদি মরিয়াও যাই, শত শত প্রকার দুঃখও যদি ভোগ করি, সপত্নী-বিষম বিষে আরো যদি জর্জরিত হই, পরমায়ুর শেষ পর্যন্তও যদি এই দুঃখের শেষ না হয়, তাহা হইলেও উহা পারিব না। আমার স্বামী আর আমি-আমার প্রাণের প্রাণ-কলিজার টুকরা আর আমি-"

শেষ কথাটি শেষ করিতে না দিয়াই মায়মুনা কহিল, "শেষের কার্যটি না করিলে কোন কার্যই সিদ্ধ হইবে না। কথাটা আগে ভাল করিয়া বিবেচনা কর, তার পর যাহা বলিতে হয়,-বলিয়ো। যে রাজরাণী জয়নাব হইত, সেই রাজরাণী-আবার প্রথমেই সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার। সকলই সুখের জন্য। জগতে যদি চিরকালই দুঃখের বোঝা মাথায় করিয়া বহিতে হয়, তবে মনুষ্যকুলে জন্মলাভে কী ফল? এমন সুযোগ কি আর হইবে? এ সময় কী

চিরকালই এমনই থাকিবে? সময়ে সুযোগ পাইলে হাতের ধন পায় ঠেলিতে নাই। তোমার ভাগ্যে আছে বলিয়াই জয়নাব তোমার সপত্নী হইয়াছে। এ সকল ঘটনা দেখিয়াও কী তুমি কিছু বুঝিতে পারিতেছ না? আমার কথা কয়েকটি বড় মূল্যবান। ইহার এক-একটি করিয়া সফল করিতে না পারিলে, পরিশ্রম ও যত্ন সকলই বৃথা। এক-একটি কার্যের এমনি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে একের অভাবে অন্যটি সাধিত হইতে পারে না, এ পুরীমধ্যে তোমার কে আছে? বল তো তোমাকে আপন বলিয়া কে আদর করে? তুমিই না বলিয়াছ, সকলই আছে, অথচ তাহার মাঝে কী যেন নাই। তাহা আমি মুখে বলিয়া বুঝাইতে পারি না। তোমার মনই তাহার প্রমাণ। আজি আমি আর বেশি কিছু বলিব না।" এই বলিয়া মায়মুনা জায়েদার নিকট হইতে বিদায় লইল।

জায়েদা মলিনমুখী হইয়া উঠিয়া গেলেন। যেখানে গেলেন, সেখানেও স্থির হইয়া বসিতে পারিলেন না। পুনরায় নিজকে আসিয়া শয়ন করিলেন। একদিকে রাজভোগের লোভ, অপরদিকে স্বামীর প্রণয়, এই দুটি ক্রমে ক্রমে তুলনা করিতে লাগিলেন। যদি জায়েদা হাসানের পত্নী না হইতেন, যদি জায়েদা সপত্নীর ঈর্ষানলে দগ্ধীভূত না হইতেন, তবে কি আজ জায়েদা বিবেচনা-তুলাদণ্ডের প্রতি নির্ভর করিয়া সম্পত্তি সুখ সমুদয় এক দিকে, আর স্বামীর প্রণয়, প্রাণ-ভিন্ন দিকে ঝুলাইয়া পরিমাণ করিতে বসিতেন? কখনোই নহে। কতবার পরিবর্তন করিলেন, দুরাশা পাষাণ ভাঙ্গিয়া তুলাদণ্ড মনোমত ঠিক করিয়া অসীম সুখভার চাপাইয়া দিলেন, তথাচ স্বামীর প্রাণের দিকেই বেশি ভারী হইল। কিন্তু জয়নাবের নাম মনে পড়িবামাত্রই পরিমাণদণ্ডের যে দিকে স্বামীর প্রাণ, সেই দিকে একেবারে লঘু হইয়া উচ্চে উঠিল। হঠা একদিকের লঘুতাপ্রযুক্ত রাজভোগ, ধনলাভস্পৃহা-পরিমাণ একেবারে মৃত্তিকা সংলগ্ন হইয়া জায়েদার মন ভারী করিয়া ফেলিল। অনেক চেষ্টা করিয়াও বিবেচনা তুলাদণ্ড স্বামীর প্রাণের দিকে আর নীচে নামাইতে পারিলেন না। মায়মুনার শেষ কথাটিও মনে পড়িল। "তোমার কেহ নাই, তুমি কাহারো নও। এ সংসারে আমার কেহ নাই, আমিও

কাহার নহি," বলিতে বলিতে জায়েদা শয্যা হইতে উঠিয়া বসিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "আমার কেহ নাই, আমিও কাহার নহি। জায়েদাই যদি বঞ্চিত হইল জায়েদাই যদি মনের আগুনে পুড়িতে থাকিল, তবে তাহার চক্ষের উপর জয়নাব সুখভোগ করিবে, তাহা কখনোই হইবে না। প্রথম শত্রুর প্রতিহিংসা, শত্রুর মনে ব্যথা দেওয়া, পরিণামে একের অভাব বটে, কিন্তু মনের ও অর্থের সুখ অসীম। আমার উভয় পক্ষে সুখ। মায়মুনার কথার কেন অবাধ্য হইব?"

জায়েদা মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া-দর্পণে মুখখানি ভাল করিয়া দেখিয়া বোর্কা পরিধানপূর্বক গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

চতুর্দশ প্রবাহ

স্ত্রীলোকমাত্রেই বোর্কা ব্যবহার করিয়া যথেচ্ছ স্থানে বেড়াইতে পারে। ভারতের ন্যায় তথায় পাল্কি-বেহারা নাই। লক্ষপতি হউন, রাজললনাই হউন, ভদ্রমহিলাই হউন, বোর্কা ব্যবহারে যথেচ্ছভাবে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। দূর দেশে যাইতে হইলে উষ্ট্রের বা অশ্বের আশ্রয় লইতে হয়।

মায়মুনার গৃহ বেশি দূর নহে। জায়েদা মায়মুনার গৃহে উপস্থিত হইয়া বোর্কা মোচনপূর্বক তাহার শয়নকে যাইয়া বসিলেন। মায়মুনাও নিকটে আসিয়া বসিল। আজ জায়েদা মনের কথা অকপটে ভাঙ্গিলেন। কথায় কথায়, কথার ছলনায়, কথায় ভর দিয়া, কথা কাটাইয়া, কথায় ফাঁক দিয়া, কথায় পোষকতা করিয়া, কথায় বিপতা করিয়া স্বপ বিপ, সকল দিকে যাইয়া আজ মায়মুনা জায়েদার মনের কথা পাইল। মায়মুনার মোহমন্ত্রে জায়েদা যেন উন্মাদিনী।

সপত্নীনাগিনীর বিষদন্তে যে অবলা একবার দংশিত হইয়াছে, তাহার মন ফিরিতে কতক্ষণ? চিরভালবাসা, চিরপ্রণয়ী পতির মমতা বিসর্জন করিতে তাহার দুঃখ কী? এক প্রাণ, এক

আত্মা, স্বামীই সকল, এ কথা প্রায় স্ত্রীরই মনে আছে, স্ত্রীরই মনে থাকে, কিন্তু সপত্নীর নাম শুনিলেই মনের আগুন দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, চতুর্গুণ ভাবে জ্বলিয়া উঠে। সে আগুন বাহির হইবার পথ পায় না বলিয়াই অন্তরস্থ ভালবাসা, প্রণয়, মায়া মমতা একেবারে পোড়াইয়া ছারখার করিয়া ফেলে।

মায়মুনার সমুদয় কথাতেই জায়েদা সম্মত হইলেন। মায়মুনা মহা সন্তুষ্ট হইয়া বলিতে লাগিল, "বোন্! এত দিনে যে বুঝিয়াছ, সেই ভাল, আর বিলম্ব নাই, কোন্ সময় কাহার অদৃষ্টে কি ঘটে, কে বলিতে পারে? যত বিলম্ব হইবে, ততই তোমার অমঙ্গলের ভাগ বেশি হইবে। যাহা করিতে বসিলে, তাহার উপর আর কথা কি আছে? শুভকার্যে আর বিলম্ব কেন? ধর, এই ঔষধ নেও।"

এই বলিয়া মায়মুনা শয্যার পার্শ্ব হইতে খর্জুরপত্র নির্মিত একটি ক্ষুদ্র পাত্র বাহির করিল। তন্মধ্য হইতে অতি ক্ষুত্র একটি কৌটা জায়েদার হস্তে দিয়া বলিল, "বোন্। খুব সাবধান! এই কোটাটি গোপনে লইয়া যাও, সুযোগমত ব্যবহার করিয়ো। মনস্কামনা পূর্ণ হইবে, জয়নাবের সুখতরী ডুবিবে, এই কৌটার গুণে তুমি সকলই পাইবে। যাহা মনে করিবে তাহাই হইবে।"

জায়েদা কহিলেন, "মায়মুনা! তোমার উপদেশেই আমি সকল মায়া পরিত্যাগ করিলাম। জয়নাবের সুখস্বপ্ন আজ ভাঙ্গিব, জয়নাবের অঙ্গের আভরণ আজ অঙ্গ হইতে খসাইব, সেই আশাতেই সকল স্বীকার করিলাম। আমার দশার দিকে ফিরিয়াও চাহিলাম না। জয়নাবের যে দশা ঘটিবে, আমারও সেই দশা। ইহা জানিয়াও কেবল সপত্নীর মনে কষ্ট দিতে স্বামী বধ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। দেখ বোন্! আমায় অকূল সাগরে ভাসাইও না। আমার সর্বনাশ করিতে আমিই তো দাঁড়াইলাম, তাহাতে দুঃখ নাই। জয়নাবের সর্বনাশ করিতে আমার

সর্বনাশ! এখন সর্বমঙ্গল, ইহাও সর্বসুখ মনে করিতেছি। কিন্তু বোন্! তুমি আমাকে নিরাশ্রয় করিয়া বিষাদসমুদ্রে ভাসাইয়া দিয়ো না।"

ধীরে ধীরে কথাগুলি বলিয়া জায়েদা বিদায় হইলেন। মায়মুনাও গৃহকার্যে ব্যপৃত হইলেন। জায়েদা গৃহে আসিয়া কৌটা খুলিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার সর্বশরীর শিহরিয়া উঠিল, ভয়ে হস্ত কাঁপিতে লাগিল; কিন্তু মায়মুনার উপদেশক্রমে সে ভয় বেশিক্ষণ রহিল না। খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে সেই কৌটার বস্তু মিশাইবেন, ইহাই মায়মুনার উপদেশ। সে সময় আর কিছুই পাইলেন না, একটা পাত্রে কিঞ্চি মধু ছিল, তাহাতেই সেই বস্তুর কিঞ্চিমাত্র মিশাইয়া রাখিলেন। কৌটাটিও অতি যত্নে সংগোপনে রাখিয়া দিলেন।

হজরত হাসান প্রতিদিনই একবার জায়েদার গৃহে আসিয়া দুই-এক দণ্ড নানাপ্রকার আলাপ করিতেন। কয়েক দিন আসিবার সময় পান নাই, সেই দিন মহাব্যস্তে জায়েদার ঘরে আসিয়া বসিলেন। জায়েদা পূর্বমত স্বামীর পদসেবা করিয়া জলযোগের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

হাসান ভাবিয়াছিলেন, জায়েদার ঘরে কয়েক দিন যাই নাই, না জানি জায়েদা আজ কতই অভিমান করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু ব্যবহারে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিলেন। জায়েদা পূর্বাপেক্ষা শতগুণে সরলতা শিখিয়াছে, মানসের পূর্ণানন্দে পরিপূরিত রহিয়াছে। এই ভাব দেখিয়া হাসান আজ জায়েদার গৃহে বাস করিবেন, মনে মনে স্থির করিলেন। জায়েদাও নানাপ্রকার হাবভাব প্রদর্শনে স্বামীর মন হরণ করিয়া প্রাণ হরণ করিতে বসিলেন। ঈশ্বরভক্তই হউন, মহামহিম ধার্মিকপ্রবরই হউন, মহাবলশালী বীরপুরুষই হউন, কী মহাপ্রাজ্ঞ সুপণ্ডিতই হউন, স্ত্রীজাতির মায়াজাল ভেদ করা বড়ই কঠিন। নারীবুদ্ধির অন্ত পাওয়া সহজ নহে। জায়েদা এক পাত্রে মধু ও অন্য পাত্রে জল আনিয়া স্বামীর সম্মুখে রাখিলেন।

সকৌতুকে হাসান জিজ্ঞাসা করিলেন, "অসময়ে মধু?"

মায়াপূর্ণ আঁখিতে হাসানের দিকে একবার তাকাইয়া জায়েদা উত্তর করিলেন, "আপনার জন্য আজ আট দিন এই মধু সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছি। পান করিয়া দেখুন, খুব ভাল মধু।"

মধুর পেয়ালা হস্তে তুলিয়া হাসান বলিতে লাগিলেন, "আমার জন্য আট দিন যত্ন করিয়া রাখিয়াছ, ধন্য তোমার যত্ন ও মায়া! আমি এখনই খাইতেছি।" হাসান সহর্ষে এই কথা বলিয়া মধুপাত্র হস্তে তুলিয়া মধু পান করিলেন। মুহূর্ত মধ্যেই বিষের কার্য আরম্ভ হইল। শরীরের অবস্থার পরিবর্তন ও চিত্তের অস্থিরতাপ্রযুক্ত পিপাসার আধিক্য হইল। ক্রমে কন্ঠ, তালু ও জিহ্বা শুষ্ক হইয়া আসিল, চক্ষু লৌহিতবর্ণ হইয়া শেষে দৃষ্টির ব্যাঘাত জন্মাইতে লাগিল। তিনি যেন চতুর্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। জায়েদাকে বলিলেন, "জায়েদা! এ কী হইল? এ কেমন মধু? এত জল পান করিলাম, পিপাসার শান্তি হইল না। ক্রমেই শরীর অবশ হইতেছে, পেটের মধ্যে কে যেন আগুন জ্বালিয়া দিয়াছে। ইহার কারণ কি? কিসে কি হইল?"

জায়েদা বায়ুব্যজনে প্রবৃত্ত হইলেন। মস্তকে শীতল জল ঢালিতে লাগিলেন, কিছুতেই হাসান সুস্থির হইলেন না। ক্রমেই শরীরের জ্বালা বর্ধিত হইতে লাগিল। বিষের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সামান্য শয্যার উপর গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। পেটের বেদনা ক্রমশঃই বৃদ্ধি। হাসান অত্যন্ত কাতর হইয়া অবশেষে কাতরস্বরে জিজ্ঞাসা করিরেন, "জায়েদা! এ কিসের মধু? মধুতে এত আগুন? মধুর এমন জ্বালা! উঃ! আর সহ্য হয় না! আমার প্রাণ গেল! জায়েদা! উঃ! আর আমি সহ্য করিতে পারি না।"

জায়েদা যেন অবাক্; মুখে কথা নাই। অনেকক্ষণ পরে কেবল মাত্র এই কথা, "সকলই আমার কপালের দোষ। মধুতে এমন হইবে, তা কে জানে! দেখি দেখি, আমিও একটু খাইয়া দেখি।"

হাসান এই অবস্থাতেই নিষেধ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "জায়েদা! আমার কথা রাখ; ও মধু তুমি খাইয়ো না। আমার মাথা খাও, ও মধু মুখে দিয়ো না! ছুঁইয়ো না! জায়েদা! ও মধু নয়, কখনোই ও মধু নয়! তুমি-খোদার দোহাই, ও মধু তুমি ছুঁইয়ো না! আমি যে যাতনা ভোগ করিতেছি, তাহা আমিই জানি। জায়েদা ঈশ্বরের নাম কর।"

পত্নীকে এই কথা বলিয়া হাসান ঈশ্বরের নাম করিতে লাগিলেন। কাহাকেও সংবাদ দিলেন না, জায়েদার ঘরেই ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া রহিলেন। পবিত্র হৃদয়ে পবিত্র মুখেই দয়াময়ের পবিত্র নাম পুনঃপুনঃ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। বিষের বিষম যাতনা নামের গুণে কতক পরিমাণে অল্প বোধ হইতে লাগিল। জায়েদা সমস্ত রাত্রি জাগিয়া সেবা-শুশ্রূষা করিলেন। প্রভাতী উপাসনার সময়ে অতি কষ্টে জায়েদার গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া প্রভু মোহাম্মদের সমাধি-মন্দিরে গমন করিলেন। মন্দিরের সম্মুখস্থিত প্রাঙ্গণে উপবেশন করিয়া বিনীতভাবে ঈশ্বরের নিকট সকাতরে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

যাঁহার কৃপাবলে অনন্ত জগ সৃষ্ট হইয়াছে, পর্বত সাগরে মিশিয়াছে, বিজন বন নগরে পরিণত হইয়াছে, জনপূর্ণ মহানগরী নিবিড় অরণ্য হইয়া যাইতেছে, সেই সর্বেশ্বরের অসাধ্য কি আছে? প্রভু মোহাম্মদের সমাধি-মন্দিরের পবিত্রতাগুণে, ঈশ্বরের মহিমায় হাসান আরোগ্য লাভ করিলেন। কিন্তু এই প্রথম বিষপান হইতে (মৃত্যু পর্যন্ত চল্লিশ দিন) প্রায় কোন না কোন প্রকারে শরীরের গ্লানি ছিল। এ কথা (প্রথম বিষপান ও আরোগ্য লাভ) অতি গোপনে রাখিলেন। কাহারো নিকটে প্রকাশ করিলেন না।

প্রণয়ী বিশ্বাসী ব্যক্তি যদি শত্রু হইয়া দাঁড়ায়, তাহার হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া নিতান্ত কঠিন৷ চিরশত্রুর হস্ত হইতে অনেকেই রক্ষা পাইতে পারে, কিন্তু মিত্র যদি শত্রু হয়, তাহার হস্ত হইতে রা পাওয়ার আশা কিছুতেই থাকে না৷ বিশেষত স্ত্রীজাতি শত্রুতাসাধনে উত্তেজিত হইয়া উঠিলে, তাহা শেষ না করিয়া প্রাণ থাকিতে ক্ষান্ত হয় না৷ জায়েদা ক্ষান্ত হইবেন কেন? জায়েদার পশ্চাতে আরো লোক আছে৷ জায়েদা একটু নিরুৎসাহ হইলে, মায়মুনা নানাপ্রকারে উৎসাহিত করিয়া নূতন ভাবে উত্তেজিত করিত৷ একবার বিফল হইলে দ্বিতীয়বারে অবশ্যই সুফল ফলিবে, এ কথাও জায়েদার কর্ণে মধ্যে মধ্যে ফুৎকারের ন্যায় বাজিতে লাগিল৷

মায়মুনা মনে মনে ভাবিয়াছিল, যাহা দিয়াছি তাহাতে আর রক্ষা নাই৷ একবার গলাধঃকরণ হইলেই কার্যসিদ্ধি হইবে৷ হাসান জায়েদার গৃহে আসিয়া বসিয়াছেন, মধুপানে আত্মবিকার উপস্থিত হইয়াছে, গোপনে সন্ধান লইয়া একেবারে নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া আছে, কোন্ সময়ে হাসানের পুরী হইতে ক্রন্দনধ্বনি শুনিবে, নিজেও কাঁদিতে কাঁদিতে যাইয়া পুরবাসিগণের সহিত হাসানের বিয়োগজনিত ক্রন্দনে যোগ দিবে এইরূপ আলোচনায় সারানিশা বসিয়া বসিয়া কাটাইল; প্রভাত হইয়া আসিল, তবুও ক্রন্দনশব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল না৷ দুই-এক পদ করিয়া জায়েদার গৃহ পর্যন্ত আসিল, জায়েদার মুখে সমুদয় ঘটনা শুনিয়া আশ্চর্যান্বিত হইল৷ জিজ্ঞাসা করিল, "তবে উপায়?"

জায়েদা উত্তর করিল, "উপায় অনেক আছে৷ তুমি বাজার হইতে আমাকে কিছু মিষ্ট খেজুর আনিয়া দাও৷ এবারে দেখিয়ো কিছুতেই রক্ষা হইবে না!"

"খেজুরে কী হইবে?"

"মধুতে যাহা হইয়াছিল, তাহাই হইবে৷"

"তিনি কী তোমার ঘরে আসিবেন?"

কেন আসিবে না?"

"যদি জানিয়া থাকেন-ঘুণাক্ষরে যদি টের পাইয়া থাকেন, তবে তোমার ঘরে আসা দূরে থাক্, তোমার মুখও দেখিবেন না।"

"বোন্! তুমি আমার বয়সে বড়, অনেক দেখিয়াছ, অনেক শুনিয়াও থাকিবে, কিন্তু তোমার ভ্রমও অনেক। স্ত্রীজাতির এমনি একটি মোহিনীশক্তি আছে যে, পুরুষের মন অতি কঠিন হইলেও সহজে নোয়াইতে পারে, ঘুরাইতে পারে, ফিরাইতেও পারে। তবে অন্যের প্রণয়ে মজিলে একটু কথা আছে বটে, কিন্তু হাতে পাইয়া নির্জনে বসাইতে পারিলে, কাছে ঘেঁষিয়া মোহন মন্ত্রগুলি ক্রমে ক্রমে আওড়াইতে পারিলে অবশ্যই কিছু-না-কিছু ফল ফলাইতে পারিবই পারিবে। এ যে না পারে সে নারী নহে। আর আমি তাঁহাকে বিষপান করাইব এ কথা তো তিনি জানেন না, কেহ তো তাঁহাকে সে কথা বলে নাই; তিনিও তো সর্বজ্ঞ নহেন যে, জয়নাবের ঘরে বসিয়া জায়েদার মনের খবর জানিতে পারিবেন। যে পথে দাঁড়াইয়াছি, আর ফিরিব না, যাহা করিতে হয়, আমিই করিব।"

মায়মুনা মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়া মনে মনেই বলিল, "মানুষের মনের ভাব পরিবর্তন হইতে ক্ষণকালও বিলম্ব হয় না।" প্রকাশ্যে কহিল, "আমি খেজুর লইয়া শীঘ্রই আসিতেছি।"

মায়মুনা বিদায় হইল। জায়েদা অবশিষ্ট মধু, যাহা পাত্রে ছিল, তাহা আনিয়া দেখিয়া দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, "যেমন মধু তেমনই আছে; ইহার চারি ভাগের এক ভাগও যদি উদরস্থ হইত, তাহা হইলে আজ এতক্ষণ জয়নাবের সুখতরী ডুবিয়া যাইত, সুখের বাসা ভাঙ্গিয়া একেবারে দুঃখের সাগরে ডুবিত, স্বামীসোহাগিনীর সাধ মিটিয়া যাইত! এই সুমধুর মধুতেই জায়েদার আশা পরিপূর্ণ হইত। প্রথমে যে ভাব হইয়াছিল, আর কিছুক্ষণ সেই ভাবে থাকিলে আজ জয়নাবের আর হাসিমুখ দেখিতাম না; আমারও অন্তর জ্বলিত না। এক বার, দুই বার, তিন বার, যত বার হয় চেষ্টা করিব; চেষ্টার অসাধ্য কী আছে?"

মায়মুনা খেজুর লইয়া উপস্থিত হইল। বলিল, "সাবধান! আর আমি বিলম্ব করিব না। যদি আবশ্যক হয়, সময় বুঝিয়া আমার বাটীতে যাইয়ো।" এই কথা বলিয়া মায়মুনা চলিয়া গেল। জায়েদা সেই খেজুরগুলি বাছিয়া বাছিয়া দুই ভাগ করিলেন। এক ভাগের প্রত্যেক খেজুরে এমন এক একটি চিহ্ন দিলেন যে তিনি ভিন্ন অন্য কাহারো চক্ষে তাহা পড়িবার সম্ভাবনা রহিল না। অবশিষ্ট অচিহ্নিত খেজুরগুলিতে সেই কৌটার সাংঘাতিক বিষ মিশ্রিত করিয়া, উভয় খেজুর একত্র করিয়া রাখিয়া দিলেন।

হাসান জয়নাবকে বলিয়াছিলেন যে, "গত রাত্রিতে জায়েদার গৃহে বাস করিব ইচ্ছা ছিল, দৈববশে এমনই একটি ঘটনা ঘটিল যে সমস্ত রাত্রি পেটের বেদনায়, শরীরের জ্বালায় অস্থির ছিলাম। মুহুর্তকালের জন্যও সুস্থির হইতে পারি নাই। ভাবনায় চিন্তায় জায়েদা কোন কথাই মুখে আনিতে পারিল না। কেবলমাত্র বলিয়াছিল যে, 'সকলই আমার কপাল!' তা যাহাই হউক, আজিও আমি জায়েদার গৃহে যাইতেছি!"

জয়নাব বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া হাসানকে বিদায় দান করিলেন। জয়নাবের ইচ্ছা যে, কাহারো মনে দুঃখ না হয়, স্বামীধনে কেহই বঞ্চিত না হয়। সে ধনে সকলেই সমভাবে অধিকারিণী ও প্রত্যাশিনী।

হাসানের শরীর সম্যক্ প্রকারে সুস্থ হয় নাই; বিষের তেজ শরীর হইতে একেবারে যে নির্দোষভাবে অপসৃত হইয়াছে, তাহাও নহে। শরীরের গ্লানি ও দুর্বলতা এবং উদরের জড়তা এখনো অনেক আছে। এ সকল থাকা সত্ত্বেও তিনি জায়েদার গৃহে উপস্থিত হইয়া গত রাত্রির ঘটনা আলোচনা করিতে লাগিলেন। সেই মধুর কথাও জিজ্ঞাসা করিরেন। জায়েদা উত্তর করিলেন, "যে মধুতে এত যন্ত্রণা, এত কেশ; সেই মধু আমি আবার গৃহে রাখিব? পাত্রসমেত তাহা আমি ত৷ক্ষণা৷ দূর করিয়া ফেলিয়া দিয়াছি।"

জায়েদার ব্যবহারে হাসান যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন। সুযোগ পাইয়া জায়েদা সেই খর্জুরের পাত্র ইমাম হাসানের সম্মুখে রাখিয়া, নিকটে বসিয়া খর্জুর ভণে অনুরোধ করিলেন। হাসান স্বভাবতঃই খর্জুর ভালবাসিতেন, কিন্তু গত রজনীতে মধুপান করিয়া যে কষ্ট পাইয়াছিলেন, তাহা মনে করিয়া একটু ইতস্তত করিতে লাগিলেন। চতুরা জায়েদা স্বামীর অগ্রেই চিহ্নিত খেজুরগুলি খাইতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। দেখাদেখি, ইমাম হাসানও চিহ্নিত এবং অচিহ্নিত উভয়বিধ খেজুর একটি একটি করিয়া খাইতে আরম্ভ করিলেন। ঊর্ধ্ব সংখ্যা সাতটি উদরস্থ হইলেই বিষের কার্য আরম্ভ হইল। হাসান সন্দেহপ্রযুক্ত আর খাইলেন না, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই অস্থির হইয়া পড়িলেন। আর বিলম্ব করিলেন না, কোন কথাও কহিলেন না; নিতান্ত দুঃখিতভাবে প্রাণের অনুজ হোসেনের গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। এবারো কাহাকে কিছু বলিলেন না; কিছুণ ভ্রাতৃগৃহে অবস্থিতি করিলেন। নিদারুণ বিষের যন্ত্রণা ক্রমশ অসহ্য হইয়া উঠিল। পুনরায় তিনি প্রভু মোহাম্মদের 'রওজা মোবারকে' (পবিত্র সমাধিক্ষেত্রে) যাইয়া ঈশ্বরের নিকটে আরোগ্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। দয়াময় এবারেও হাসানকে আরোগ্য করিয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন।

জায়েদার আচরণ হাসান কিছু বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তথাপি সে কথা মুখে আনিলেন না; কাহারো নিকট প্রকাশ করিলেন না। কিন্তু মনে মনে বড়ই দুঃখিত হইলেন। নির্জনে বসিয়া স্বগত বলিতে লাগিলেন, "স্ত্রী দুঃখের ভাগিনী, সুখের ভাগিনী। আর আমার স্ত্রী যাহা-ঈশ্বরই জানেন। আমি জ্ঞানপূর্বক জায়েদার কোন অনিষ্ট করি নাই, কোন প্রকারে কষ্টও দিই নাই। জয়নাবকে বিবাহ করিয়াছি বলিয়াই কী জায়েদা আমার প্রাণ লইতে সঙ্কল্প করিয়াছে? স্বহস্তে পতিবধে প্রবৃত্ত হইয়াছে? সপত্নীসম্বন্ধ তাহার নূতন নহে। হাসনেবানুও তো তাহার সপত্নী। যে জায়েদা আমার জন্য সর্বদা মহাব্যস্ত থাকিত, কিসে আমি সন্তুষ্ট থাকিব, তাহারই অনুসন্ধান করিত, আজ সেই জায়েদা আমার প্রাণবিনাশের জন্য বিষ হস্তে

করিয়াছে! একথা আর কাহাকেও বলিব না! এ বাটীতেও আর থাকিব না। মায়াময় সংসার ঘৃণার্হ স্থান। নিশ্চয়ই জায়েদার মন অন্য কোন লোভে আক্রান্ত হইয়াছে। অবশ্যই জায়েদা কোন আশায় ভুলিয়াছে, কুহকে পড়িয়াছে। সপত্নীবাদে আমাকে বিষ দিবে কেন? এ বিষ জয়নাবকে দিলেই তো সম্ভবে। জয়নাবের প্রাণেই তাহার অনাদর হইতে পারে, আমার প্রাণে অনাদর হইলে তাহার আর সুখ কী? স্ত্রী হইয়া যখন স্বামীবধে অগ্রসর হইয়াছে, তখন আর আমার নিস্তার নাই। এ পুরীতে আর থাকিব না। স্ত্রী-পরিজনের মুখ আর দেখিব না, এই পুরীই আমার জীবন বিনাশের প্রধান যন্ত্র।-কিছুতেই এখানে থাকা উচিত নহে। বাহিরের শত্রু হইতে রক্ষা পাওয়াও সহজ, কিন্তু ঘরের শত্রু হইতে রক্ষা পাওয়া দুষ্কর! শত্রু দূরে থাকিলেও সর্বদা আতঙ্ক। কোন্ সময়ে কী ঘটে,-কোন্ সূত্রে, কোন্ সুযোগে, কী উপায়ে, কোন্ পথে, কাহার সাহায্যে, শত্রু আসিয়া কী কৌশলে শত্রুতা সাধন করে, এই ভাবনায় ও এই ভয়েই সর্বদা আকুল থাকিতে হয়। কিন্তু আমার ঘরেই শত্রু! আমার প্রাণই আমার শত্রু! নিজ দেহই আমার ঘাতক! নিজ হস্তই আমার বিনাশক! নিজ আত্মাই আর বিসর্জক। উঃ! কী নিদারুণ কথা! মুখে আনিতেও কষ্ট বোধ হয়! স্ত্রী-স্বামীতে দেহ ভিন্ন বটে, কিন্তু আমি তো আর কিছুই ভিন্ন দেখি না। স্বামী, স্ত্রী এক দেহ হইতে পারে না বলিয়াই ভিন্ন ভাবে থাকে, কিন্তু আত্মা এক, মন এক, মায়া মমতা এক, আশা এক, ভরসা এক, প্রাণ এক,-সকলই এক। কিন্তু কী দুঃখ! কী ভয়ানক কথা! হা অদৃষ্ট! সেই এক আত্মা এক প্রাণ স্ত্রী-তাহার হস্তেই স্বামীবিনাশের বিষ। কী পরিতাপ! সেই কোমল হস্ত স্বামীর জীবন-প্রদীপ নির্বাণের জন্য প্রসারিত! আর এস্থানে থাকিব না। বনে বনে পশুপীদের সহবাসে থাকাই ভাল। এ পুরীতে আর থাকিব না।"

এইরূপে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া হাসান আপন প্রধান মিত্র আব্বাস ও কতিপয় এয়ার সমভিব্যাহারে মদিনার নিকটস্থ মুসাল নগরে গমন করিলেন। মুসালবাসীরা হজরত ইমাম হাসানের

শুভাগমনে যারপরনাই আনন্দিত হইয়া অতি সমাদরে বিশেষ ভক্তি-উপহারে অভ্যর্থনা করিলেন, কিন্তু এখানে তাঁহার ভাগ্যে বেশি দিন বিশ্রাম ঘটিল না।

পঞ্চদশ প্রবাহ

কপাল মন্দ হইলে তাহার ফলাফল ফিরাইতে কাহারো সাধ্য নাই। মুসাল নগরে আসিয়া হাসান কয়েকদিন থাকিলেন। জায়েদার ভয়ে গৃহ পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু অদৃষ্টলিপি যাহা, তাহাই রহিয়া গেল। যখন কপাল টলিয়া যায় দুঃখ-পথের পথিক হইতে হয়, তখন কিছুতেই আর নিস্তার থাকে না। এক জায়েদার ভয়ে গৃহ ত্যাগ করিয়া মুসাল নগরে আসিলেন, কিন্তু সেরূপ কত জায়েদা শত্রুতা সাধনের জন্য তাঁহার অপেক্ষা করিতেছিল, তাহা কী তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন? এই বিশ্বসংসারে শত্রুসংখ্যা যদি আমরা জানিতে পারি, বাহ্যিক আকারে শত্রু মিত্র যদি চিনিতে পারি, তবে কি আর বিপদের সম্ভাবনা থাকে? চিনিতে পারিলে কি আর শত্রুরা শত্রুতা সাধন করিতে পারে? সতর্কতা কাহার জন্য? ইমাম হাসানের ভাগ্যে সুখ নাই। যেদিন জয়নাবকে তিনি বিবাহ করিয়াছেন, যেদিন জয়নাবকে নিজ পুরীমধ্যে আনিয়া জায়েদার সহিত একত্র রহিয়াছেন, সেই দিনই তাঁহার সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সেই দিনই তাঁহার সুখসূর্য অস্তমিত হইয়াছে। জয়নাবের জন্যই জায়েদা আজ তাঁহার পরম শত্রু। সেই শত্রুর যন্ত্রণায় অস্থির হইয়াই হাসান গৃহত্যাগী। সেই গৃহত্যাগেই আর এক শত্রু শত্রুতা-সাধনে সুযোগ। সকল মূলই জয়নাব। আবার জয়নাবই জায়েদার সুখের সীমা।

মদিনার সংবাদ দামেস্কে যাইতেছে, দামেস্কের সংবাদ মদিনায় আসিতেছে। ইমাম হাসান মদিনা ছাড়িয়া মুসাল নগরে আসিয়াছেন, এ কথাও এজিদের কর্ণে উঠিয়াছে, অপর সাধারণেও শুনিয়াছে। ঐ নগরের একচক্ষুবিহীন জনৈক বৃদ্ধের প্রভু মোহাম্মদের প্রতি জাতক্রোধ ছিল; শেষে সেই ক্রোধ, সেই শত্রুতা তাঁহার সন্তানসন্ততি-পরিশেষে হাসান-হোসেনের প্রতি আসিয়াছিল। সেই বৃদ্ধ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, সুযোগ পাইলেই মোহাম্মদের

বংশমধ্যে যাহাকে হাতে পাইবে, তাহারই প্রাণ সংহার করিবে। মদিনা পরিত্যাগ করিয়া হাসানের মুসাল নগরে আগমন বৃত্তান্ত শুনিয়া সেই ব্যক্তি বিশেষ যত্নে হলাহল সংযুক্ত এক সুতীক্ষ্ণ বর্শা প্রস্তুত করিয়া শত্রুতাসাধনোদ্দেশে মুসাল নগরে যাত্রা করিল। কয়েক দিন পর্যন্ত অবিশ্রান্ত গমনের পর মুসাল নগরে যাইয়া সন্ধানে জানিল যে, ইমাম হাসান ঐ নগরস্থ উপাসনা-মন্দিরে অবস্থান করিতেছেন এবং ঐ স্থানে আব্বাস প্রভৃতি কয়েকজন বন্ধু তাঁহার সমভিব্যাহারে রহিয়াছে। বৃদ্ধ উল্লিখিত উপাসনা-মন্দিরের সীমাবর্তী গুপ্তস্থানে বর্শা লুকাইয়া রাখিয়া একেবারে হাসানের নিকটস্থ হইল। ইমাম হাসানের দৃষ্টি পড়িবামাত্র ধূর্ত বৃদ্ধ তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, "প্রভু! আমাকে রক্ষা করুন। আমি এতদিন শয়তানের কুহকে পড়িয়া পবিত্র মোহাম্মদীয় ধর্মের প্রতি অবিশ্বাস করিয়াছি। এক্ষণে ঈশ্বর-কৃপায় আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে। সত্যধর্মের জ্যোতিঃ-প্রভাবে মনের অন্ধকার দূর হইয়াছে। স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, ইমাম হাসান মদিনা হইতে মুসাল নগরে আসিয়াছেন। সেই স্বপ্নেই কে যেন আমায় বলিল যে, 'শীঘ্র ইমাম হাসানের নিকট যাইয়া সত্যধর্মে দীক্ষিত হও, পূর্ব পাপ স্বীকার করিয়া মার্জনার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর। ভবিষ্যৎ পাপ হইতে বিরত থাকিবার জন্য ধর্মতঃ প্রতিজ্ঞা কর।' এই মহার্থপূর্ণ স্বপ্ন দেখিয়া আমি ঐ শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিতে আসিয়াছি, যাহা অভিমত হয়, আজ্ঞা করুন।"

দয়ার্দ্রচিত্ত হাসান আগন্তুক বৃদ্ধকে অনেক আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "আমি তোমাকে মোহাম্মদীয় ধর্মে দীক্ষিত করিতে এখনি প্রস্তুত আছি।" এই কথা বলিয়াই ইমাম হাসান তৎক্ষণাৎ তাহার হস্ত স্পর্শ করিয়া তাহাকে 'বায়েৎ' (মুসলমান ধর্মে দীতি) করিলেন। বৃদ্ধও যথারীতি মোহাম্মদীয় ধর্মে ঈমান্ (মুখে স্বীকার এবং বিশ্বাস) আনিয়া হাসানের পদধূলি গ্রহণ করিল। বিধর্মীকে সৎপথে আনিলে মহাপুণ্য। বৃদ্ধও এই প্রাচীন বয়সে আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী-পুত্র সকলকে পরিত্যাগ করিয়া মুসলমান-ধর্ম গ্রহণ করাতে মাননীয় হাসানের বিশেষ অনুগৃহীত ও বিশ্বাসভাজন হইল।

দুষ্টবুদ্ধি, স্বার্থপর, নরপিশাচ কেবল কার্য উদ্ধারের নিমিত্তই-চিরমনোরথ পরিপূর্ণ করিবার আশয়েই, চিরবৈর-নির্যাতন মানসেই অকপট ভাবে হাসানের শরণাগত হইল, ইহা সরলস্বভাব হাসানের বুদ্ধির অগোচর। প্রকাশ্যে ভক্তি করিতে লাগিল, কিন্তু চিরাভিলাষ পূর্ণ করিবার অবসর ও সুযোগ অন্বেষণে সর্বদাই সমুৎসুক। আগন্তুককে বিশ্বাস করিতে নাই, এ কথা হাসান যে না জানিতেন, তাহা নহে; কিন্তু সেই মহাশক্তি-সুকৌশলসম্পন্ন ঈশ্বরের লীলা সম্পন্ন হইবার জন্যই অনেক সময়ে অনেক লোকে অনেক জানিয়াও ভুলিয়া যায়-চিনিয়াও অচেনা হয়।

উপাসনা-মন্দিরের সম্মুখে হাসান এবং ইবনে আব্বাস আছেন। নূতন শিষ্য কার্যান্তরে গিয়াছে। ইবনে আব্বাস বলিলেন, "এই যে দামেস্ক হইতে আগত একচক্ষুবিহীন পাপস্বীকারী বৃদ্ধ এবং আপনার বিশ্বাসভাজন নব শিষ্য, ইহার প্রতি আমার সন্দেহ হয়।"

"কী সন্দেহ?"

"আমি অনেক চিন্তা করিয়াছি, অনেক ভাবিয়া দেখিয়াছি, এই বৃদ্ধ শুধুমাত্র ধর্মে দীক্ষিত হইতে আসে নাই। আমার বোধ হয়, কোন দুরভিসন্ধি সাধনমানসে কিংবা কোন গুপ্ত সন্ধান লইবার জন্য আমাদের অনুসরণে আসিয়াছে।"

"অসম্ভব! তাহা হইলে ভক্তিভাবে মোহাম্মদীয় ধর্মে দীতি হইবে কেন? সাধারণ ভাবে এখানে অনায়াসেই থাকিতে পারিত, সন্ধানও লইতে পারিত?"

"পারিত সত্য-পারিয়াছেও তা। কিন্তু বিধর্মী, নারকী, দুষ্ট, খল, শত্রু কেবল কার্য উদ্ধারের জন্য ধর্মের ভাণ করিয়া গুরু-শিষ্যসম্বন্ধ বন্ধন করিতে আসিয়াছে, ইহাতে আশ্চর্যই-বা কী?"

"ভ্রাতঃ! ও কোন কথাই নয়। তিন কাল কাটাইয়া শেষে কী এই বৃদ্ধকালে বাহ্যিক ধর্ম-পরিচ্ছদে কপট বেশে পাপকার্যে লিপ্ত হইবে? জগৎ কি চিরস্থায়ী? শেষের দিনের ভাবনা বল

তো কার না আছে? এই বৃদ্ধবয়সেও যদি উহার মনের মলিনতা দূর না হইয়া থাকে, পাপজনিত আত্মগ্লানি যদি এখনো উপস্থিত না হইয়া থাকে, কৃত পাপের জন্য এখনো যদি অনুতাপ না হইয়া থাকে, তবে আর কবে হইবে? চিরকাল পাপপঙ্কে জড়িত থাকিলে শেষদশায় অবশ্যই স্বকৃত পাপের জন্য বিশেষ অনুতাপিত হইতে হয়। অনেকেই গুপ্ত পাপ নিজ মুখে স্বীকার করে। যে পাপস্বীকারে প্রাণবিনাশ হইতে পারে, ঈশ্বরের এমন মহিমা যে, সে পাপও পাপী লোকে নিজ মুখে স্বীকার করিয়া আত্মবিসর্জন করিয়া থাকে। পাপ কিছুতেই গোপন থাকিবার নহে; আবার মন সরল না হইলেও ধর্মে মতি হয় না, ঈশ্বরেও ভক্তি হয় না! যে ব্যক্তি ধর্ম-সুধার পিপাসু হইয়া বৃদ্ধ বয়সেও কত পরিশ্রমে দামেস্ক হইতে মুসাল নগরে এতদূর আসিয়াছে, তাহার মনে কী চাতুরী থাকিতে পারে? মন যেদিকে ফিরাও সেই দিকেই যায়। ভাল কার্যকে মন্দ ভাবিয়া বুদ্ধি চালনা কর, চিন্তাশক্তির মতা বিচার কর, কি দেখিবে? পদে পদে দোষ-পদে পদে বিপদ! ঐ চিন্তা আবার ভাল দিকে ফিরাও, কী দেখিবে! সুফল, মঙ্গল এবং স। এই আগন্তুক যদি সরলভাবে ধর্মপিপাসু হইয়া আসিয়া থাকে, তবে দেখ দেখি উহার মন কত প্রশস্ত? ধর্মের জন্য কত লালায়িত? বল দেখি স্বর্গ কাহার জন্য? এই ব্যক্তি জান্নাতের যথার্থ অধিকারী?"

ইবনে আব্বাস আর কোন উত্তর করিলেন না। অন্য কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। আগন্তুক বৃদ্ধও মন্দিরের অপর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহার লুক্কায়িত বর্শার ফলকটি বিশেষ মনঃসংযোগে দেখিতেছে এবং মৃদু স্বরে বলিতেছে, "এই তো আমার সময়; এক আঘাতেই মারিয়া ফেলিতে পারিব। আর যে বিষ ইহাতে সংযুক্ত করিয়াছি, রক্তের সহিত একটু মিশ্রিত হইলে কাহার সাধ্য হাসানকে রক্ষা করে? উপাসনার সময়ই উপযুক্ত সময়। যেমন 'সেজদা' (দণ্ডব হইয়া ঈশ্বরকে প্রণাম) দিবে আমিও সেই সময় বর্শার আঘাত করিব। পৃষ্ঠে আঘাত করিলে বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ না হইলে আর ছাড়িব না। কিন্তু উপাসনা-মন্দিরে হাসানকে একা পাইবার সুযোগ অতি কম। দেখি, চেষ্টার অসাধ্য কী আছে?" ইবনে আব্বাসের অলক্ষিতে পাপিষ্ঠ অনেকক্ষণ দেখিতে লাগিল। কোনক্রমেই কোন সময়েই বর্শা নিক্ষেপের সময় পাইল না।

মন্দিরের দুই পার্শ্বে কয়েকবার বর্শাহস্তে ঘুরিয়া আসিল, কিন্তু একবারও লোকশূন্য দেখিল না। বৃদ্ধ পুনরায় মৃদুস্বরে বলিতে লাগিল, "কী ভ্রম! উপাসনার সময় তো আরো অধিক লোকের সমাগম হইবে। ইমামই সকলের অগ্রে থাকিবে। বর্শার আঘাত করিলেই শত্রু শেষ হইবে, কিন্তু নিজের জীবনও শেষ হইবে। এক্ষণে হাসান যেভাবে বসিয়া আছে, পৃষ্ঠে আঘাত করিলে বক্ষঃস্থল পার হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইবেন আব্বাস আমাকে কখনোই ছাড়িবে না। সে যে চতুর, নিশ্চয়ই তাহার হাতে আমার প্রাণ যাইবে। আব্বাস বড়ই চতুর, এই তো হাসানের সহিত কথা কহিতেছে, কিন্তু দৃষ্টি চতুর্দিকেই আছে। কি করি, কতক্ষণ অপেক্ষা করিব, সুযোগ সময়ই বা কত খুঁজিব? বর্শার পশ্চাদ্ভাগ ধরিয়া সজোরে বিদ্ধ করিলে তো কথাই নাই, দূর হইতে পৃষ্ঠসন্ধানে নিক্ষেপ করিলেও যে একেবারে ব্যর্থ হইবে, ইহাই-বা কে বলিতে পারে?"

বৃদ্ধ মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া হাসানের পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিতেই বর্শা সন্ধান করিল। ইবনে আব্বাসের চক্ষু চারি দিকে। এক স্থানে বসিয়া কথা কহিতেন, অথচ মনে, চক্ষে চারিদিকে সন্ধান রাখিতে পারিতেন। হঠা আগন্তুক বৃদ্ধের বর্শাসন্ধান তাঁহার চক্ষে পড়িল। হাসানের হস্ত ধরিয়া টানিয়া উঠাইলেন এবং ধূর্তের উদ্দেশে উচ্চ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "ওরে পিশাচ! তোর এই কীর্তি!"

এদিকে বর্শাও আসিয়া পড়িয়াছে। নিক্ষেপকারীর সন্ধান ব্যর্থ হইবার নহে। বর্শা-নিক্ষেপে সেই ব্যক্তি সবিশেষ শিক্ষিত ও সিদ্ধহস্ত; কেবল ইবনে আব্বাসের কৌশলেই হাসানের পরিত্রাণ-বর্শাটা পৃষ্ঠে না লাগিয়া হাসানের পদতল বিদ্ধ করিল। ইবনে আব্বাস কী করেন, দুরাত্মাকে ধরিতে যান, কী এদিকে আঘাতিত হাসানকে ধরেন। ইমাম হাসান বর্শার আঘাতে ভূতলে পড়িয়া গেলেন; ইবনে আব্বাস সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া অতি ত্রস্তে যাইয়া বৃদ্ধকে ধরিলেন। বর্শার নিকটে টানিয়া আনিয়া ঐ বর্শা দ্বারা সেই বৃদ্ধর বক্ষে আঘাত করিতে উদ্যত, এমন সময়ে ইমাম হাসান অনুনয়-বিনয় করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভাই!

প্রিয় আব্বাস! যাহা হইবার হইয়াছে, ক্ষমা কর। ভাই! বিচারের ভার হস্তে লইয়ো না। সর্ববিচারকের প্রতি বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে বিচারের ভার দিয়া বৃদ্ধকে ছাড়িয়া দাও, এই আমার প্রার্থনা।"

হাসানের কথায় ইবনে আব্বাস বৃদ্ধকে ছাড়িয়া দিয়া হাসানকে বলিলেন, "আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য; কিন্তু সর্বদা স্মরণ রাখিবেন, আগন্তুকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের এই ফল।" শোণিতের ধারা বহিতেছে। উপাসনা-মন্দির রক্তে রঞ্জিত হইয়া লিখিয়া যাইতেছে- "আগন্তুককে কখন বিশ্বাস করিয়ো না। প্রকৃত ধার্মিক জগতে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না।" বর্শার আঘাতে হাসান অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। তথাচ বলিতে লাগিলেন, "আব্বাস! তোমার বুদ্ধিকে ধন্যবাদ! তোমার চক্ষুরও সহস্র প্রশংসা! মানুষের বাহ্যিক আকৃতি দর্শন করিয়াই অস্থি-মাংস ভেদ করিয়া মর্ম পর্যন্ত দেখিবার শক্তি, ভাই! আমি তো আর কাহারো দেখি নাই! আমার অদৃষ্টে কী আছে জানি না! আমি কাহারো মন্দ করি নাই, তথাচ আমার শত্রুর শেষ নাই! পদে পদে, স্থানে স্থানে, নগরে নগরে আমার শত্রু আছে, ইহা আগে জানিতাম না। কী আশ্চর্য! সকলেই আমার প্রাণবধে অগ্রসর, সকলেই সেই অবসরের প্রত্যাশী! এখন কোথায় যাই? যেদিকে তাকাই, সেই দিকেই হন্তা, সেই দিকেই আমার প্রাণনাশক শত্রু! যে প্রাণের দায়ে মদিনা পরিত্যাগ করিলাম, এখানেও সেই প্রাণ সঙ্কটাপন্ন! কিছুতেই শত্রুহস্ত হইতে নিস্তার পাইলাম না! আমি ভাবিয়াছিলাম, জায়েদাই আমার পরম শত্রু; এখন দেখি, জগমময় আমার চিরশত্রু।"

হাসান ক্রমশঃই অস্থির হইতে লাগিলেন। অস্ত্রের আঘাত, তসহ বিষের যন্ত্রণা তাঁহাকে বড়ই কাতর করিয়া তুলিল। কাতরস্বরে ইবনে আব্বাসকে বলিলেন, "আব্বাস! যত শীঘ্র পার, আমাকে মাতামহের 'রওজা শরীফে' লইয়া চল। যদি বাঁচি, তবে আর কখনোই 'রওজা মোবারক' হইতে অন্য স্থানে যাইব না। ভ্রমেই লোকের সর্বনাশ হয়, ভ্রমেই লোকে মহাবিপদগ্রস্ত হয়, ভ্রমে পড়িয়াই লোকে কষ্ট ভোগ করে, প্রাণও হারায়। ইচ্ছা করিয়া কেহই

বিপদ্ভার মাথায় তুলিয়া লয় না, দুঃখী হইতেও চাহে না৷ আমি মুসাল নগরে না আসিয়া যদি মাতামহের রওজা শরীফে থাকিতাম, তাহা হইলে কোন বিপদেই পতিত হইতাম না৷ কপট ধর্মপিপাসুর কথায় ভুলিয়া বর্শাঘাতে আহতও হইতাম না৷ ভাই! যে উপায়ে হউক, শীঘ্রই আমাকে মদিনায় লইয়া চল৷ অতি অল্প সময়ের জন্যও আর মুসাল নগরে থাকিতে ইচ্ছা হইতেছে না৷ যদি এই আঘাতেই প্রাণ যায়, কী করিব, কোন উপায় নাই৷ কিন্তু মাতামহের পবিত্র সমাধিক্ষেত্রে প্রাণবিয়োগ হইবে, তাঁহার পদপ্রান্তেই পড়িয়া থাকিব, এই আমার ইচ্ছা৷ আর ভাই! সেই পবিত্র স্থানে প্রাণ বাহির হইলে সেই সময়ের নিদারুণ মৃত্যুযন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাইব৷ আজরাইলের (যমদূতের) কঠিন ব্যবহার হইতে বাঁচিতে পারিব৷"

এই পর্যন্ত বলিয়া হাসান পুনরায় ক্ষীণস্বরে কহিতে লাগিলেন, "ভাই! অবশ্যই আমার আশা-ভরসা সকলই শেষ হইয়াছে৷ পদে পদে ভ্রম, পদে পদে বিপদ্, ঘরে-বাহিরে শত্রু-সকলেই প্রাণ লইতে উদ্যত! আমার শরীর অবশ হইয়া আসিল৷ কথা কহিতে কষ্ট হইতেছে৷ যত শীঘ্র হয়, আমাকে মদিনায় লইয়া চল৷"

মুসাল নগরবাসীরা অনেকেই হাসানের দুঃখে দুঃখিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, "মদিনায় পাঠাইয়া দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত৷" ইবনে আব্বাস হাসানকে লইয়া মদিনায় যাত্রা করিলেন৷ যেখানে যমদূতের দৌরাত্ম্য নাই, হিংসাবৃত্তিতে হিংস্র লোকের ও হিংস্র জন্তুর প্রবৃত্তি নাই, খাদ্যখাদকের বৈরীভাব নাই, নিয়মিত সময়ে হাসান সেই মহাপবিত্র 'রওজা মোবারকে' আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সর্বাঙ্গে রওজা মোবারকের ধুলা মাখিয়া ঈশ্বরের নিকট আরোগ্য প্রার্থনা করিলেন৷ ঈশ্বরানুগ্রহে বিষের যন্ত্রণা অনেক লাঘব হইল৷ কিন্তু আঘাতের বেদনা-যাতনা তেমনই রহিয়া গেল৷ ইহার অর্থ কে বুঝিবে? সেই পরম কারুণিক পরমেশ্বর ভিন্ন আর কাহারো বুঝিবার সাধ্য নাই৷ ক্ষতস্থান দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল৷ জ্বালা-যন্ত্রণাও বাড়িতে লাগিল৷ ইমাম হাসান শেষে উত্থানশক্তি রহিত হইয়া পড়িলেন৷ একদিন

হোসেন আসিয়া ভ্রাতাকে বলিলেন, "ভ্রাতঃ! এই 'মোবারকে রওজায়' কোন প্রকার বিপদের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু মানুষের শরীর অপবিত্র; বিশেষ আপনার যে ব্যাধি, তাহাতে আরো সন্দেহ। পবিত্র স্থানে পবিত্র অবস্থায় না থাকিতে পারিলে স্থানের অবমাননা করা হয়। ক্ষতস্থান কেমন ভয়ানক রূপ ধারণ করিয়াছে, বাটীতে চলুন, আমরা সকলেই আপনার সেবা-শুশ্রুষা করিব। জগতে জননীর স্নেহ নিঃস্বার্থ। সন্তানের সাংঘাতিক পীড়ায় মায়ের অন্তরে যেরূপ বেদনা লাগে, এমন আর কাহারো লাগে না। যদিও ভাগ্যদোষে সে স্নেহ-মমতা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন, তথাপি আজ্ঞাবহ কিঙ্কর বর্তমান আছে। সেই মাতার গর্ভে আমিও জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমার সাধ্যমত আমি আপনার সেবা করিব।"

ইমাম হাসান আর বাক্যব্যয় করিলেন না। হোসেন এবং আবুল কাসেমের স্কন্ধোপরি হস্ত রাখিয়া অতি কষ্টে বাটীতে আসিয়া পৌঁছিলেন। হাসনেবানু, জয়নাব অথবা জায়েদা -এই তিন স্ত্রীর মধ্যে কোন স্ত্রীর ঘরেই গেলেন না। প্রিয় ভ্রাতা হোসেনের গৃহেই আবাস গ্রহণ করিলেন। সকলেই তাঁহার সেবা-শুশ্রুষায় রত হইল।

এক জায়েদার প্রতি সন্দেহ করিয়া হাসান যেন সকলের প্রতিই সন্দেহ করিলেন। কিন্তু সেই আন্তরিক ভাব প্রকাশ্যে কাহাকেও কিছু বলিলেন না। তবে ভাবগতিক দেখিয়া বাহ্যিক ব্যবহারে সকলেই বুঝিয়াছিলেন যে, পরিজনবর্গের-বিশেষতঃ স্ত্রীগণের প্রতি হাসান মহাবিরক্ত। হাসনেবানু ও জয়নাবের প্রতি কেবল একটু বিরক্তিভাব প্রকাশ পাইত, কিন্তু জায়েদাকে দেখিয়া ভয় করিতেন।

হাসনেবানুর সেবা-শুশ্রুষায় ইমাম হাসানের বিরক্তিভাব কেহই দেখিতে পায় নাই। জয়নাব আসিয়া নিকটে বসিলে কিছু বলিতেন না, কিন্তু জায়েদাকে দেখিলেই চক্ষু বন্ধ করিয়া ফেলিতেন। দুই চারিদিনে সকলেই জানিলেন যে, ইমাম হাসান বোধ হয় জায়েদাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন না। কারণ অনুসন্ধানেও ত্রুটি হইল না। শেষে সাব্যস্ত হইল যে, জায়েদার ঘরে

গেলেই বিপদগ্রস্ত হন, অসহ্য বেদনায় আক্রান্ত হন। এই সকল কারণেই বোধ হয়, জায়েদার প্রতি কোনরূপ সন্দেহ হইয়া থাকিবে। কেহ এই প্রকার-কেহ অন্য প্রকার-কেহ কেহ-বা নানা প্রকার কথায় আন্দোলন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেহই কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। ইমাম হাসানের ভাবগতিক কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়া হোসেন তাঁহার আহারীয় সামগ্রীর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে লাগিলেন। ভ্রাতার মনের ভাব পরীক্ষা করিবার জন্য হাসনেবানুর সম্মুখে বলিলেন, "আপনারা ইহার আহারীয় দ্রব্যাদি বিশেষ যত্নে রক্ষা করিবেন।"

হাসনেবানু কহিলেন, "আমি সাহস করিয়া কিছু বলিতে পারি না। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে খাদ্যসামগ্রীর কোন দোষে আর পীড়া বৃদ্ধি হইবে না। আমি বিশেষ সতর্ক হইয়াছি। আমি অগ্রে না খাইয়া ইহাকে আর কিছুই খাইতে দিই না। যত পীড়া-যত অপকার, সকলই আমি মাথায় করিয়া লইয়াছি। খোদা এক্ষণে আরোগ্য করিলেই সকল কথা বলিব।"

হাসনেবানুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক ইমাম হাসান বলিলেন, "অদৃষ্টের লেখা খণ্ডাইতে কাহারো সাধ্য নাই। তোমার যাহাতে সন্দেহ দূর হয়, তুমি সেই প্রকারে আমার আহারীয় ও পানীয় সমুদয় দ্রব্য সাবধানে ও যত্নে রাখিয়ো।"

হাসনেবানু পূর্ব হইতেই সতর্কিত ছিলেন, স্বামীর কথায় একটু আভাস পাইয়া আরো যথাসাধ্য সাবধান ও সতর্ক হইলেন। আহারীয় সামগ্রী বিশেষ যত্নে রক্ষিত হইতে লাগিল। বিশেষ পরীক্ষা করিয়া হাসনেবানু রোগীর পথ্য ইত্যাদি প্রদান করিতে লাগিলেন। জলের সুরাহীর উপর পরিষ্কার বস্ত্র আবৃত করিয়া একেবারে শীলমোহর বন্ধ করিলেন। অপর কেহ হাসানের ব্যাধিগৃহে আসিতে না পারে, কৌশলে তাহারও ব্যবস্থা করিলেন; প্রকাশ্যে কাহাকে

বারণ করিলেন না। হোসেনও সতর্ক রহিলেন। হাসনেবানুও সদাসর্বদা সাবধানে থাকিতে লাগিলেন।

জায়েদা মাঝে মাঝে স্বামীকে দেখিতে আসিতেন, কিন্তু জয়নাবকে স্বামীর নিকটে বসিয়া থাকিতে দেখিলে আর ঘরেই প্রবেশ করিতেন না। জয়নাবের প্রতি দৃষ্টি পড়িলেই জায়েদার মুখের আকৃতি পরিবর্তন হইত, বিদ্বেষানল জ্বলিয়া উঠিত, সপত্নীহিংসা বলবতী হইত, সপত্নী সৃষ্টিকারীর প্রতি প্রতিহিংসা-আগুন দ্বিগুণভাবে জ্বলিয়া উঠিত। স্বামী-স্নেহ, স্বামী-মমতা অন্তর হইতে একেবারে সরিয়া যাইত। অধর্ম-আচরণে প্রবৃত্তি জন্মিত। কোমল হৃদয় পাষাণে পরিণত হইত। হাসানের আকৃতি বিষব লক্ষিত হইত। ইচ্ছা হইত যে, তখনি-সেই মুহূর্তেই হয় নিজের প্রাণ নয় জয়নাবের, না হয় যিনি ইহার মূল তাঁহার- রোগীর রোগশয্যা দেখিতে কাহারো নিষেধ নাই। পীড়িত ব্যক্তির তত্ত্বাবধারণ ও সেবা-শুশ্রূষা করিতে কি দেখিতে আসিলে নিবারণ করা শাস্ত্র-বহির্ভূত। একদিন জায়েদার সহিত মায়মুনাও হজরত হাসানকে দেখিতে আসিল। শয্যার কিঞ্চি ব্যবধানে জায়েদা, ত পার্শ্বে মায়মুনা। তাঁহাদের নিকটে অপরাপর সকলে শয্যার প্রায় চতুষ্পার্শ্বে ঘেরিয়া বসিয়া আছেন। মায়মুনা প্রতিবেশিনী; আরো সকলেই জানিত যে, মায়মুনা ইমামদ্বয়ের বড়ই ভক্ত। বাল্যকাল হইতেই উভয়কে ভালবাসে। ইমামদ্বয়ের জন্মদিবসে মায়মুনা কতই আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল। জান্নাতবাসিনী জগজ্জননী বিবি ফাতেমাও মায়মুনাকে ভালবাসিতেন; মায়মুনাও তাঁহাকে ভক্তির সহিত ভালবাসিত। হাসান-হোসেনও মাতার ভালবাসা বলিয়া মায়মুনাকে বিশেষ ভক্তি করিতেন। মায়মুনা একাল পর্যন্ত তাঁহাদের সুখ-দুঃখের ভাগিনী বলিয়াই পরিচিতা আছে। মায়মুনার মন যে কালকূট বিষম বিষে পরিপূর্ণ, তাহা জায়েদা ভিন্ন আর কেহ জানিতে পারেন নাই। হাসনেবানু যে মায়মুনাকে দুই চক্ষে দেখিতে পারিতেন না, সেটি তাঁহার স্বভাব। মায়মুনাও হাসনেবানুর প্রতি কথায় কাঁদিয়া মাটি ভিজাইত না,

সেটিও মায়মুনার স্বভাব। হাসনেবানু মুখ ফুটিয়া কোন দিন মায়মুনাকে কোন মন্দ কথা বলেন নাই, অথচ মায়মুনা তাঁহাকে দেখিয়া হাড়ে কাঁপিত।

ইমাম হাসানের পীড়িত অবস্থা দেখিয়া মায়মুনার চক্ষে জল আসিল। সকলেই বলিতে লাগিল, "আহা! কোলে-কাঁধে করিয়া মানুষ করিয়াছে, ও আর কাঁদিবে না?" মায়মুনার চক্ষের জল গণ্ড বাহিয়া পড়িতে লাগিল। মায়মুনা গৃহমধ্যস্থিত সকলের দিকেই এক একবার তাকাইয়া চক্ষের জল দেখাইল। মায়মুনা শুধু চক্ষের জলই সকলকে দেখাইতেছে তাহা নহে; আরো উদ্দেশ্য আছে। ঘরের মধ্যে যেখানে যেখানে যে জিনিস যে যে পাত্রে রক্ষিত আছে, তাহা সকলই মনঃসংযোগ করিয়া জলপূর্ণ-নয়নে বিশেষরূপে দেখিতে লাগিল।

হাসানের জলপিপাসা হইয়াছে। সঙ্কেতে হাসনেবানুকে জলপানেচ্ছা জানাইলেন। তিনি মহাব্যস্তে 'আবেখোরা' পরিষ্কার করিয়া সুরাহীর শীল ভগ্ন করিবেন এবং সুরাহীর জলে আবেখোরা পূর্ণ করিয়া হাসানের সম্মুখে ধরিলেন। জলপানে তৃপ্তিলাভ করিয়া হাসান পুনরায় শয্যাশায়ী হইলেন। হাসনেবানু আবেখোরা যথাস্থানে রাখিয়া, পূর্ববৎ বস্ত্র দ্বারা মুখ বন্ধ ও শীলমোহর করিয়া সুরাহীটিও যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন।

যে যাহাকে দেখিতে ইচ্ছা করে না, সে তাহার নামও শুনিতে ভালবাসে না। জগতে এমন অনেক লোক আছে, যাহারা স্বভাবতঃই এক-একজনকে দেখিতে ভালবাসে না। অন্য পক্ষে- পরিচয় নাই, শত্রুতা, মিত্রতা নাই, আলাপ নাই, স্বার্থ নাই, কিছুই নাই, তথাপি মুখখানি দেখিতে ইচ্ছা করে। মনের সহিত ভালবাসিতেও ইচ্ছা করে। এমন মুখও জগতে অনেক আছে, পরিচয়ে পরিচিত না হইলেও সেই মুখখানি যতবার দেখিতে পাওয়া যায়, ততবারই সুখবোধ হয়।

হাসনেবানু জলের সুরাহী যথাস্থানে রাখিয়া ঈষ বিরক্তির সহিত মায়মুনার দিকে চাহিয়া চলিয়া গেলেন। রোগীর রোগশয্যার পার্শ্বে সকলেই নীরব! সকলের মুখাকৃতিই মলিন। মায়মুনার মুখ ফুটিল।

"আহা! এ নরাধম জাহান্নামী কে? আহা এমন সোনার শরীরে কে এমন নির্দয়রূপে আঘাত করিয়াছে। আহা! জান্নাতবাসিনী বিবি ফাতেমার হৃদয়ের ধন, নূরনবীর চক্ষের পুত্তলি যে হাসান সেই হাসানের প্রতি এতদূর নিষ্ঠুর অত্যাচার করিয়াছে? সে পাপীর পাপ-শরীরে রক্ত-মাংসের লেশমাত্রও নাই। নিশ্চয়ই সে হৃদয় দুর্জয় পাষাণে গঠিত। হায় হায়! চাঁদমুখখানি একেবারে মলিন হইয়া গিয়াছে।" এইরূপ কাঁদিয়া কাঁদিয়া মায়মুনা আরো কিছু বলিতে অগ্রসর হইতেছিল, হাসানের বিরক্তিভাব ও কাসেমের নিবারণে সে চেষ্টা থামিয়া গেল;-চরে জল অলক্ষিতে ফোঁটায় ফোঁটায় পড়িয়া আপনাআপনিই আবার শুষ্ক হইল।

রোগীর পথ্য লইয়া জয়নাব সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। জায়েদা আড়নয়নে বিষদৃষ্টিতে দেখিয়াই উঠিয়া চলিয়া গেলেন। মায়মুনাও হাসনেবানুর আসিবার সাড়া পাইয়া আস্তে আস্তে গৃহ ত্যাগ করিল।

ষোড়শ প্রবাহ

মায়মুনার সহিত জায়েদার কথোপকথন হইতেছে। জায়েদা বলিতেছেন, "ঈশ্বর যাহাকে রক্ষা করেন, কিছুতেই তাহার মরণ নাই। মানুষের পেটে বিষ হজম হয়-একবার নয়, কয়েকবার। আমি যেন জয়নাবের সুখের তরী ডুবাইতে আসিয়াছি। আমিই যেন জয়নাবের সর্বনাশ করিতে গিয়া আপন হাতে স্বামীর প্রাণ বিনাশ করিতে দাঁড়াইয়াছি। যে চক্ষু সর্বদাই যাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করিত, জয়নাবের চক্ষু পড়িয়া অবধি সেই চক্ষু আর তাঁহাকে দেখিতে চায় না! সেই প্রিয়বস্তুকে একেবারে চক্ষের অন্তর করিতে-জগচক্ষুর অন্তর করিতে কতই যত্ন, কতই চেষ্টা করিতেছি! যে হস্তে কতই সুখাদ্য দ্রব্য খাইতে দিয়াছি, এখন সেই হস্তেই

বিষ দিতেও একটু আগপাছ চাহিতেছি না! কিন্তু কাহার জন্য? যে স্বামীর একটু অসুখ হইলে যে জায়েদার প্রাণ কাঁদিত, এখন সেই স্বামীর প্রাণ হরণ করিতে না পারিয়া সেই জায়েদা বিরলে বসিয়া কাঁদিতেছে! কিন্তু কাহার জন্য? মায়মুনা! আমি নিশ্চয়ই বুঝিলাম, হাসানের মরণ নাই! জায়েদারও আর সুখ নাই।"

মায়মুনা কহিল, "চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই। এক বার, দু বার, তিন বার,-না হয় চারি বারের কি পাঁচ বারের বারে আর কিছুতেই রক্ষা নাই। হতাশ হও কেন? এই দেখ, এজিদ্ সকল কথা শুনিয়া এই ঔষধ পাঠাইয়া দিয়াছে। ইহাতে কিছুতেই নিস্তার নাই।"-এই কথা বলিয়াই মায়মুনা আপন কটিদেশ হইতে একটি ক্ষুদ্র পুঁটুলি বাহির করিয়া জায়েদাকে দেখাইল। জায়েদা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কী?"

"মহাবিষ।"

"মহাবিষ কী?"

মায়মুনা উত্তর করিল, "এ সর্পবিষ নয়, অন্য কোন বিষও নয়,-লোকে ইহা মহামূল্য-জ্ঞানে ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহার মূল্যও অধিক, দেখিতেও অতি উজ্জ্বল। আকার পরিবর্তনে অণুমাত্র পেটে পড়িলেই মানুষের পরমায়ু শেষ করে।"

"কী প্রকারে খাওয়াইতে হয়?"

মায়মুনা কহিল, "খাদ্যসামগ্রীর সহিত মিশাইয়া দিতে পারিলেই হইল। পানিতে মিশাইয়া খাওয়াইতে পারিলে তো কথাই নাই। অন্য অন্য বিষ পরিপাক হইলেও হইতে পারে, কিন্তু ইহা পরিপাক করিবার ক্ষমতা পাকযন্ত্রের নাই! এ একটি চূর্ণমাত্র। পেটের মধ্যে যেখানে পড়িবে, নাড়ী, পাকযন্ত্র, কলিজা সমস্তই কাটিয়া কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিবে।"

"এ তো বড় ভয়ানক বিষ! ছুঁইতেও যে ভয় হয়!"

"ছুইলে কিছু হয় না। হাতে করিয়া রগড়াইলেও কিছু হয় না। হলকুমের (অন্ননালীর) নীচে না নামিলে কোন ভয় নাই। এ তো অন্য বিষ নয়, এ হীরক-চূর্ণ!"

"হীরার গুঁড়া?-আচ্ছা, দাও।"

মায়মুনা তখনই জায়েদার হাতে পুঁটুলি দিল। পুঁটুলি হাতে লইয়া জায়েদা পুনরায় বলিতে লাগিলেন,-"আমার ঘরে যে আর আসিবেন, সে আশা আর নাই। যেরূপ সতর্ক সাবধান দেখিলাম, তাহাতে খাদ্যসামগ্রীর সহিত মিশাইবার সুবিধা পাইব কোথায়?-হাসনেবানু কিংবা জয়নাব, এই দুয়ের একজন না মিশাইলে আর কাহারো সাধ্য নাই।"

"সাধ্য নাই কী কথা? সুযোগ পাইলে আমিই মিশাইয়া দিতাম, খাদ্য-সামগ্রীর সহিত মিশাইতে পারিবে না, তাহা আমি বুঝিয়াছি। অন্য আর একটি উপায় আছে।"

"কী উপায়?"

"ঐ সুরাহীর জলে।"

"কী প্রকারে? সেই সুরাহী যে প্রকারে সীলমোহর বাঁধা, তাহা খুলিতে সাধ্য কার?"

"খুলিতে হইবে কেন? সুরাহীর উপরে যে কাপড় বাঁধা আছে, ঐ কাপড়ের উপর এই গুঁড়া অতি অল্প পরিমাণে ঘষিয়া দিলেই আর কথা নাই। যেমন সুরাহী, তেমনি থাকিবে; যেমন শীলমোহর তেমনি থাকিবে, পানির রং বদল হইবে না, কেহ কোন প্রকারে সন্দেহও করিতে পারিবে না।"

"তাহা যেন পারিবে না, কিন্তু ঘরের মধ্যে তো যাওয়া চাই। যদি কেহ দেখে?"

"দেখিলেই-বা৷ ঘরের মধ্যে যাওয়া তো তোমার দোষের কথা নয়৷ তুমি কেন গেলে, এ কথা জিজ্ঞাসা করিবার কাহারো অধিকার নাই৷ যদি ঘরের মধ্যে যাইতে কোন বাধা না থাকে, তবে দেখিবে সুযোগ আছে কি-না! যদি সুযোগ পাও, সুরাহীর কাপড়ের উপরে ঘষিয়া দিয়ো৷ এই আসিয়াছ, এখন আর যাইবার আবশ্যক নাই, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হউক, রোগীও নিদ্রাবশে শয়ন করুক৷ যাহারা সেবা-শুশ্রুষা করিতেছে, তাহারাও বিশ্রামের অবসর পা'ক৷ একটু রাত্রি হইলেই যাওয়া ভাল৷"

মায়মুনা তখন জায়েদার গৃহেই থাকিল৷ জায়েদা গোপনে সন্ধান লইতে লাগিলেন-হাসানের নিকটে কে কে রহিয়াছে, কে কে যাইতেছে, কে কে আসিতেছে, কে কী করিতেছে! প্রতি মুহূর্তেই জায়েদা গুপ্তভাবে যাইয়া তাহার অনুসন্ধান লইতেছে৷ সন্ধান ও পরামর্শ করিতে করিতে অনেক সময় উত্তীর্ণ হইল৷ জায়েদা আজ অত্যন্ত অস্থির৷ একবার আপন ঘরে মায়মুনার নিকটে, আবার বাহিরে৷ আবার সামান্য কার্যের ছল করিয়া হোসেনের গৃহসমীপে-হাসনেবানুর গৃহের নিকটে,-জয়নাবের গৃহের দ্বারে৷ কে, কোথায়-কী বলিতেছে, কী করিতেছে, সমুদয় সন্ধান লইতে লাগিলেন৷ বাড়ির লোক-বিশেষতঃ হাসানের স্ত্রী, শত শত বার আনাগোনা করিলেও কাহারো কিছু বলিবার সাধ্য নাই৷ কিন্তু হাসনেবানুর চক্ষে পড়িলে অবশ্যই তিনি সতর্ক হইতেন৷ স্বামীর সেবা-শুশ্রূষায় হাসনেবানু সর্বদাই ব্যতিব্যস্ত, আহার-নিদ্রা একেবারে ছাড়িয়াছেন৷ জীবনে নামাজ সামান্য কাজা (কাজা-নিয়মিত সময়ের অতিক্রম৷) করিয়াছেন কি-না সন্দেহ, সে নামাজ (উপাসনা) এখন আর সময় মত হইতেছে না৷ নানা প্রকার সন্দেহ ও চিন্তায় হাসনেবানু একেবারে বিহ্বলপ্রায় হইয়াছেন৷ স্বামীর কাতর শব্দে প্রতি বাক্যে তাঁহার অন্তরের গ্রন্থি সকল ছিঁড়িয়া যাইতেছে৷ যখন একটু অবসর পাইতেছেন, তখনই ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া স্বামীর আরোগ্য কামনা করিতেছেন৷ জয়নাব মনের দুঃখ মনে মনেই রাখিতেছেন;-হাসনেবানুর কথাক্রমেই দিবানিশি

খাটিতেছেন। বিনা কার্যে তিলার্ধকালও স্বামীর পদছাড়া হইতেছেন না। নিজ প্রাণ ও নিজ শরীরের প্রতি তাঁহার মায়া-মমতা নাই। হাসানের চিন্তাতেই (জায়েদা ছাড়া) বাড়ির সকলেই মহা চিন্তিত ও মহাব্যস্ত।

জায়েদার চিন্তায় জায়েদা ব্যস্ত। জায়েদা কেবল সময় অনুসন্ধান করিতেছেন, সুযোগের পথ খুঁজিতেছেন! ক্রমে ক্রমে রাত্রি অধিক হইয়া আসিল। সকলেই আপন আপন স্থানে নিদ্রাদেবীর উপাসনায় স্ব-স্ব শয্যায় শয়ন করিলেন। হাসনেবানু প্রতি নিশিতেই প্রভু মোহাম্মদের 'রওজা শরিফে' যাইয়া ঈশ্বরের নিকট স্বামীর আরোগ্য কামনা করিতেন; আজও নিয়মিত সময়ে সকলে নিদ্রিত হইলে তস্‌বি হস্তে করিয়া ঘরের বাহির হইলেন। জায়েদা জাগিয়া ছিলেন বলিয়াই দেখিলেন যে, হাসনেবানু রওজা মোবারকের দিকে যাইতেছেন। গোপনে গোপনে তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে যাইয়া আরো দেখিলেন যে, হাসনেবানু ঈশ্বরের উপাসনার্থ দণ্ডায়মান হইলেন। দেখিয়া আসিয়াই মায়মুনাকে বলিলেন, "মায়মুনা! বোধ হয় এই উত্তম সুযোগ। হাসনেবানু এখন ঘরে নাই, রওজা হইতে ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব আছে। এখন একবার যাইয়া দেখি। যদি সুযোগ পাই, তবে এ-ই উপযুক্ত সময়।"

জায়েদা বিষের পুঁটুলি লইয়া চলিলেন। মায়মুনাও তাঁহার অজ্ঞাতসারে পাছে পাছে চলিল। অন্ধকার রজনী; চান্দ্রমাস রবিউল আউয়ালের প্রথম তারিখ। চন্দ্র উঠিয়াই অমনি অস্ত গিয়াছে;-ঘোর অন্ধকার! জায়েদা সাবধানে সাবধানে পা ফেলিয়া ফেলিয়া যাইতে লাগিলেন। স্বামীর শয়নগৃহদ্বারের নিকটে যাইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া গৃহমধ্যস্থিত সকলে জাগরিত কি নিদ্রিত, তাহা পরীক্ষা করিলেন। গৃহদ্বার যে বন্ধ নাই, তাহা তিনি পূর্বেই স্থির করিয়াছেন। কারণ, হাসনেবানু স্বামীর আরোগ্যলাভার্থে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে গিয়াই জায়েদার গৃহপ্রবেশের আরো সুবিধা করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

গায়ের ভর গায়ে রাখিয়া, হাতের জোর হাতে রাখিয়া, অল্পে অল্পে দ্বার মুক্ত করিয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া জায়েদা দেখিলেন দীপ জ্বলিতেছে। ইমাম হাসান শয্যায় শায়িত-জয়নাব বিমর্ষ বদনে হাসানের পদ দুখানি আপন বক্ষে রাখিয়া শুইয়া আছেন। অন্যান্য পরিজনেরা শয্যার চতুষ্পার্শ্বে ভিন্ন ভিন্ন শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। নিঃশ্বাসের শব্দ ভিন্ন সে গৃহে আর কোন শব্দই নাই।

দীপের আলোতে জয়নাবের মুখখানি জায়েদা আজ ভাল করিয়া দেখিলেন। নিদ্রিত অবস্থায় স্বাভাবিক আকৃতি শোভা যেরূপ দেখায়-জাগ্রতে বোধ হয়, তেমন শোভা কখনোই দেখা যায় না। কারণ, জাগ্রতাবস্থায় কৃত্রিমতার ভাগ অনেক অংশে বেশি হইয়া পড়ে। জায়েদা গৃহের মধ্যস্থ শায়িত ব্যক্তি ও দ্রব্যজাতের প্রতি একে একে কটাক্ষপাত করিলেন। সুরাহীর প্রতি দৃষ্টি পড়িবামাত্রই সুরাহীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দুই-এক পদ অগ্রসর হইয়া, ক্ষণেক দাঁড়াইয়া পশ্চাতে ও অন্যান্য দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, আবার দুই-এক পদ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রমে সুরাহীর নিকটে যাইয়া দাঁড়াইলেন। আবার গৃহমধ্যস্থিত সকলের মুখের দিকে তাকাইয়া, ইমামের মুখের দিকে চক্ষু ফেলিলেন। বিষের পুঁটুলি খুলিতে আরম্ভ করিলেন। খুলিতে খুলিতে ক্ষান্ত দিয়া, কী ভাবিয়া, আর খুলিলেন না। হাসানের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে ক্রমে মুখ, বক্ষ, ঊরু ও পদতল পর্যন্ত সর্বাগ্রে চক্ষু পড়িলে আর সে ভাব থাকিল না। তাড়াতাড়ি বিষের পুঁটুলি খুলিয়া সুরাহীর মুখের কাপড়ের উপর সমুদয় হীরকচূর্ণ ঢালিয়া দিলেন। দক্ষিণ হস্তে সুরাহীর মুখবন্ধবস্ত্রের উপর বিষ ঘষিতে আরম্ভ করিলেন। হাসানের পদতলে যাহাকে দেখিলেন, তাহাকেই বারবার বিষ-নয়নে দেখিতে লাগিলেন। স্বামীর মুখপানে আর ফিরিয়া চাহিলেন না। সমুদয় চূর্ণ জলে প্রবেশ করিলে জায়েদা ত্রস্তভাবে ঘর হইতে বাহিরে যাইবার সময়, স্বামীর মুখের দিকে তাকাইয়া পা ফেলিতেই দ্বারে আঘাত লাগিয়া একটু শব্দ হইল! এই শব্দে ইমাম হাসানের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। নিদ্রা ভঙ্গ হইল বটে, কিন্তু চক্ষের পাতা খুলিলেন না। দ্বার পূর্বমত রাখিয়া জায়েদা

অতি ত্রস্তে গৃহের বাহিরে আসিয়া কিঞ্চি� ভীত হইলেন। শেষে দেখিলেন, আর কেহ নহে- মায়মুনা! জায়েদার হাত ধরিয়া লইয়া মায়মুনা অতি চঞ্চলপদে ব্যস্তভাবে জায়েদার গৃহে প্রবেশ করিল।

দ্বারে জায়েদার পদাঘাত শব্দে ইমাম হাসানের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল; চক্ষু খুলিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে ঐ শব্দের প্রকৃত কারণ কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। গৃহমধ্যে সকলেই নিদ্রিত;-দীপ পূর্বমত জ্বলিতেছে। যেখানে যাহা ছিল, সমস্তই ঠিক রহিয়াছে। হঠা� শব্দে তাঁহার সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, ইহাই কেবল আক্ষেপের কারণ হইল। জয়নাবকে ডাকিতে লাগিলেন। জয়নাব জাগিবামাত্রই হাসান তাঁহাকে বলিলেন, "জয়নাব! শীঘ্র শীঘ্র আমাকে পানি দাও! অজূ (উপাসনার পূর্বে হস্ত-মুখাদি বিধিমত ধৌত) করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিব। এইমাত্র পিতামাতা এবং মাতামহকে স্বপ্নে দেখিলাম। তাঁহারা যেন আমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন। একটু জল পান করিব,-পিপাসা অত্যন্ত হইয়াছে।"

জল আনিতে জয়নাব বাহিরে গেলেন। হাসনেবানু তস্‌বি-হস্তে ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ইমাম হাসানকে জাগরিত দেখিয়া তাঁহার শরীরের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিবার অগ্রেই তিনি নিজেই হাসনেবানুকে স্বপ্নবিবরণ বলিলেন। "অত্যন্ত জলপিপাসা হইয়াছে, এক পেয়ালা পানি দাও।"-বলিয়া একটু উঠিয়া বসিলেন। স্বপ্নবিবরণ শুনিবামাত্রই হাসনেবানুর চিত্ত আরো অস্থির হইল, বুদ্ধিশক্তি লাঘব হইয়া গেল, মস্তক ঘুরিতে লাগিল। সুরাহীর বস্ত্রের প্রতি পূর্বে যেরূপ লক্ষ্য করিয়া দেখিতেন, তাহা আর দেখিবার ক্ষমতা থাকিল না। হাসনেবানু স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিলে বস্ত্রের উপরিস্থ হীরক-চূর্ণ ঘর্ষণের কোন-না-কোন চিহ্ন অবশ্যই তাঁহার চক্ষে পড়িত, কিন্তু স্বপ্নবৃত্তান্ত শ্রবণে এমনই বিহ্বল হইয়াছেন যে, সুরাহীর মুখ বন্ধ না থাকিলেও তিনি নিঃসন্দেহে জল ঢালিয়া স্বামীকে পান করিতে দিতেন। এক্ষণে অন্যমনস্কে সুরাহী হইতে জল ঢালিয়া পেয়ালা পরিপূর্ণ করিয়া স্বামীর হস্তে প্রদান করিলেন। ইমাম হাসানের এই শেষ পিপাসা-হাসনেবানুর হস্তে এই শেষ

জলপান!-প্রাণ ভরিয়া জলপান করিলেন। জয়নাবও পূর্ব আদেশমত জল লইয়া উপস্থিত হইলেন। হাসান হস্তপদাদি প্রালন করিয়া ঈশ্বরের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। বসিয়া বসিয়া জীবনের শেষ উপাসনা,-ইহজগতের শেষ আরাধনা আজ শেষ হইল; অন্তরও জ্বলিয়া উঠিল।

কাতর হইয়া হাসান বলিতে লাগিলেন, "আজি আবার এ কী হইল! জায়েদার ঘরে যে প্রকার শরীরে জ্বালা উপস্থিত হইয়া অস্থির করিয়াছিল, এ তো সেরূপ নয়! কলিজা হৃদয় হইতে নাভি পর্যন্ত সেই কী এক প্রকারের বেদনা, যাহা মুখে বলিবার শক্তি নাই। ঈশ্বর এ কী করিলেন! আবার বুঝি বিষ! এ তো জায়েদার ঘর নহে। তবে এ কী!-এ কী! যন্ত্রণা!-উঃ!-কী যন্ত্রণা!!"

বেদনায় হাসান অত্যন্ত কাতর হইলেন। জায়েদার ঘরে যেরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন, তাহার চতুর্গুণ বেদনা ভোগ করিতে লাগিলেন। ব্যগ্রভাবে কাসেমকে কহিলেন, "শীঘ্র শীঘ্র হোসেনকে ডাকিয়া আন। আমি নিতান্তই অস্থির হইয়াছি। আমার হৃদয়, অন্তর, শরীর সমুদয় যেন অগ্নিসংযোগে জ্বলিতেছে, সহস্র সূচিকার দ্বারা যেন বিদ্ধ হইতেছে। অন্তরস্থিত প্রত্যেক শিরা যেন সহস্র সহস্র খণ্ডে খণ্ডিত হইয়া পড়িতেছে।"

অতি ত্রস্তে কাসেম যাইয়া পিতৃব্য হোসেনের সহিত পুনরায় সেই গৃহমধ্যে উপস্থিত হইলেন। বাড়ির আর আর সকলেও আসিয়া জুটিলেন। সকলের সহিত আসিয়া জায়েদাও একপাশে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। হোসেনকে দেখিয়াই হাসান অতি কাতরস্বরে বলিতে লাগিলেন, "ভাই, আর নিস্তার নাই! আর সহ্য হয় না! আমার বোধ হইতেছে যে, কে যেন আমার অন্তরমধ্যে বসিয়া অস্ত্রাঘাতে বক্ষ, উদর এবং শরীরমধ্যস্থ মাংসপেশী, সমস্তই খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতেছে। ভাই! আমি এইমাত্র মাতামহ, মাতা এবং পিতাকে স্বপ্নে দেখিয়াছি। মাতামহ আমার হস্ত ধরিয়া স্বর্গীয় উদ্যানে বেড়াইয়া বেড়াইতেছেন। মাতামহ ও মাতা

আমাকে অনেক সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, 'হাসান! তুমি সন্তুষ্ট হও যে, শীঘ্রই পার্থিব শত্রুদের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবে।' এইরূপ স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে হঠাৎ একটি শব্দ আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। নিদ্রাভঙ্গের সহিত স্বপ্নও ভাঙ্গিয়া গেল। অত্যন্ত জলপিপাসা হইয়াছিল, সুরাহীর জল যেমন পান করিয়াছি, মুহূর্ত না-যাইতেই আমাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। এত বেদনা, এত কষ্ট আমি কখনোই ভোগ করি নাই।"

হোসেন দুঃখিত এবং কাতরস্বরে বলিতে লাগিলেন, "আমি সকলই বুঝিয়াছি। আমি আপনার নিকট আর কিছু চাই না! আমার এই ভিক্ষা যে, ঐ সুরাহীর জল পান করিতে আমায় অনুমতি করুন। দেখি জলে কী আছে।" এই বলিয়া হোসেন সুরাহী ধরিয়া জল পান করিতে উদ্যত হইলেন। হাসান পীড়িত অবস্থাতেই শশব্যস্তে, "ও কী কর? হোসেন! ও কী?" এই কথা বলিতে বলিতে শয্যা হইতে উঠিলেন,-অনুজের হস্ত হইতে সুরাহী কাড়িয়া লইয়া মাটিতে ফেলিয়া দিলেন। সুরাহী শত খণ্ডে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া গেল।

অনুজের হস্ত ধরিয়া হাসান নিজ শয্যার উপরে বসাইয়া মুখে বারবার চুম্বন দিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভাই! আমি যে কষ্ট পাইতেছি, তাহা মুখে বলিবার শক্তি নাই। পূর্ব আঘাত, পূর্ব পীড়া, এই উপস্থিত যন্ত্রণায় সকলই ভুলিয়া গিয়াছি। ভাই! দেখ তো, আমার মুখের বর্ণ কি পরিবর্তিত হইয়াছে?"

ভ্রাতার মুখপানে দৃষ্টিপাত করিয়া হোসেন কাঁদিতে লাগিলে। আর আর সকলে বলিতে লাগিল, "আহা! জ্যোতির্ময় চন্দ্রবদনে বিষাদ-নীলিমা-রেখা পড়িয়াছে!"

এই কথা শুনিয়া হাসান অনুজকে বলিলেন, "ভাই! বৃথা কাঁদিয়া লাভ কি? আমার আর বেশি বিলম্ব নাই, চিরবিদায়ের সময় অতি নিকট। মাতামহ যাহা যাহা বলিয়াছেন, সকলই প্রত্যক্ষ করিতেছি। ভাই! মাতামহ সশরীরে ঈশ্বরের আদেশে একবার ঈশ্বরের স্থানে নীত হইয়াছিলেন। সেখানে কোন-একটি নির্দিষ্ট স্থানে অতি রমণীয় দুইটি ঘর সুসজ্জিত

দেখিলেন। একটি সবুজবর্ণ, আর একটি লোহিতবর্ণ। কাহার ঘর প্রহরীকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে প্রহরী উত্তর করিল, 'আপনার অন্তরের নিধি, হৃদয়ের ধন এবং নয়নের পুতুলি হাসান-হোসেনের জন্য এই দুইটি ঘর প্রস্তুত হইয়াছে।' ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে প্রহরী কাঁপিয়া নতশির হইল, কোন উত্তর করিল না। জিব্রাইল সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন। তিনিই মাতামহকে বলিলেন, 'আয় মোহাম্মদ! দ্বারবান্ কারণ প্রকাশে লজ্জিত হইতেছে, আমি প্রকাশ করিব। আজ আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহাই বলিতে আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়াছি। নিদারুণ গুপ্ত কথা হইলেও আজ আমি আপনার নিকট ব্যক্ত করিব। ঐ দুইটি ঘর ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের হইবার কারণ কি উহার সবিশেষ বৃত্তান্ত আমি বলিতেছি, শ্রবণ করুন। সবুজবর্ণ গৃহ আপনার জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র হাসানের জন্য; লোহিতবর্ণ গৃহ কনিষ্ঠ দৌহিত্র হোসেনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। আপনার অভাবে একদল পিশাচ শত্রুতা করিয়া হাসানকে বিষপান করাইবে এবং মৃত্যুসময়ে হাসানের মুখ সবুজবর্ণ হইবে; তন্নিমিত্তই ঐ গৃহটি সবুজবর্ণ। ঐ শত্রুগণ অস্ত্র দ্বারা আপনার কনিষ্ঠ দৌহিত্র হোসেনের মস্তকচ্ছেদন করিবে। ঐ রক্তমাখা মুখের চিহ্নই লোহিতবর্ণের কারণ!'-মাতামহের বাক্য আজ সফল হইল। আমার মুখের বর্ণ যখন বিবর্ণ হইয়াছে, তখন পরমায়ুও আজ শেষ হইয়াছে। মাতামহের বাক্য অলঙ্ঘনীয়। ভাই! ঈশ্বরের কার্যও অখণ্ডনীয়।"

সবিষাদে এবং সরোষে হোসেন বলিতে লাগিলেন, "আমি আপনার চির আজ্ঞাবহ দাস, বিশেষ স্নেহের পাত্র এবং চির আশীর্বাদের আকাঙ্খী;-মিনতি করিয়া বলিতেছি, বলুন তো, আপনাকে এ বিষ কে দিয়াছে?"

"ভাই! তুমি কী জন্য বিষদাতার নাম জিজ্ঞাসা করিতেছ? তুমি কী তাহার প্রতিশোধ নিবে?"

হোসেন শয্যা হইতে উঠিয়া অতিশয় রোষভরে দুঃখিতস্বরে বলিতে লাগিলেন, "আমার প্রাণের পূজনীয় ভ্রাতাকে,-এক মাতার উদরে যে ভ্রাতা অগ্রে জন্মিয়াছেন সেই ভ্রাতাকে,-আমি বাঁচিয়া থাকিতে যে নরাধম বিষপান করাইয়াছে, সে কী অমনই বাঁচিয়া যাইবে?

আমি কী এমনই দুর্বল, আমি কী এমনই নিঃসাহসী, আমি কী এমনই ক্ষীণকায়, আমি কী এমনই কাপুরুষ, আমার হৃদয়ে কী রক্ত নাই, মাতৃস্নেহ নাই যে, ভ্রাতার প্রাণনাশক বিষ প্রদায়কের প্রতিশোধ লইতে পারিব না? যে আজ আমার একটি বাহু ভগ্ন করিল, অমূল্যধন সহোদর-রত্ন হইতে যে আজ আমাকে বঞ্চিত করিল, যে পাপিষ্ঠ আজ তিনটি সতী স্ত্রীকে অকালে বিধবা করিল, আমি কি তাহার কিছুই করিব না? যদি সে নরাধমের কোন সন্ধান লইয়া থাকেন, যদি তাহাকে চিনিয়া থাকেন, যদি অনুমানে কিছু অনুভব করিয়া থাকেন, এ আজ্ঞাবহ চিরকিঙ্করকে বলুন, আমি এখনি আপনার সম্মুখে তাহার প্রতিবিধান করিতেছি। সেই পাপাত্মা বিজন বনে, পর্বতগুহায়, অতলজলে, সপ্ততল মৃত্তিকামধ্যে-যেখানে হউক, হোসেনের হস্ত হইতে তাহার পরিত্রাণ নাই। হয় আমার প্রাণ তাহাকে দিব, নয় তাহার প্রাণ আমি লইব।"

অনুজের হস্ত ধরিয়া নিকটে বসাইয়া হাসান বলিতে লাগিলেন, "ভাই, স্থির হও! আমি আমার বিষদাতাকে চিনি। সে আমার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিল, আমি সমুদয়ই জানিতে পারিয়াছি। ঈশ্বরই তাহার বিচার করিবেন। আমার কেবল এইমাত্র আক্ষেপ যে, নিষ্কারণে আমাকে নির্যাতন করিল। আমার ন্যায় অনুগত স্নেহশীল বন্ধুকে বধ করিয়া সে যে কী সুখ মনে করিল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। যে কারণেই হউক, যে লাভেই হউক, যে আশাতেই হউক,-নিরপরাধে যে আমাকে নির্যাতন করিয়া চিরবন্ধুর প্রাণবধ করিল, দয়াময় পরমেশ্বর তাহার আশা কখনোই পূর্ণ করিবেন না। দুঃখের বিষয় এই যে, সে আমাকে চিনিতে পারিল না। যাহা হউক ভাই! তাহার নাম আমি কখনোই মুখে আনিব না। তাহার প্রতি আমার রাগ, হিংসা, দ্বেষ কিছুই নাই। ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার বিষদাতার মুক্তির জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিব। যে পর্যন্ত ঈশ্বরের নিকট হইতে তাহাকে মুক্ত করাইতে না পারি, সে পর্যন্ত স্বর্গের সোপানে পা রাখিব না। ভাই! ক্রমেই আমার বাক্‌শক্তি রোধ হইতেছে। কত কথা মনে ছিল, কিছুই বলিতে পারিলাম না। চতুর্দিক যেন অন্ধকারময় দেখিতেছি!" আবুল কাসেমের হস্ত ধরিয়া হোসেনের হস্তে সমর্পণ

করিয়া স্নেহার্দ্রচিত্ত হাসান কাতরস্বরে পুনরায় কহিতে লাগিলেন, "ভাই! ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ মানিয়া আজ আমি তোমার হস্তে কাসেমকে দিলাম৷ কাসেমের বিবাহ দেখিতে বড় সাধ ছিল, পাত্রীও স্থির করিয়াছিলাম, সময় পাইলাম না৷" হোসেনের হস্ত ধরিয়া আবার কহিলেন, "ভাই! ঈশ্বরের দোহাই, আমার অনুরোধ,-তোমার কন্যা সখিনার সহিত কাসেমের বিবাহ দিয়ো! আর ভাই! আমার বিষদাতার যদি সন্ধান পাও, কিংবা কোন সূত্রে যদি ধরা পড়ে,-তবে তাহাকে কিছু বলিয়ো না;-ঈশ্বরের দোহাই তাকে ক্ষমা করিয়ো৷"-যন্ত্রণাকুল ইমাম ব্যাকুলভাবে অনুজকে এই পর্যন্ত বলিয়া সস্নেহ বচনে কাসেমকে বলিলেন, "কাসেম! ব‌স! আশীর্বাদ করি তুমি চিরজীবী হও৷ আর বাপ! এই কবচটি সর্বদা হস্তে বাঁধিয়া রাখিও৷ যদি কখনো বিপদগ্রস্ত হও, সে বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার উপায় যদি নিজ বুদ্ধিতে কিছুই স্থির করিতে না পার, তবে এই কবচের অপর পৃষ্ঠে লক্ষ্য করিয়ো; যাহা লেখা দেখিবে, সেইরূপ কার্য করিবে৷ সাবধান! তাহার অন্যথা করিয়ো না৷"

কিয়‌ক্ষণ পরে নিস্তব্ধ থাকিয়া উপর্যুপরি তিন-চারিটি নিশ্বাস ফেলিয়া হোসেনকে সম্বোধনপূর্বক মুমূর্ষু হাসান পুনরায় কহিলেন, "ভাই! ক্ষণকালের জন্য তোমরা সকলে একবার বাহিরে যাও; কেবল জায়েদা একাকিনী এখানে উপস্থিত থাকুন৷ জায়েদার সহিত নির্জনে আমার একটি বিশেষ কথা আছে৷"

সকলেই আজ্ঞা পালন করিলেন৷ শয্যার নিকটে জায়েদাকে ডাকিয়া হাসান চুপি চুপি বলিতে লাগিলেন, "জায়েদা তোমার চক্ষু হইতে হাসান এখন চিরদূর হইতেছে-আশীর্বাদ করি সুখে থাক৷ তুমি যে কার্য করিলে, সমস্তই আমি জানিতে পারিয়াছি৷ তোমাকে বড়ই বিশ্বাস করিতাম, বড়ই ভালবাসিতাম,-তাহার উপযুক্ত কার্যই তুমি করিয়াছ৷-ভাল! সুখে থাক, আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম৷ হোসেনকেও ক্ষমা করিতে বলিয়াছি, তাহাও তুমি স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছ!-ভিতরের নিগূঢ় কথা যদি আমি হোসেনকে বলিতাম, তাহা হইলে যে কী অনর্থ সংঘটিত হইত, তাহা তুমি বুঝিতেই পারিতেছ৷ যাহা হউক, আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম, কিন্তু যিনি সর্বসাক্ষী, সর্বময়, সর্বমার অধীশ্বর, তিনি তোমাকে মা করিবেন কি-

না, বলিতে পারি না। তথাপি তোমার মুক্তির জন্য সর্বপ্রথমে আমি সেই মুক্তিদাতার নিকট পুনঃপুনঃ প্রার্থনা করিব।-যে পর্যন্ত তোমাকে মুক্ত করাইতে না পারিব, সে পর্যন্ত আমি স্বর্গের সোপানে পা রাখিব না।"

জায়েদা অধোমুখে অশ্রু বিসর্জন করিলেন, একটিও কথা কহিলেন না। সময়োচিত সঙ্কেতধ্বনি শ্রবণে হোসেনের সহিত আর-আর সকলেই সেই গৃহমধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। হাসান একে একে সকলের নিকট বিদায় লইলেন। হাসনেবানু ও জয়নাবের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া নিজকৃত অপরাধের মার্জনা চাহিলেন; শেষে হোসেনকে কহিলেন, "হোসেন! এস ভাই! জন্মের মত তোমার সহিত আলিঙ্গন করি।"-এই বলিয়া অনুজের গলা ধরিয়া অশ্রুনয়নে আবার বলিতে লাগিলেন, "ভাই! সময় হইয়াছে। ঐ মাতামহ স্বর্গের দ্বারে দাঁড়াইয়া ডাকিতেছেন। চলিলাম!"-এই শেষ কথা বলিয়াই ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে দয়াময় ইমাম হাসান সর্বসমে প্রাণত্যাগ করিলেন। যেদিন ইমাম হাসান মর্ত্যলীলা সম্বরণ করেন, সেই দিন হিজ্‌রী ৫০ সনের ১লা রবিউল আউয়াল তারিখ। হাসনেবাবু, জয়নাব, কাসেম ও আর-আর সকলে হাসানের পদলুণ্ঠিত হইয়া মাথা ভাঙিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, জায়েদা কাঁদিয়াছিলেন কি-না তাহা কেহ লক্ষ্য করেন নাই।

সপ্তদশ প্রবাহ

মদিনাবাসীরা হাসানের শোকে বড়ই কাতর হইলেন। পরিজনেরা দশ দিবস পর্যন্ত কে কোথায় রহিল, কে কোথায় পড়িয়া কাঁদিল, কে কোথায় চলিয়া গেল, কেহই তাহার সন্ধান লইলেন না; সকলেই হাসানের শোকে দিবারাত্রি অজ্ঞান। পবিত্রদেহ মৃত্তিকায় প্রোথিত হইতে-না-হইতেই নৃশংস মন্ত্রী মারওয়ান দামেস্ক নগরে এজিদের নিকট সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার সমুদয় কার্য শেষ হয় নাই, সেইজন্য স্বয়ং দামেস্ক যাত্রা করিতে পারিলেন না। ইমামবংশ একেবারে ধ্বংস করিবার মানসে ছদ্মবেশে মদিনায় রহিয়াছেন। দামেস্ক হইতে

ক্রমে ক্রমে সৈন্য আসিয়া পূর্বোক্ত পর্বতপ্রান্ত গুপ্তস্থানে জুটিতেছে। হাসানের প্রাণবিয়োগের পর পরিজনেরা,-হাসনেবানু, জয়নাব, সাহরেবানু (হোসেনের স্ত্রী) ও সখিনা (হোসেনের কন্যা) প্রভৃতি শোকে এবং দুঃখে অবসন্ন হইয়া মৃতব হইয়া আছেন। হোসেন এবং আবুল কাসেম ঈশ্বরের আরাধনায় মনোনিবেশ করিয়া উপস্থিত শোকতাপ হইতে আত্মরক্ষার উপায় নির্ধারণ করিতেছেন। জায়েদা নিজ চিন্তায় চিন্তিত ও মহাব্যতিব্যস্ত। কি করিবেন, হঠা গৃহত্যাগ করিবেন কি-না, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছেন না। মায়মুনার উপদেশে এতদূর পর্যন্ত আসিয়াছেন, এক্ষণে তাহার কথাই বেশি মূল্যবান বলিয়া মনে ধারণা হইল, আবার মায়মুনার শেষ কথা কয়েকটি এক্ষণে আরো ভাল লাগিল। কারণ জায়েদা এখন বিধবা।

পূর্বে গড়াপেটা সকলই হইয়া রহিয়াছিল, কেবল উত্তেজনা-রসানের সংযোগটি অপেক্ষা মাত্র। মায়মুনা পূর্বেই মারওয়ানের সহিত সমুদয় কথাবার্তা সুস্থির করিয়াছে, মারওয়ানও সমুদয় সাব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছেন, কেবল জায়েদার অভিমতের অপেক্ষা। জায়েদা আজ-কাল করিয়া তিন দিবস কাটাইয়াছেন; আজ আবার কী বলিবেন, কী করিবেন, নির্জনে বসিয়া তাহাই ভাবিতেছেন! আপন কৃতকার্যের ফলাফল চিন্তা করিতেছেন; অদৃষ্টফলকের লিখিত লিপির প্রতি নির্ভর করিয়া সমুদয় চিন্তা দূর করিতেছেন। পতির চিরবিচ্ছেদে দুঃখ নাই, ভবিষ্য আশায় এবং জয়নাবের প্রতিহিংসায় কৃতকার্য হইয়াও সুখ নাই। অন্তরে শান্তির নামও নাই। সর্বদাই নিতান্ত অস্থির।

মায়মুনা ঐ নির্জন স্থানেই আসিয়া বলিতে লাগিল, "তিন দিন তো গিয়াছে, আজ আবার কী বলিবে?"

"আর কী বলিব? এখন সকলই তোমার উপর নির্ভর। আমার আশা, ভরসা, প্রাণ সকলই তোমার হাতে।"

"কথা কখনোই গোপন থাকিবে না। পাড়াপ্রতিবেশীরা এখনই কানাঘুষা আরম্ভ করিয়াছে। যে যাহাকে বলিতেছে, সেই তাহাকে অপরের নিকট বলিতে বারণ করিতেছে। ধরিতে গেলে অনেকেই জানিয়াছে, কেবল মুখে রইরই হইহই হয় নাই। হোসেন ভ্রাতৃশোকে পাগল, আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দিবারাত্রি ঈশ্বরের উপাসনায় নিরত, আজ পর্যন্ত তোমার সম্বন্ধে কোন কথাই তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করে নাই! শোকের একটু উপশম হইলেই এ কথা তাঁহার কর্ণে উঠিবে। এ সাংঘাতিক সংবাদ শুনিতে কি আর বাকি থাকিবে? তোমার পক্ষ হইয়া কে দুটা কথা বলিবে বল তো?"

"আমি যে তাহা না ভাবিয়াছি তাহা নহে; আমার আশা আছে, সন্তোষ সুখ-ভোগের বাসনা আছে। যাহা করিব, পূর্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছি। এই তো রাত্রি অধিক হয় নাই, একটু অপেক্ষা কর, এখনই আমি তোমার সঙ্গে যাইতেছি। এই একটি বড় দুঃখ মনে রহিল যে, এখানে থাকিয়া জয়নাবের চিরকান্না শুনিতে পাইলাম না। তাহার বৈধব্যব্রত দেখিয়া চক্ষের সাধ মিটাইতে পারিলাম না।"

"খোদা যদি সে দিন দেন, তবে জয়নাবকে হাতে আনা কতক্ষণের কাজ? জয়নাব কি আজ সেই জয়নাব আছে? এখন তো সে পথের ভিখারিণী! যে ইচ্ছা করিবে, সেই তাহাকে হস্তগত করিতে পারিবে। দেখ দেখি, শীঘ্র শীঘ্র সকল কাজ শেষ হইলে কত প্রকার মঙ্গলের আশা? জয়নাবকে লইতে কতক্ষণ লাগিবে? আবার বিবেচনা কর, বিলম্বে কত দোষের সম্ভাবনা। মানুষের মন ক্ষণ-পরিবর্তনশীল। তাহার উপর একটু আসক্তির ভাবও পূর্ব হইতেই আছে;-বাধা-প্রতিবন্ধক সকলই শেষ হইয়াছে;-জয়নাবও যে আপন ভালমন্দ চিন্তা না করিতেছে, তাহাও মনে করিয়ো না,-এদিকে আসক্তির আকর্ষণ, ওদিকে নিরুপায়। এখন স্বেচ্ছায় বশীভূত হইয়া শরণাগত হইলে সে যে কোথাও স্থান পাইবে না, সে যে আদৃত হইবে না, তাহার বিশ্বাস কী? শত্রু নির্যাতনে মনের কষ্টের প্রতিশোধ লইতেই তোমার সঙ্গে এত

কথা,-এমন প্রতিজ্ঞা। জয়নাবই যদি অগ্রে যাইয়া তাহার আশ্রয় গ্রহণ করে, তবে তো তোমার সকল আশাই এই পর্যন্ত শেষ হইল। এদিকেও মজাইলে, ওদিকেও হারাইলে।"

"না-না-আমি যে আজ-কাল করিয়া কয়েক দিন কাটাইয়াছি, তাহার অনেক কারণ আছে। আমি আজ আর কিছুতেই থাকিব না। লোকের কাছে কী করিয়া মুখ দেখাইব?-হাসনেবানু, জয়নাব, সাহরেবানু, এই তিনজনই আজ আমার নাম করিয়া অনেক কথা কহিয়াছে। দূর হইতে তাহাদের অঙ্গভঙ্গি ও মুখের ভাব দেখিয়াই আমি জানিয়াছি যে, সকলেই সকল কথা জানিয়াছে! হোসেনের কানে উঠিতেই বাকি। সঙ্গে আমি কিছুই লইব না। যেখানে যাহা আছে, সকলই রহিল, এই বেশেই চলিয়া যাইব।"

এই বলিয়া জায়েদা উঠিলেন। সেইসঙ্গে মায়মুনাও উঠিয়া তাঁহার পশ্চাদ্বর্তিনী হইল। রাত্রি বেশি হয় নাই, অথচ হোসেনের অন্তঃপুরে ঘোর নিস্তব্ধ নিশীথের ন্যায় বোধ হইতেছে। সকলেই নিস্তব্ধ। দুঃখিত অন্তরে কেহ কেহ আপন আপন গৃহে শুইয়া, কেহ কেহ-বা বসিয়া আছেন। আকাশ তারাদলে পরিশোভিত কিন্তু হাসান-বিরহে যেন মলিন মলিন বোধ হয়। সে বোধ,-বোধ হয় মদিনাবাসীদিগের চক্ষে ঠেকিতেছে।-বাটী-ঘর সকলই পড়িয়া রহিয়াছে, যে স্থানে তিনি যে কার্য করিতেন, তাহা কেবল কথাতেই আছে, পরিজনের মনেই আছে, কিন্তু মানুষ নাই। চন্দ্রমাও মদিনাবাসীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া, হাসানের পরিজনের দুঃখে দুঃখিত হইয়া,-মলিনভাবে অস্তাচলে চলিয়া গেলেন। জায়েদাও যাহার অপেক্ষায় বিলম্ব করিতেছিলেন, সে অপেক্ষা আর নাই। মনের আশা পূর্ণ হইল। এখন অন্ধকার। মায়মুনার সহিত জায়েদা বিবি চুপি চুপি বাটীর বাহির হইলেন। কাহারো সহিত দেখা হইল না। কেবল একটি স্ত্রীলোকের ক্রন্দনস্বর জায়েদার কর্ণে প্রবেশ করিল। জায়েদা দাঁড়াইলেন। বিশেষ মনোযোগের সহিত শুনিয়া শুনিয়া আপনাআপনি বলিতে লাগিলেন, "তোকে কাঁদাইতেই এই কাজ করিয়াছি! যদি স্বামীকে ভালবাসিয়া থাকিস্, তবে আজ কেন,-চিরকালই কাঁদিবি!

চন্দ্র, সূর্য, তারা, দিবা, নিশি সকলই তোর কান্না শুনিবে। তাহা হইলেই কী তোর দুঃখ শেষ হইবে? তাহা মনে করিস্ না। যদি জায়েদা বাঁচিয়া থাকে, তবে দেখিস্ জায়েদার মনের দুঃখের পরিমাণ কত? শুধু কাঁদাইয়াই ছাড়িবে না। আরো অনেক আছে। এই তো আজ তোরই জন্য-পাপীয়সী!-কেবল তোরই জন্য জায়েদা আজ স্বামীঘাতিনী বলিয়া চিরপরিচিত হইল। আজ আবার তোরই জন্য জায়েদা এই স্বামীগৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিল।"

তীব্রস্বরে এইরূপ কথা বলিতে বলিতে মায়মুনার সহিত দ্রুতপদে জায়েদা বাটীর বাহির হইলেন। বাহির হইয়াই দেখিলেন, কয়েকজন সৈনিক পুরুষ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া গমনোপযোগী বাহনাদির সহিত সম্মুখে উপস্থিত। কেহ কোন কথা বলিল না। সৈনিক পুরুষ মায়মুনার ইঙ্গিতে জায়েদাকে অভিবাদন করিয়া বিশেষ মান্যের সহিত এক উষ্ট্রে আরোহণ করাইল। মায়মুনাও উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরোহণ করিল। কিছু দূরে যাইবার পর ছদ্মবেশী মারওয়ান তাঁহাদের সঙ্গে একত্র মিলিত হইলেন। নগরপ্রান্তের সেই নির্দিষ্ট পর্বতগুহার সন্নিকটে আসিয়া। মায়মুনার সহিত মারওয়ানের অনেক শিষ্টাচার ও কথোপকথন হইল। অনন্তর মারওয়ান আরো বিংশতি জন সৈন্য সজ্জিত করিয়া জায়েদার সহিত দামেস্কে পাঠাইয়া দিলেন।

রজনী প্রভাতে হোসেনের পরিজনেরা দেখিলেন, জায়েদা গৃহে নাই। শেষে হোসেনও সেই কথা শুনিলেন। অনেক সন্ধান করিলেন, কোন স্থানেই জায়েদার সন্ধান পাওয়া গেল না। জায়েদা কেন গৃহত্যাগিনী হইল, সে কথা বুঝাইয়া বলিতে, কী বুঝিতে কাহারো বাকি রহিল না। সকলেই বলিতে লাগিল, "কোন্ প্রাণে আপন হাতে বিষ পান করাইয়া প্রাণের প্রিয়তম স্বামীর প্রাণ হরণ করিল? উহার জায়গা কোথায় আছে? জগ কী পাপভরে এতই ভারাক্রান্ত হইয়াছে যে, মহাপাপাক্রান্ত জায়েদার ভার অকাতরে সহ্য করিবে?-স্বামীঘাতিনীর স্থান কি ইহলোকে কোন স্থানে হইবে?-নরক কাহার জন্য?-বোধ হয় সে নরকেও জায়েদার ন্যায় মহাপাপিনীর স্থান নাই।"

অনেকেই অনেক কথা বলিলেন, যাহা হয় নাই, তাহাও ঘটাইলেন। জায়েদা যাহা কখনো মনেও ভাবে নাই, তাহাও কেহ কেহ রটাইয়া দিলেন। হোসেন চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে নূরনবী মোহাম্মদ মোস্তফার রওজা মোবারকের দিকে চলিয়া গেলেন। ভ্রাতার নিকটে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন বিষদাতার সন্ধান জানিলেও তাহাকে কিছুই বলিবেন না,-তাহার প্রতি কোনরূপ দৌরাত্ম্যও করিবেন না। জায়েদা মদিনায় নাই, থাকিলেও কিন্তু হোসেন অবশ্যই ভ্রাতৃ-আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেন। এখনো তাহাই মনে করিয়া ঈশ্বরের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

অষ্টাদশ প্রবাহ

এজিদ্ যে দিবস হাসানের মৃত্যুসংবাদ পাইলেন, মনের আনন্দে সেই দিনই অকাতরে ধনভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছেন। দিবা-রাত্রি আমোদ-আহ্লাদ। স্বদেশজাত "মাআল্-আনব"-নামক চিত্ত-উত্তেজক মদ্য সর্বদাই পান করিতেছেন। সুখের সীমা নাই। রাজপ্রাসাদে দিবারাত্রি সন্তোষসূচক 'সাদিয়ানা' বাদ্য বাজিতেছে। পূর্বেই সংবাদ আসিয়াছে মায়মুনার সঙ্গে জায়েদা দামেস্কে আসিতেছেন। আজই আসিবার সম্ভাবনা। এ চিন্তাও এজিদের মনে রহিয়াছে। স্বামীহন্তা জায়েদাকে দেখিতে এজিদের বড়ই সাধ হইয়াছে। জায়েদাকে অঙ্গীকৃত অর্থ দান করিবেন-এই প্রতিজ্ঞাটিও প্রতিপালন করিবেন। মায়মুনাকে কী প্রকারে পুরস্কৃত করিবেন, নবনরপতি এজিদ্ তাহাও চিন্তা করিতেছেন। পূর্বেই ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন যে, "আমার পরমশত্রুমধ্যে একজনকে মারওয়ানই কৌশল করিয়া বধ করিয়াছে, দামেস্কের ঘরে ঘরে সকলে আমোদ-আহ্লাদে প্রবৃত্ত হউক। অর্থের অনটন হইলে তজ্জন্য রাজভাণ্ডার অবারিতরূপে খোলা রহিল। সপ্তাহকাল রাজকার্য বন্ধ;-দিবারাত্রে কেবল আনন্দস্রোত বহিতে থাকিবে। যে ব্যক্তি হাসানের মৃত্যুসংবাদে দুঃখিত হইবে, কিংবা শোকাশ্রু বিনির্গত করিবে, কিংবা কোন প্রকার শোকচিহ্ন অঙ্গে ধারণ করিবে, তাহার গর্দান মারা যাইবে। যদি প্রকাশ

পায় যে, এই সপ্তাহকালমধ্যে কেহ কোন কারণে দুঃখের সহিত এক বিন্দু চক্ষের জল ফেলিয়াছে, তাহার শরীর হইতে সহস্রাধিক শোণিতবিন্দু বহির্গত করা হইবে।" অনেকেই মহাহর্ষে রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছে; কেহ কেহ প্রাণের ভয়ে আমোদে মাতিয়াছে।

সুসজ্জিত প্রহরীবেষ্টিত হইয়া মায়মুনার সহিত জায়েদা দামেস্ক নগরে উপস্থিত হইলেন। জায়েদার আগমন সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া মনে মনে কি অনুধ্যানপূর্বক এজিদ্ বলিলেন, "আজি আমার শরীর কিছু অসুস্থ। জায়েদা এবং মায়মুনাকে বিশেষ অভ্যর্থনার সহিত আমার উদ্যানস্থ প্রমোদভবনে স্থান দান কর। যথাযোগ্য আদরে তাহাদিগকে গ্রহণ কর। কোন বিষয়ে যেন অমর্যাদা কিংবা কোন ত্রুটি না হয়। আগামীকল্য প্রথম প্রকাশ্য দরবারে তাহাদের সহিত আমার দেখা হইবে। পরে অন্য কথা।"

এইরূপ উপদেশ দিয়া রাজা এজিদ্ তদর্থ উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিলেন। এজিদের আজ্ঞাক্রমে, তাঁহার উপদেশমতে সমুদয় কার্য সুসম্পন্ন হইল। জায়েদা ও মায়মুনা যথাযোগ্য সমাদরে প্রমোদভবনে স্থান পাইলেন। পরিচারক, পরিচারিকা, রক্ষক, প্রহরী সকলই নিয়োজিত হইল। দেখিতে দেখিতে সূর্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন। নিশা যে কী জিনিস, আর ইহার ক্ষমতা যে কী, তাহা বোধ হয় আজ পর্যন্ত অনেকেই বুঝিতে পারেন নাই। সমস্ত দিন চিরদুঃখে কাটাইয়া, কুহকিনী নিশার আগমনে নিদ্রায় অভিভূত হইলে সে দুঃখের কথা কাহার মনে থাকে? নিশ্চয়ই সূর্য উদয় হইলে প্রাণবিয়োগ হইবে, এ কথা জানিয়াও যদি রাত্রে নিদ্রাভিভূত হয়, তাহা হইলে প্রভাতের ভাবী ঘটনার কথা কি সেই দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত অভাগার মনে পড়ে? দিবসে সন্তান-বিয়োগ হইয়াছে, ঐ কুহকিনী আসিয়া চতুর্দিক অন্ধকার করিল, ক্রমে জগ� নিস্তব্ধ করিল, অজ্ঞাতসারে নিদ্রাকে আহ্বান করিল, সন্তানের বিয়োগজনিত দুঃখ কি তখন সন্তানবিয়োগীর মনে থাকে?-জায়েদা প্রমোদভবনে পরিচারিকাবেষ্টিতা হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে স্বর্ণপালঙ্কে কোমল শয্যায় শুইয়া আছেন। কত কী ভাবিতেছেন, তাহার তরঙ্গ অনেক। প্রথমতঃ দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা, তারপর রাজরাণী। এই

প্রথম নিশাতেই সুখসোপানে আরোহণ করিয়াছেন? প্রভাত হইলেই রাজদরবারে নীত হইবেন, সুখের প্রাঙ্গণে পদার্পণ করিবেন, তপরেই গৃহপ্রবেশ! পরমায়ুর শেষ পর্যন্ত সুখ-নিকেতনে বাস করিবেন। মায়মুনা রাজরাণী হইবে না, শুধু কেবল স্বর্ণমুদ্রাপ্রাপ্ত হইবে মাত্র!

জায়েদার শয্যার পার্শ্বেই নিম্নতর আর একটি শয্যায় মায়মুনা শয়ন করিয়া আছে। তাহার মনে কী কোন চিন্তা নাই?-আশা নাই?-আছে। মারওয়ানের স্বীকৃত অর্থ মদিনায় বসিয়াই পাইতে পারিত, এতদূর পর্যন্ত আসিবার কারণ কিছু বেশির প্রত্যাশা। উভয়েই আপন আপন চিন্তায় চিন্তিত, উভয়েই নীরব। নিশার কার্য নিশা ভুলে নাই। ক্রমে ক্রমে উভয়েই নিদ্রার কোলে অচেতন। একবার এই সময়ে এজিদের শয়নগৃহটি দেখিয়া আসা আবশ্যক। আজ এজিদের মনের ভাব কিরূপ?-এত আশা এবং এত সুখকামনার মধ্যে আবার কিসের পীড়া? এজিদ্ আজ মনের মত মনতোষিণী সুরাপান করিয়া বসিয়া আছেন, এখনো শয়ন করেন নাই। সম্মুখে পানপাত্র, পেয়ালা এবং মদিরাপূর্ণ সুরাহী ধরা রহিয়াছে। রজতপ্রদীপে সুগন্ধি-তৈলে আলো জ্বলিতেছে। জনপ্রাণীমাত্র সে গৃহে নাই। গৃহের দ্বারে, কিঞ্চি দূরে নিষ্কোষিত অসিহস্তে প্রহরী সতর্কিতভাবে প্রহরিতা করিতেছে। মদ্যপানে অজ্ঞানতা জন্মে, সাধ্যাতীত ব্যবহার করিলে মানবপ্রকৃতি বিকৃতিপ্রাপ্ত হয়। মানুষ তখন পশু হইতেও নীচ হইয়া পড়ে। কিন্তু সাধ্য-সমতার অতীত না হইলে বোধ হয় অতি জঘন্য হৃদয়ে অনেক উকৃষ্ট ভাবও আসিয়া উপস্থিত হয়। এজিদ্ আজ একা একা অনেক কথা বলিতেছেন। বোধ হয়, সুরাদেবীর প্রসাদে তাঁহার পূর্বকৃত কার্য একে একে স্মরণপথে উপস্থিত হইয়াছে। প্রথম জয়নাবকে দর্শন,-তাহার পর পিতার নিকট মনোগত ভাব প্রকাশ,-তাহার পর মাবিয়ার রোষ,-পরে আশ্বাস প্রাপ্তি,-আবদুল জাব্বারের নিমন্ত্রণ কল্পিতা ভগ্নীর বিবাহ-প্রস্তাব,-অর্থ লালসায় আবদুল জাব্বারের জয়নাব পরিত্যাগ, বিবাহ জন্য কাসেদ প্রেরণ,-বিফলমনোরথে কাসেদের প্রত্যাগমন,-পীড়িত পিতার উপদেশ, প্রথমে কাসেদের শরনিক্ষেপে প্রাণসংহার, মোস্লেমকে কৌশলে কারাবদ্ধ করা,-পিতার মৃত্যু, নিরপরাধে মোস্লেমের প্রাণদণ্ড, হাসানের সহিত যুদ্ধঘোষণা, যুদ্ধে পরাজয়ের পর নূতন মন্ত্রণা,-মায়মুনা এবং জায়েদার সহায়ে হাসানের প্রাণবিনাশ, মারওয়ানের প্রভুভক্তি,-জায়েদা এবং মায়মুনার দামেস্কে

আগমন, প্রমোদভবনে স্থাননির্দেশ। এজিদ্ ক্রমে ক্রমে এই সকল বিষয় আলোচনা করিলেন। সুরাপ্রভাবে মনের কপটতা দূর হইয়াছে; হিংসা, দ্বেষ, শত্রুতা ঐ সময়ে অন্তর হইতে অনেক পরিমাণে বিদূরিত হইয়াছে। আজ এজিদের চক্ষের জল পড়িল; কেন পড়িল, কে বলিবে? পাষাণময় অন্তর আজ কেন কাঁদিল? কে জানিবে? কী আশ্চর্য! যদি সুরার প্রভাবে এখন এজিদের চিরকলুষিত পাপময় কুটিল অন্তরে সরলভাবে পবিত্রতা আসিয়া থাকে, তবে সুরা! তোমাকে শত শত বার নমস্কার! শত শত বার ধন্যবাদ! জগতে যদি কিছু মূল্যবান বস্তু থাকে, সেই মূল্যবান বস্তু তবে তুমি! হে সুরেশ্বরী! পুনর্বার আমি ভক্তিভাবে তোমাকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করি!! এজিদ্ আর এক পাত্র পান করিলেন। কোন কথা কহিলেন না। ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে থাকিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন।

প্রমোদভবনে জায়েদা ও মায়মুনা নিদ্রিতা। রাজপ্রাসাদে এজিদ্ নিদ্রিত; মদিনায় হাসানের অন্তঃপুরে হাসনেবানু নিদ্রিতা; জয়নাবও বোধ হয় নিদ্রিতা। এই কয়টি লোকের মনোভাব পৃথক পৃথকরূপে পর্যালোচনা করিলে ঈশ্বরের অপার মহিমার একটি অপরিসীম দৃষ্টান্তপ্রাপ্ত হওয়া যায়। যদি ইহারা সকলেই নিদ্রিতাবস্থায় আপন আপন মনোমত ভাবের ফলানুযায়ী স্বপ্নে মাতিয়া থাকেন, তবে কে কি দেখিতেছেন? বোধ হয় জয়নাব আলুলায়িত কেশে, মলিন বসনে, উপাধানশূন্য মৃত্তিকাশয্যায় শয়ন করিয়া-হাসানের জীবিতকালের কার্যকলাপে অর্থা বিবাহের পরবর্তী ঘটনাবলী,-যাহা তাঁহার অন্তরে চিরনিহিত রহিয়াছে, তাহারই কোন-না-কোন অংশ লইয়া স্বপ্নে ব্যতিব্যস্ত রহিয়াছেন। হাসনেবানুও স্বপ্নযোগে স্বামীর জ্যোতির্ময় পবিত্র দেহের পবিত্র কান্তি দেখিয়া কতই আনন্দ অনুভব করিতেছেন। স্বর্গের অপরিসীম সুখভোগে লালায়িতা হইয়া ইহজীবন ত্যাগে স্বামীপদপ্রান্তে থাকিতে যেন ঈশ্বরের নিকট কতই আরাধনা করিতেছেন। জায়েদা বোধ হয়, এক-একবার ভীষণ মূর্তি স্বপ্নে দেখিয়া নিদারুণ আতঙ্কে জড়সড় হইতেছেন, ফুঁকারিয়া কাঁদিতে পারিতেছেন না, পলাইবার উপযুক্ত স্থানও খুঁজিয়া পাইতেছেন না। স্বপ্নকুহকে ত্রস্তপদে যাইবারও শক্তি নাই, মনে মনে কাঁদিয়া কাঁদিয়া কতই মিনতি করিতেছেন। আবার সে সকলই যেন কোথায় মিশিয়া গেল। জায়েদা যেন রাজরাণী, শত শত দাসী-সেবিতা, এজিদের পাটরাণী, সর্বময়ী গৃহিনী। আবার

যেন তাহাও কোথায় মিশিয়া গেল! জায়েদা যেন স্বামীর বন্দিনী। প্রাণবিনাশিনী বলিয়া অপরাধিনী;-ধর্মাসনে এজিদ্ যেন বিচারপতি। মায়মুনা টাকার ভার আর বহিতে ও সহিতে পারিতেছে না। এত টাকা লইয়া কী করিবে? কোথায় রাখিবে? আবার যেন ঐ টাকা কে কাড়িয়া লইল! মায়মুনা কাঁদিতেছে। টাকা অপহারক বলিতেছে, "নে-পাপীয়সী। এই নে! তোর এ পাপপূর্ণ টাকা লইয়া আমি কি করিব?" এই বলিয়া টাকা নিক্ষেপ করিয়া মায়মুনার শিরে যেন আঘাত করিতে লাগিল! মায়মুনা কাঁদিয়া অস্থির। তাহার কান্নার রবে জায়েদার নিদ্রাভঙ্গ হইল। এজিদের বিচার হইতেও তিনি নিষ্কৃতি পাইলেন।

যে গৃহে জায়েদা ও মায়মুনা, সেই শয়নগৃহে আর আর সকলে নিদ্রিত, কেবল তাহারা দুই জনেই জাগিয়া আছেন। উভয়ে পরস্পর অনেক কথা কহিতে লাগিলেন।

এজিদ্ সুরাপ্রভাবে ঘোর নিদ্রাভিভূত। অনেক দিনের পর পিতাকে আজ বোধ হয় স্বপ্নে দেখিয়াই বলিলেন, "আমাকে রক্ষা করুন। আমি আর কখনোই হাসানের অনিষ্ট করিব না।" মাদকতার অনেক লাঘব হইয়াছে; কিন্তু পিপাসার ক্রমশঃই বৃদ্ধি। শয়নকে সুশীতল জলপূর্ণ স্বর্ণসুরাহী ছিল, জল পান করিয়া পিপাসা নিবৃত্তি করিলেন। শুকতারার উদয় দেখিয়া আর ঘুমাইলেন না;-প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপন করিয়া রাজপরিচ্ছদ ধারণ করিলেন। এদিকে জগলোচন-রবিদেব সহস্র কর বিস্তার করিয়া আসিতেছেন;-কাহার সাধ্য, তাঁহার সম্মুখে দাঁড়ায়! শুকতারার অন্তর্ধান, ঊষার আগমন ও প্রস্থান; দেখিতে দেখিতে সূর্যদেবের অধিষ্ঠান। এজিদের প্রকাশ্য দরবার দেখিবার আশায়ই যেন লোহিতবর্ণ ধারণ করিয়া পূর্বাকাশপতি হাসিতে হাসিতে পূর্বাকাশে দেখা দিলেন-হাসিতে হাসিতে দামেস্ক নগরীকে জাগরিত করিলেন। স্বামীহন্তা জায়েদাকে এজিদ্ পুরস্কৃত করিবেন, সাহায্যকারিণী মায়মুনাকেও অর্থদান করিবেন, জায়েদাকেও মারওয়ানের স্বীকৃত স্বর্ণমুদ্রা দান করিয়া প্রতিজ্ঞা রা করিবেন, অধিকন্তু জায়েদাকে পাটরাণীরূপে গ্রহণ করিবারও ইচ্ছা আছে; সূর্যদেব প্রতি ঘরে ঘরে স্বকীয় কিরণ বিকিরণের সহিত ঐ কথাগুলি ঘোষণা করিয়া

দিলেন। রাজমুকুট শিরে ধারণ করিয়া মহারাজ এজিদ্ খাস্ দরবারে বার দিলেন। প্রহরিগণ সশস্ত্রে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইল। অমাত্যগণ এবং পূর্বাহূত নগরস্থ প্রধান প্রধান মাননীয় মহোদয়গণ স্ব-স্ব স্থান পূর্ণ করিয়া দরবারের শোভা সম্বর্ধন করিলেন। জায়েদা ও মায়মুনা পূর্ব-আদেশ অনুসারে পূর্বেই দরবারে নীত হইয়াছিলেন। শাহীতক্তের বামপার্শ্বে দুইটি স্ত্রীলোক। জায়েদা রজতাসনে আসীনা, মায়মুনা কাষ্ঠাসনে উপবিষ্টা। জায়েদার প্রতি অনেকেরই দৃষ্টি পড়িতেছে। যাঁহারা জায়েদার কৃতকার্য বিষয়ে সবিশেষ পরিজ্ঞাত, অথচ ইমাম হাসানের প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহারা জায়েদার সাহসকে ধন্যবাদ দিয়া তাহার ঘর্মাক্ত ললাট, বিস্ফারিত লোচন ও আয়ত ভ্রূযুগলের প্রতি ঘনঘন সস্পৃহ দৃষ্টিপাত করিতেছেন।

এজিদ্ বলিতে লাগিলেন, "আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, হাসান আমার চিরশত্রু ছিল, নানাপ্রকারে আমার মনে কষ্ট দিয়াছে। আমি কৌশল করিয়া এই সিংহাসন রক্ষা করিয়াছি; সেই চিরশত্রু হাসান কোন বিষয়েই আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল না, তথাচ তাহার বংশগৌরব এত প্রবল ছিল যে, নানাপ্রকার অযথা কটূক্তি দ্বারা সর্বদাই আমার মনে ব্যথা দিয়াছে। আমি সেদিকে লক্ষ্য করি নাই। রাজ্য বিস্তারই আমার কর্তব্য কার্য। বিশেষ মদিনারাজ্যের শাসনভার নিঃসহায়, নির্ধন ভিখারির হস্তে থাকা অনুচিত বিবেচনা করিয়া প্রথমতঃ কাসেদের দ্বারা তাঁহাদিগকে আমার বশ্যতা স্বীকার করিবার আদেশ করা হইয়াছিল। সে কথা তাঁহারা অবহেলা করিয়া কাসেদ্‌কে বিশেষ তিরস্কারের সহিত দামেস্ক সিংহাসনের অবমাননা করিয়া, আমার লিখিত পত্র শত খণ্ডিত করিয়া উত্তরস্বরূপ সেই কাসেদের হস্তে পুনঃপ্রেরণ করিয়াছিল। সেই কারণেই আমি যুদ্ধ ঘোষণা করি। প্রিয় মন্ত্রী মারওয়ানকে সেই যুদ্ধে "সিপাহসালার" (প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ) পদে বরণ করিয়া বহুসংখ্যক সৈন্যসহ হাসানকে বাঁধিয়া আনিতে মদিনায় প্রেরণ করি। আমার সৈন্যগণের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া হাসানের পক্ষে মিলিত হয় এবং দামেস্কের অবশিষ্ট সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিয়া যুদ্ধে পরাস্ত করে। কি করি, চিরশত্রু দমন না করিলেও নহে, এদিকে সৈন্যদিগকের চক্রে বাধ্য হইয়া হাসানের প্রাণ কৌশলে গ্রহণ করাই যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা হয়।

এই যে কাষ্ঠাসনোপরি উপবিষ্টা বিবি মায়মুনাকে দেখিতেছেন, ইহার কল্যাণে-আর এই রজতাসনে উপবিষ্টা বিবি জায়েদার সাহায্যে আমার চিরশত্রু বিনষ্ট হইয়াছে। বিবি জায়েদা আমার জন্য বিস্তর পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। কয়েকবার স্বহস্তে আপন স্বামী হাসানকে বিষপান করাইয়াছিলেন, শেষে হীরকচূর্ণ জলে মিশাইয়া পান করাইলেন। তাহাতেই চিরশত্রু, আমার চিরশত্রু ইহজগ পরিত্যাগ করিয়াছে। আমি এই মহোদয়ার কৃপাতেই শত্রুবিহীন হইয়াছি। এই গুণবতী রমণীর অনুগ্রহেই আমি প্রাণে বাঁচিয়াছি, এই সদাশয়া ললনার কৌশলেই আজ আমার মন কিঞ্চি শান্তিলাভ করিয়াছে। বহু চেষ্টা ও বহু পরিশ্রমের ফল এই মহামতী যুবতীর দ্বারাই সুপক্ক হইয়া ফলিয়াছে। আর এই বিবি মায়মুনা, ইহার সহিত এই কথা ছিল যে, যে কৌশলে, যে কুহকেই হউক, হাসানকে প্রাণে মারিতে পারিলে ইনি সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইবেন।"

ইঙ্গিতমাত্র কোষাধ্য সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পরিপূর্ণ থলিয়া আনিয়া বিবি মায়মুনার সম্মুখে রাখিয়া দিয়া, সসম্ভ্রমে পূর্বস্থানে পূর্বব করজোড়ে দণ্ডায়মান রহিল।

এজিদ্ পুনর্বার বলিতে লাগিলেন, "রজতাসনপরিশোভিতা এই বিবি জায়েদার সহিত এই অঙ্গীকার করিয়াছিলাম যে, আপনার প্রিয়তম পতির প্রাণ যদি আপনি বিনাশ করিতে পারেন, তবে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা, মূল্যবান্ বস্ত্র ও মণিময় অলঙ্কার দান করিয়া রাজসিংহাসনে বসাইব।"

সঙ্কেতমাত্র কোষাধ্য সহস্র স্বর্ণমুদ্রাপূরিত কয়েকটি রেশমবস্ত্রের থলিয়া, রত্নময় অলঙ্কার এবং কারুকার্যখচিত বিচিত্র বসন জায়েদার সম্মুখে রাখিয়া দিল।

কিয়ক্ষণ চিন্তা করিয়া এজিদ্ আবার বলিলেন, "যদি ইচ্ছা হয়, তবে বিবি জায়েদা এই সিংহাসনে আমার বাম পার্শ্বে আসিয়া বসুন।-বিবি জায়েদা! আপনি আপনার অঙ্গীকার পরিপূর্ণ করিয়াছেন, এখন আমিও আমার অঙ্গীকার পরিপূর্ণ করি।"

জায়েদা মনে মনে ভাবিলেন, বস্ত্র, অলঙ্কার ও মোহর, সকলই তো পাইয়াছি; এক রাজরাণী হওয়াই বাকি ছিল, রাজা যখন নিজেই তাঁহার বামপার্শ্বে বসিতে আদেশ করিতেছেন, তখন সে আশাও পূর্ণ হইল। বিবাহ না হয় পরেই হইবে। রাজরাণী করিয়া আর আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। এই ভাবিয়া বুদ্ধিমতী জায়েদা সন্তুষ্ট হৃদয়ে রজতাসন পরিত্যাগপূর্বক রাজসিংহাসনে এজিদের বামপার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিলেন।

এজিদ্ বলিলেন, "আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল। এক্ষণে আমার কয়েকটা কথা আছে, আপনারা সকলেই মনোযোগপূর্বক শ্রবণ করুন।"-এই কথা বলিয়াই এজিদ্ সিংহাসন ছাড়িয়া একেবারে নিচে নামিলেন। জায়েদা আর তখন কি বলিয়া সিংহাসনে বসিয়া থাকিবেন, সলজ্জভাবে অতি ত্রস্তে তিনিও সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া সভাস্থলে এজিদের পার্শ্বদেশে দাঁড়াইলেন।

এজিদের বাক্যস্রোত বন্ধ হইল। স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। জায়েদার সিংহাসন পরিত্যাগ দেখিয়া,-ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া, পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন, "আমার শত্রুকে এই বিবি জায়েদা বিনাশ করিয়াছেন, আমি ইহার নিকট আজীবন কৃতজ্ঞতাঋণে আবদ্ধ থাকিলাম। কিন্তু সামান্য অর্থলোভে এমন প্রিয়তম নির্দোষ পতির প্রাণ যে রাক্ষসী বিনাশ করিয়াছে, তাহাকে কি বলিয়া কোন্ বিশ্বাসে আমার জীবনের চিরসঙ্গিনী সহধর্মিণী পদে বরণ করিয়া লইব? আমার প্রলোভনে ভুলিয়া যে পিশাচী এক স্বামীর প্রাণ বিনাশ করিল, অন্য কাহারো প্রলোভনে ভুলিয়া সেই পিশাচী আমার প্রাণও তো অনায়াসে বিনাশ করিতে পারে! যে স্ত্রী স্বামীঘাতিনী,-স্বহস্তে স্বামীর প্রাণ বধ করিতে যে এক বার নয়, দুই বার নয়, কয়েক বার বিষ দিয়া শেষ বারে কৃতকার্য হইল, আমি দণ্ডধর রাজা, তাহার সমুচিত শাস্তি বিধান করা কী আমার কর্তব্য নহে? ইহার ভার আমি আর কাহারো হস্তে দিব না; পাপীয়সীর শাস্তি, আমি গতরাত্রে আমার শয়নমন্দিরে বসিয়া যাহা সাব্যস্ত করিয়াছি, তাহাই পালন করিব।" এই কথা বলিয়াই কটিবন্ধসংযুক্ত দোলায়মান অসিকোষ হইতে সুতীক্ষ্ণ তরবারী রোষভরে নিষ্কোষিত করিয়া জায়েদার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "পাপীয়সী! স্ত্রী হইয়া স্বামীবধের প্রতিফল ভোগ কর! প্রিয় পতির প্রাণহরণের প্রতিফল!" এই বলিয়া কথার

সঙ্গে সঙ্গেই এজিদ্ স্বহস্তে এক আঘাতে পাপিনী জায়েদাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। শোণিতের ধারা ছুটিল। এজিদের অসি জায়েদার রক্তে রঞ্জিত হইল! কী আশ্চর্য!

অসি হস্তে গম্ভীরস্বরে এজিদ্ পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "ঐ কুহকিনী মায়মুনার শাস্তি আমি স্বহস্তে বিধান করিব না! আমার আজ্ঞায় উহার অর্ধশরীর মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া, প্রস্তরনিক্ষেপে মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেল।" আজ্ঞামাত্র প্রহরিগণ মায়মুনার হস্ত ধরিয়া দরবারের বাহিরে টানিয়া লইয়া গেল। মাটিতে অর্ধদেহ পুঁতিয়া প্রস্তরনিক্ষেপে মস্তক চূর্ণ করিল। স্বপ্ন আজ মায়মুনার ভাগ্যে সত্য সত্য ফলিয়া গেল। সভাস্থ সকলেই "যেমন কর্ম তেমনি ফল!" বলিতে বলিতে সভাভঙ্গের বাদ্যের সহিত সভাভূমি হইতে বহির্গত হইলেন। এজিদ্ হাসান-বধ শেষ করিয়া হোসেন-বধে প্রবৃত্ত হইলেন! আমরাও এই উপযুক্ত অবসরে দামেস্ক নগর পরিত্যাগ করিয়া মদিনার অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

ঊনবিংশ প্রবাহ

মারওয়ান্ ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়াছেন। নগরপ্রান্তভাগে যে স্থানে পূর্বে শিবির নির্মাণ করিয়াছিলেন, সেই স্থানে পুনরায় সৈন্যাবাস রচনা করিয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন! কিন্তু যে পরিমাণ সৈন্য দামেস্ক হইতে ক্রমে ক্রমে আসিয়াছে, তাহার সহায়ে হোসেনের তরবারি-সম্মুখে যাইতে কিছুতেই সাহসী হইলেন না। দামেস্ক হইতে আর কোনও সংবাদ আসিতেছে না। জায়েদা এবং মায়মুনাকে সেই নিশীথ সময়ে কয়েকজন প্রহরী সমভিব্যাহারে দামেস্কে পাঠাইয়াছেন, এ পর্যন্ত তাহার আর কোন সংবাদ পাইতেছেন না। তাঁহারা নির্বিঘ্নে পৌঁছিলেন কি-না, তাঁহার অঙ্গীকৃত স্বর্ণমুদ্রা জায়েদা ও মায়মুনা প্রাপ্ত হইয়াছেন কি-না, জায়েদাকে অতিরিক্তরূপে বহুমূল্য কারুকার্যখচিত রত্নময় বসন-ভূষণ প্রদানে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাহা জায়েদা প্রাপ্ত হইয়াছেন কি-না-মনে মনে এই ভাবনা। আর একটি কথা,-জায়েদা পাটরাণী হইয়া এজিদের ক্রোড় শোভা করিতেছেন কি-না তাহাও জানিতে পারিতেছেন না! বিষম ভাবনা। এমরানকে কহিলেন, "ভাই এমরান! তুমি

সৈন্যসামন্তের তত্ত্বাবধারণ কার্যে সর্বদা সতর্ক থাক, আমি ছদ্মবেশে যে সকল সন্ধান, যে সকল গুপ্তবিবরণ নগরের প্রতি ঘরে ঘরে যাইয়া প্রায় প্রতিদিন জানিয়া আসিতেছি, ওত্বে অলীদ আমার সেই কার্য করিবেন৷ আমি কয়েক দিনের জন্য দামেস্কে যাইতেছি৷ যদিও আমার যাইবার উপযুক্ত সময় নয়, কিন্তু কী করি, বাধ্য হইয়া যাইতে হইতেছে৷ তোমরা সাবধান হইয়া সতর্ক থাক৷ কোন বিষয়ে চিন্তা করিয়ো না৷ আমি দামেস্ক হইতে ফিরিয়া আসিয়াই হোসেন-বধে প্রবৃত্ত হইব৷" এই বলিয়া মারওয়ান দামেস্কে যাত্রা করিলেন৷

নিয়মিত সময়ে মারওয়ান্ দামেস্কে যাইয়াই-জায়েদা ও মায়মুনার বিচার শুনিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন৷ কী করিবেন, আর কোন উপায় নাই৷ সময় মত এজিদের সহিত সাক্ষা করিলেন, মদিনার উপস্থিত বিবরণ সমুদয় এজিদের গোচর করিয়া পুনরায় মদিনাগমনের কথা পাড়িলেন৷ প্রধানমন্ত্রী হামান্ যুদ্ধে অমত প্রকাশ করিয়া কয়েক দিন মারওয়ান্কে মদিনা-গমনে ক্ষান্ত রাখিলেন৷

সভামণ্ডপে সকলেই উপস্থিত আছেন৷ মারওয়ানকে সম্বোধন করিয়া এজিদ্ বলিতে লাগিলেন, "মারওয়ান্! আমার আশা-লতার কেবলমাত্র বীজ বপন হইয়াছে; কতকালে যে প্রস্ফুটিত পুষ্প দেখিয়া মনের আনন্দে নয়নের প্রীতি জন্মিবে, তাহা কে বলিতে পারে? এখন বিশ্রামের সময় নয়, আমোদ-আহ্লাদের সময় নয়, নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া থাকারও কার্য নয়৷ অনেক রহিয়াছে, এখনো অনেক অবশিষ্ট আছে৷ একটি নরসিংহকে বধ করা হইয়াছে মাত্র কিন্তু তত্তুল্য আরো একটি সিংহ বর্তমান৷ সিংহশাবকগুলি বড় ভয়ানক! এ সমুদয়কে শেষ করিতে না পারিলে আমার মনের আশা কখনোই পূর্ণ হইবে না৷ এখন আরো ভয়ানক হইয়া উঠিল জ্ঞান করিতে হইবে৷ হোসেনের রোষাগ্নি ও কাসেমের ক্রোধবহ্নি হইতে রক্ষা পাওয়া সহজ কথা নহে৷ আলী আক্বর, আলী আস্গর, আবদুল্লাহ্ আক্বর, জয়নাল আবেদীন ইহারা যদিও শিশু, কিন্তু পিতৃব্য-বিয়োগজনিত দুঃখে কাতর না হইয়াছে এমন মনে করিয়ো না৷ ইহার প্রতিফল অবশ্যই ভুগিতে হইবে৷ তাহারা নিশ্চয়ই বুঝিয়াছে যে, যুদ্ধে পরাস্ত

হইয়া জায়েদার দ্বারা এই সাংঘাতিক কার্য করাইয়াছে। জায়েদা বাঁচিয়া থাকিলেও হাসানবংশের ক্রোধানলের কিঞ্চি অংশ হইতে বাঁচিতে পারিতে, কিন্তু এখন তাহা মনে করিয়ো না। সে ক্রোধানল সম্যক্ প্রকারেই এক্ষণে আমাদের শিরে পড়িয়া আমাদিগকে দগ্ধীভূত করিবে। পূর্ব হইতেই সে আগুন নিবারণের চেষ্টা করা কর্তব্য। তাহারা শোকসন্তপ্ত-হৃদয়ে কয় দিন আর নিরস্ত থাকিবে? মহাবীর কাসেম চিরবৈরী বিনাশ করিতে, পিতার দাদ উদ্ধার করিতে একেবারে জ্বলন্ত অগ্নিমূর্তি হইয়া দাঁড়াইবে। তখন কী আর রা থাকিবে? আর সময় দেওয়া উচিত নহে। যত শীঘ্র হয়, হাসান-হোসেনের বংশ বিনাশে যাত্রা কর। উহাদের একটিও যদি জগতে বাঁচিয়া থাকে, তবে নিশ্চয়ই জানিয়ো এজিদের মস্তক দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে,-তোমাদের সকলের শোণিতেও হাসানপুত্রের তরবারি রঞ্জিত করিয়া পরমায়ু শেষ করিয়াছে। ঐ সকল সিংহশাবককে যুদ্ধে, কৌশলে, ছলে-যে কোন উপায়ে হউক, জগ হইতে অন্তর না করিলে কাহারো অন্তরে আর কোন আশা নাই,-নিশ্চয়ই জানিবে কাহারো নিস্তার নাই!"

এই সকল কথা শুনিয়া প্রধানমন্ত্রী হামান গাত্রোত্থানপূর্বক করজোড়ে বলিতে লাগিলেন, "রাজাজ্ঞা আমার শিরোধার্য! কিন্তু আমার কয়েকটি কথা আছে। অভয়দান করিলে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।"

এজিদ্ বলিলেন, "তোমার কথাতেই তো কয়েক দিন অপেক্ষা করিয়াছি। যদি তুমি আমার এই সকল চিরশত্রু বিনাশের আমা অপেক্ষা আর কোন ভাল উপায় উদ্ভাবন করিতে পার, কিংবা আমার বিবেচনার ত্রুটি, চিন্তার ভুল, যুক্তিতে দোষ-বিবেচনা কর, অবশ্যই বলিতে পার।"

করপুটে হামান বলিলেন, "বাদশা নামদার! অপরাধ মার্জনা হউক। হাসান আপনার মনোবেদনার কারণ-যে হাসান আপনার মনঃকষ্টের মূল, যে হাসান আপনার প্রথম বয়সের প্রণয়সুখ-ভোগের সরল পথের বিষম কন্টক, যে হাসান আপনার নবপ্রণয়ের বাহ্যিক বিরোধের পাত্র, যে হাসান আপনার অন্তরের ভালবাসা প্রস্ফুটিত জয়নাব-কুসুমের

বিধিসঙ্গত অপহারী, যে হাসান আপনার শত্রু,-সে তো এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডে আর নাই! আপনার ব্যথিত হৃদয়ে ব্যথা দিয়া জয়নাব-রত্নলাভকারী সেই হাসান তো আর ইহজগতে নাই! জয়নাবের হৃদয়ের ধন অমূল্যনিধি, সুখপুষ্পের আশালতা, সেই হাসান তো আর বাহ্য জগতে জীবিত নাই! তবে আর কেন? প্রতিশোধের বাকি আছে কি? জয়নাব যেমন আপনার মনে ব্যথা দিয়া হাসানকে পতিত্বে বরণ করিয়া সুখী হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা শতগুণ বেদনা,-তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণ মনোবেদনা এক্ষণে ভোগ করিতেছে। তাহার সুখের তরী বিষাদ-সিন্ধুতে বিনা তুফানে আজ কয়েক দিন হইল ডুবিয়া গিয়াছে। তাহার মনোবাঞ্ছিত-স্বেচ্ছাবরিত পতিধন হইতে সে তো একেবারে বঞ্চিতা হইয়াছে! তবে আর কেন? পূর্বস্বামী হইতে পরিত্যক্তা হইয়া সে যেমন অনাথিনী হইয়াছিল, আপনাকে স্বামীত্বে বরণ না করিয়া আজিও সেই জয়নাব সেইরূপ পথের কাঙালিনী ও পথের ভিখারিণী। বাদশাহ নামদার! জগ কয় দিনের? সুখ কয় মুহূর্তের? একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি-নিরপেভাবে একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি, হাসান কি আপনার শত্রু? হাসান আপনার রাজ্য আক্রমণ করে নাই, আপনার প্রাণবধে অগ্রসর হয় নাই, জয়নাবকে কৌশলে হস্তগত করে নাই, সকলই আপনি জ্ঞাত আছেন। হইতে পারে-একটি ভালবাসা জিনিসের দুইটি গ্রাহক হইলে পরস্পর জাতক্রোধ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু সে ঘটনায় হাসানের অপরাধ কি, সে মীমাংসা স্বয়ং জয়নাবই করিয়াছে। তাহার শাস্তিও হইল। অধিক হইয়াছে। এক্ষণে হোসেনের প্রাণ বধ করা, কি হাসান-পুত্রের প্রাণ হরণ করা মানুষের কার্য নহে। বলুন তো কী অপরাধে তাহাদিগকে বিনাশ করিবেন? এখন পর্যন্তও হোসেনের ভ্রাতৃবিয়োগ শোক অণুমাত্রও হ্রাস হয় নাই। পিতৃহীন হইলেও যে কী মহাকষ্ট, তাহা জগতে কাহারো অবিদিত নাই। কাসেম এত অল্প সময়ে কী তাহা ভুলিয়াছে? আজ পর্যন্ত উদরে অন্ন যায় নাই, চক্ষের জল নিবারণ হয় নাই, হাসনেবানুর অঙ্গ ধূলায় ধূসরিত হইতেছে, জয়নাবের কথা আর বলিব না। মদিনার আবালবৃদ্ধ এমন কি পশু-পক্ষীরাও "হায় হাসান! হায় হাসান!" করিয়া কাঁদিতেছে। বোধ হয়, করাঘাতে কাহারো কাহারো বক্ষ ফাটিয়া শোণিতের ধারা বহিতেছে। তথাচ "হায় হাসান! হায় হাসান!" রবে জগ কাঁদাইতেছে। যে

শুনিতেছে সেই মুখে বলিতেছে, "হায় হাসান!! হায় হাসান!!!" এ অবস্থায় কী আর যুদ্ধসজ্জায় অগ্রসর হইতে আছে? এই ঘটনায় কি আর ভ্রাতৃবিয়োগীর প্রতি তরবারি ধরিতে আছে? এই দুঃখের সময় কি অনাথা-পতিহীনা স্ত্রীগণের প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার করিতে আছে? হায়! হায়! সেই পিতৃহীন-পিতৃব্যহীন বালকদিগের মুখের প্রতি চাহিয়া কি কেহ কাঁদিবে না? এখন তাহারা শোকে-দুঃখে আচ্ছন্ন, অসীম কাতর; এ সময় আর যুদ্ধের প্রয়োজন নাই। শত্রু বিনাশের পর শত্রুপরিবার আপন পরিবার মধ্যে পরিগণিত,-ইহাই রাজনীতি এবং ইহাই রাজপদ্ধতি। এই অকিঞ্চিকর অস্থায়ী জগতের প্রতি অকিঞ্চিরূপে দৃষ্টিপাত করাই কর্তব্য। ঈশ্বরের মহিমা অপার। তিনি বিজন বনে নগর বসাইতেছেন, মনোহর নগরকে বনে পরিণত করিতেছেন, কাহাকেও হাসাইতেছেন, কাহাকেও কাঁদাইতেছেন, কাহাকেও মনের আনন্দে-মনের সুখে রাখিতেছেন, মুহূর্ত সময় অতীতে আবার তদ্বিপরীত করিতেছেন; মাতঙ্গ-মস্তকেও পতঙ্গের দ্বারা পদাঘাত করাইতেছেন। আজ যে অতুল ধনের অধিকারী, কাল সে পথের ভিখারি। সেই-"

এজিদ্ নিস্তব্ধভাবে মনোনিবেশপূর্বক শুনিতেছিলেন। দুষ্ট মারওয়ান, প্রধানমন্ত্রী হামানের কথা শেষ হইতে-না-হইতেই রোষভরে বলিতে লাগিলেন, "বৃদ্ধ হইলে মানুষের যে বুদ্ধিশক্তির বৈলক্ষণ্য ঘটে, তাহা সত্য। ইহাতে যে একটু সন্দেহ ছিল, তাহা আজ আমাদের প্রধান উজিরের কথায় একেবারে দূর হইল। মহাশয়! ধন্য আপনার বক্তৃতা! ধন্য আপনার বুদ্ধি! ধন্য আপনার ভবিষ্য চিন্তা! ধন্য আপনার রাজনীতিজ্ঞতা! ধন্য আপনার বহুদর্শিতা! ধন্য আপনার প্রধানমন্ত্রীত্ব! এক ভ্রাতা শত্রু, দ্বিতীয় ভ্রাতা মিত্র-ইহা কি কখনো সম্ভবে? কোন্ পাগলে একথা না বুঝিবে? সময় পাইলেই তাহারা প্রতিশোধ লইবে। এক্ষণে তাহারা কেবল সময় আর অবসর খুঁজিতেছে। যে জয়নাবের সুখের তরী ডুবিয়া গিয়াছে বলিতেছেন, সে জয়নাবকেও কম মনে করিবেন না। তাহাদের কাহাকেও জানিতে বাকি নাই। জায়েদা আমাদের পরামর্শ মত হাসানকে বিষপান করাইয়াছে। এই উপযুক্ত সময়ে যদি উহাদিগকে একেবারে সমূলে বিনাশ না করা যায়, তবে কোন-না-কোন সময়ে

আমাদিগকে ইহার ফল ভুগিতেই হইবে৷ আমি দর্প করিয়া বলিতে পারি, না হয় আপনি স্মরণার্থে লিখিয়া রাখুন, হাসানের বিষপানজনিত তাহাদের রোষানল শত শিখায় প্রজ্বলিত হইয়া একে একে দামেস্কের সকল লোককে ভস্মীভূত করিবে৷ কার সাধ্য হোসেনের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায়? কার সাধ্য হোসেনের তরবারি হইতে প্রাণ রক্ষা করে? এ সিংহাসন কাসেমের উপবেশনের জন্য পরিষ্কৃত থাকিবে৷ আমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, আপনার বুদ্ধির অনেক ভ্রম হইয়াছে৷ পরকাল ভাবিয়া, জগতের অস্থায়িত্ব বুঝিয়া, নশ্বর মানবশরীর চিরস্থায়ী নহে স্মরণ করিয়া, রাজ্যবিস্তারে বিমুখ, শত্রু দমনে শৈথিল্য, পাপভয়ে রাজকার্যে ক্ষান্ত হওয়া নিতান্তই মূঢ়তার কার্য৷ আপনি যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া হাসানের বংশের সহিত সখ্যভাব সৃজন করিতে অনুরোধ করিতেছেন; আমি বলিতেছি, তিলার্ধকাল বিলম্ব না করিয়া পুনরায় যুদ্ধযাত্রা করাই উচিত এবং কর্তব্য৷ এমন শুভ অবসর আর পাওয়া যাইবে না৷ শত্রুকে সময় দিলেই দশগুণ বলদান করা হয়, এ কথা কি আপনি ভুলিয়াছেন? যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া মদিনা হইতে সৈন্যগণ উঠাইয়া আনিলে কত পরিমাণ বলের লাঘব হইবে? নায়কবিহীন হইলে তাহার পশ্চাদ্বর্তী নেতৃদলকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতে কতক্ষণ লাগে?"

হামানকে সম্বোধন করিয়া এজিদ্ বলিলেন, "মারওয়ান্ যাহা বলিতেছেন, তাহাই যুক্তিসঙ্গত৷ আমি আপনার মতের পোষকতা করিতে পারিলাম না৷ যত বিলম্ব, ততই অমঙ্গল৷ এই যুদ্ধের প্রধান নায়কই মারওয়ান্৷ মারওয়ানের মতই আমার মনোনীত৷ শত্রুকে অবসর দিতে নাই, দিবও না৷ মারওয়ান্! আর কোন কথাই নাই৷ যে পরিমাণ সৈন্য মদিনায় প্রেরিত হইয়াছে, আমি তাহার আর চতুর্গুণ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া এখানে রাখিয়াছি৷ যাহা তোমার ইচ্ছা হয়, লইয়া মদিনায় যাত্রা কর; আমি এক্ষণে হোসেনের মস্তক দেখিতেই উৎসুক রহিলাম৷ প্রথমে হোসেনের মস্তক দামেস্কে পাঠাইবে, তাহার পর জয়নাবও হাসনেবানু প্রভৃতি সমুদয়কে কারাবদ্ধ করিয়া আনিবে৷" এই আজ্ঞা করিয়াই পাষাণে গঠিত নির্দয়হৃদয় এজিদ্ সভা ভঙ্গ করিলেন৷ মারওয়ান্ রাজাজ্ঞা প্রতিপালনে তৎপর হইয়া এজিদের নিকট হইতে বিদায় লইলেন৷

বিংশ প্রবাহ

মারওয়ান্ সৈন্যসহ মদিনায় আসিলেন। অলীদের মুখে সবিস্তারে সমস্ত শুনিলেন। হাসানের মৃত্যুর পর হোসেন অহোরাত্র 'রওজা শরিফে' বাস করিতেছেন, এ কথায় মারওয়ান্ অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। পবিত্র রওজায় যুদ্ধ করা নিতান্তই দুর্বুদ্ধিতার কার্য; সে ক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে সাহসও হয় না! যুদ্ধে আহ্বান করিলেও হোসেন কখনোই তাঁহার মাতামহের সমাধিস্থান পরিত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইবেন না। মারওয়ান্, বিশেষরূপে এই সকল কথার আন্দোলন করিয়া অলীদকে জিজ্ঞাসা করিরেন, "ভাই! ইহার উপায় কী? আমার প্রথম কার্য হোসেনের মুণ্ড লাভ, শেষ কার্য তাহার পরিবারকে বন্দি করিয়া দামেস্কনগরে প্রেরণ। হোসেনের মস্তক হস্তগত না হইলে শেষ কার্যটি সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব।" কী উপায়ে হোসেনকে মোহাম্মদের সমাধিক্ষেত্র হইতে স্থানান্তরিত করিবেন, এই চিন্তাই এখন তাহাদের প্রবল হইয়া উঠিল। অনেক চেষ্টা-অনেক কৌশল করিয়াও কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। একদিন মারওয়ান্ ওত্বে অলীদের সহিত পরামর্শ করিয়া উভয়েই ছদ্মবেশে নিশীথ সময়ে পবিত্র রওজায় উপস্থিত হইলেন। রওজামধ্যে প্রবেশের পথ নাই, বিশেষ অনুমতিও নাই। রওজার চতুষ্পার্শ্বস্থ সীমানির্দিষ্ট রেল ধরিয়া হোসেনের তত্ব ও সন্ধান জানিতে লাগিলেন। হোসেন ঈশ্বরের উপাসনায় মনোনিবেশ করিয়াছেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত উভয়ে ঐ অবস্থাতেই রেল ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। উপাসনা সমাধা হইবামাত্রই ছদ্মবেশী মারওয়ান বলিলেন, "হজরত! আমরা কোন বিশেষ গোপনীয় তত্ব জানাইতে এই নিশীথ সময়ে আপনার নিকট আসিয়াছি।"

হোসেন বলিলেন, "হে হিতার্থী ভ্রাতৃদ্বয়! কী গোপনীয় তত্ব দিতে আসিয়াছেন? জগতে ঈশ্বরের উপাসনা ভিন্ন আমার আর কোন আশা নাই! গোপন তত্বে আমার কী ফল হইবে?-আমি কোন গোপনীয় তত্ব জানিতে চাহি না।"

ছদ্মবেশী মারওয়ান্ বলিলেন, "আপনি সেই তত্ত্বের সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিলে অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন যে, তাহাতে আপনার কোনরূপ ফল আছে কি না।"

হোসেন আগন্তুকের কিঞ্চি নিকটে যাইয়া বলিলেন, "ভ্রাতৃগণ! নিশীথ সময়ে অপরিচিত আগন্তুকের রওজার মধ্যে আসিবার নিয়ম নাই। আপনারা বাহিরে থাকিয়াই যাহা বলিতে ইচ্ছা হয় বলুন।"

ছদ্মবেশী মারওয়ান্ বলিলেন, "আপনি আমাদের কথায় যদি প্রত্যয় করেন, তবে মনের কথা অকপটে বলি। আপনার দুঃখে দুঃখিত হইয়াই আমরা ছদ্মবেশে নিশীথ সময়ে আপনার নিকট আসিয়াছি। এজিদের চক্রান্তে জায়েদা যে কৌশলে ইমাম হাসানকে বিষপান করাইয়াছে, তাহার কোন অংশই আমাদের অজানা নাই! কি করি-কর্ণে শুনি, মনের দুঃখ মনেই রাখি, গোপনে চক্ষের জল অতি কষ্টে সম্বরণ করি। হাসানের বিষপানের বিষয় মনে হইলে হৃদয় ফাটিয়া যায়; চতুর্দিকে অন্ধকার বোধ হয়! এজিদের হৃদয় লৌহনির্মিত, দেহ পাষাণে গঠিত; তাহার দুঃখ কি! আমরা তাহার চাকর; কিন্তু নূরনবী মোহাম্মদের শিষ্য, আপনার ভক্ত। এই যে নিশীথ সময়ে শিবির হইতে বাহির হইয়া এত দূরে আসিয়াছি, কোন স্বার্থ নাই, কোন প্রকার লাভের আশা করিয়াও আসি নাই,-এজিদ্ কৌশলে আপনার প্রাণ লইবে,-ইহা আমাদের নিতান্তই অসহ্য। আমাদের অন্তরে ব্যথা লাগিয়াছে বলিয়াই আসিয়াছি।"

হোসেন বলিলেন, "প্রাণের একাংশ,-বিশেষ অগ্রগণ্য অংশ-সেই ভ্রাতাকে তাঁহার স্ত্রীর সহায়তায় এজিদ্ বিষপান করাইয়া কৌশলে মারিয়াছে, ইহার উপরে আর কী কষ্ট আছে? আমার প্রাণের জন্য আমি ভয় করি না।"

মারওয়ান্ বলিলেন, "প্রাণের জন্য আপনার যে কিছুমাত্র ভয় নাই তাহা স্বীকার করি। কিন্তু আপনার প্রাণ গেলে আপনার পুত্র-কন্যা-পরিবার, হাসানের পরিবার, ইহাদের কি অবস্থা ঘটিবে, ভাবুন দেখি। দুরন্ত জালেম এজিদ্! সে যে কি করিবে, তাহার মনই তাহা

জানে; আর বেশি বিলম্ব করিতে পারি না। আমরা যে গুপ্তভাবে এখানে আসিয়াছি, এ কথার অণুমাত্র প্রকাশ হইলে আমাদের দেহ ও মস্তক কখনোই একত্র থাকিবে না। আজ ওত্‌বে অলীদ্ ও মারওয়ান্ এজিদের আদেশ মত এই স্থির করিয়াছে যে, এই রাত্রেই রওজা মোবারক ঘেরাও করিয়া আপনাকে আক্রমণ করিবে। পরিশেষে হাসনেবানু, জয়নাব এবং আপনার পরিবারস্থ যাবতীয় স্ত্রীলোককে বদ্ধ করিয়া বিশেষ অপমানের সহিত এজিদ্ সমীপে লইয়া যাইবে।"

হোসেন একটু রোষপরবশ হইয়া বলিতে লাগিলেন, "প্রকাশ্যভাবে যদি আমার মস্তক লইতে আসে, আমি তাহাতে দুঃখিত নই। আর ভাই, ইহাও নিশ্চয় জানিয়ো, আমি বাঁচিয়া থাকিতে ঈশ্বর কৃপায় আমার পরিবারের প্রতি-মদিনার কোন-একটি স্ত্রীলোকের প্রতি, কোন নরাধম নারকী জবারণে হস্তপে করিতে পারিবে না।"

মারওয়ান্ বলিলেন, "সেই জন্যই তো আপনার শিরচ্ছেদন অগ্রে করাই এজিদের একান্ত ইচ্ছা। এজিদ্‌ও জানিয়াছেন যে, হোসেন বাঁচিয়া থাকিতে আর কিছুই হইবে না। আপনি আজ রাত্রিতে এখানে কখনোই থাকিবেন না। হাজার বলবান্ ও হাজার ক্ষমতাবান হইলেও পাঁচ হাজার যোদ্ধার মধ্যে একা এক প্রাণী কি করিবেন? আপনি এখনই এ স্থান হইতে পলায়ন করুন। মারওয়ান গুপ্ত সন্ধানে জানিয়াছে যে, আপনি এই রওজা ছাড়িয়া কোনখানেই গমন করেন না; রাত্রিও শেষ হইয়া আসিল, আর অধিক বিলম্ব নাই। বোধ হয়, এখনই তাহার আক্রমণ করিবে। দেখুন! আপনার পরিবারগণের কুল, মান, মর্যাদা, শেষে প্রাণ পর্যন্ত এক আপনার প্রাণের প্রতি নির্ভর করিতেছে; আর বিলম্ব করিবেন না, আমরাও শিবিরাভিমুখে যাই; আপনি অন্য কোন স্থানে যাইয়া আজিকার যামিনীর মত প্রাণ রক্ষা করুন।"

হাস্য করিয়া হোসেন বলিলেন, "ভাই রে, ব্যস্ত হইও না। তোমাদের এই ব্যবহারে আমি বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম। তোমরা এজিদের পক্ষীয় লোক হইয়া গোপনে আমাকে এমন গুপ্ত

সন্ধান জানাইলে-আশীর্বাদ করি, পরকালে ঈশ্বর তোমাদিগকে জান্নাতবাসী করিবেন। ভাই রে! আমার মরণের জন্য তোমরা ব্যাকুল হইও না, কোন চিন্তা করিয়ো না। আমি মাতামহের নিকট শুনিয়াছি, দামেস্ক কিংবা মদিনায় কখনোই কাহারো হস্তে আমার মৃত্যু হইবে না। আমার মৃত্যুর নির্দিষ্ট স্থান 'দাস্ত কার্‌বালা' নামক মহাপ্রান্তর। যতদিন পর্যন্ত সর্বপ্রলয়কর্তা, সর্বেশ্বর আমাকে কারবালা প্রান্তরে না লইয়া যাইবেন, ততদিন পর্যন্ত কিছুতেই কোন প্রকারে আমার মরণ নাই।"

মারওয়ান্ বলিলেন, "দেখুন! আপনার সৈন্যবল, অর্থবল কিছুই নাই; এজিদের সৈন্যগণ আজ নিশ্চয়ই আপনাকে আক্রমণ করিবে। আপনি প্রাণে মারা না যাইতে পারেন, কিন্তু বন্দিভূত হইতেই হইবে, তাহাতে আর কথাটি নাই। দাস্ত কার্‌বালা না হইলে আপনার প্রাণবিয়োগ হইবে না, এ কথা সত্য-কিন্তু এজিদের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবেন কিসে? আপনার জন্যই মদিনা আক্রান্ত হইবে;-মদিনাবাসীরা নানাপ্রকার ক্লেশ পাইবে। যদিও তাহারা এজিদের সৈন্যগণকে একবার শেষ করিয়াছে, কিন্তু মারওয়ান্ এবারে চতুর্গুণ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া দামেস্ক হইতে আসিয়াছে। আপনি যদি শত্রুহস্তে বন্দি হন, তাহা হইলে জীয়ন্তে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। আর বেশি বিলম্ব করিতে পারি না, প্রণাম করি। আমরা চলিলাম। যাহা ভাল বিবেচনা হয় করিবেন।"

লোকেরা চলিয়া গেল। হোসেন ভাবিতে লাগিল, "হায়! আজ পর্যন্ত এজিদের ক্রোধের উপশম হয় নাই। সকলই ঈশ্বরের লীলা! ঐ লোকটি যথার্থই 'মোমেন'। এই নিশীথ সময়ে প্রাণের মায়া বিসর্জন করিয়া পরহিতসাধনে নিঃস্বার্থভাবে এতদূর আসিয়াছে! কি আশ্চর্য! বাস্তবিক ইহারাই যথার্থ পরহিতৈষী। মারওয়ান্ পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মদিনায় আসিয়াছে। কি করি,-আমি যুদ্ধসজ্জা করিয়া শত্রুর সম্মুখীন হইলে মদিনাবাসীরা কখনোই নিরস্ত্র-নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবে না, নিশ্চয়ই প্রাণ পর্যন্ত পণ করিয়া আমার পশ্চাদ্বর্তী হইবে। এখনও তাহারা শোকবস্ত্র পরিত্যাগ করে নাই; দিবারাত্র হাসানবিরহে দুঃখিত মনে-

হা-হুতাশে সময় অতিবাহিত করিতেছে। এ সময় তাহাদের হৃদয় পূর্ব্ব সমুৎসাহিত, জন্মভূমি রক্ষার সুদৃঢ়পণে শত্রুনিধনে সমুৎসুখ ও সমুত্তেজিত হইবে কি না, সন্দেহ হইতেছে। কারণ দুঃখিত মনে, দগ্ধীভূত হৃদয়ে কোন প্রকার আশাই স্থায়িরূপে বদ্ধমূল হয় না। যতদিন তাহারা জীবিত থাকিবে, ততদিন ইমামের শোক ভুলিতে পারিবে না। এই শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সেই স্নেহকাতর ভ্রাতৃগণকে কী বলিয়া আমি আবার এই মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইব। কিছুদিন যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হওয়াই আমার উচিত। আমি যদি কিছুদিনের জন্য মদিনা পরিত্যাগ করি, তাহাতে তি কি? এজিদের সৈন্য আজ রাত্রিতেই রওজা আক্রমণ করিয়া আমার প্রাণবধ করিবে, ইহা বিশ্বাস্যই নহে। এখানে কাহারো দৌরাত্ম্য করিবার মতা নাই। শুধু এজিদের সৈন্য কেন, জগতের সমস্ত সৈন্য একত্রিত হইয়া আক্রমণ করিলেও এই পবিত্র রওজায় আমার ভয়ের কোন কারণ নাই, তথাপি কিছুদিনের জন্য স্থান পরিত্যাগ করাই সুপরামর্শ। আপাততঃ কুফা নগরে যাইয়া আবদুল্লাহ্ জেয়াদের নিকট কিছুদিন অবস্থিতি করি। জেয়াদ আমার পরম বন্ধু। আরব দেশে যদি প্রকৃত বন্ধু কেহ থাকে, তবে সেই কুফার অধীশ্বর প্রিয়তম বন্ধুবৎসল জেয়াদ্। যদি মদিনা পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া উচিত বিবেচনা হয়, তবে সপরিবারে কিছু দিনের জন্য কুফা নগরে গমন করাই যুক্তিসিদ্ধ। আজ রাত্রির ও-কথা কিছুই নহে। এইরূপ ভাবিয়া হোসেন পুনরায় ঈশ্বরোপাসনায় মনোনিবেশ করিলেন।

ওত্বে অলীদ ও মারওয়ান্ উভয়ে শিবিরে গিয়া বেশ পরিত্যাগপূর্বক নির্জন স্থানে বসিয়া পরামর্শ করিতেছেন। অনেক কথার পর মারওয়ান বলিলেন, "মোহাম্মদের রওজায় হোসেনের মৃত্যু নাই! আমরা এমন কোন উপায় নির্ণয় করিতে পারি নাই যে, তাহাতে নিশ্চয়ই হোসেন রওজা হইতে বহির্গত হইয়া মদিনা পরিত্যাগ করেন। এইটি যাহা হইল ইহাও মন্দ নহে। ইহার উপরে আরো একটি ছিল, কিন্তু সে আমাদের ক্ষমতার অতীত। তৎবিস্তারিত কাসেদ গিয়া মুখে প্রকাশ করিবে, তাহার উপায়-কৌশল, সমুদয়ই কাসেদকে বিশেষরূপে বলিয়া দিলাম।"

ওত্‌বে অলীদ বলিলেন, "আর বেশি বিস্তারের আবশ্যক নাই, শীঘ্র পত্র লিখিয়া কাসেদকে প্রেরণ করা কর্তব্য।"

লিখিবার উপকরণ লইয়া মারওয়ান্ লিখিতে বসিলেন। কিছুণ পরেই ওত্‌বে অলীদ আবার বলিলেন, "একটি কথাও যেন ভুল না হয়, অথচ গোপন থাকে এইভাবে পত্র লেখা উচিত।" মারওয়ান পত্র লিখিতে লাগিলেন। একজন সৈনিক পুরুষের সহিত একজন কাসেদ্ আসিয়া যথারীতি নমস্কার করিয়া করজোড়ে দণ্ডায়মান হইল। মারওয়ান পত্র রাখিয়া কাসেদ্কে লইয়া গোপনে তাহাকে সমস্ত কথা বলিলেন। অনন্তর মারওয়ান পত্রখানি শেষ করিতে বসিলেন। কাসেদ্ করজোড়ে বলিতে লাগিল, "ঈশ্বরপ্রসাদে এই কার্য করিতে করিতেই আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, যাহা বলিবেন অবিকল তাহাই বলিব। কেবল শহরের নামটি আর একবার ভাল করিয়া বলুন, কুফার কী কুফা।"

মারওয়ান রীতিমত পত্র লেখা শেষ করিয়া কাসেদের হস্তে দিয়া বলিলেন, "কুফা।" কাসেদ্ বিদায় হইল। মারওয়ান এবং অলীদ উভয়ে নির্দিষ্ট স্থানে গমন করিলেন।

একবিংশ প্রবাহ

কয়েকদিন দিনরাত্রি অবিশ্রান্ত পর্যটন করিয়া-মারওয়ান প্রেরিত মদিনার কাসেদ্ দামেস্ক নগরে পৌঁছিল। এজিদ যথাসময়ে কাসেদের আগমন সংবাদ পাইলেন।-সভাভঙ্গ করিয়া কাসেদ্কে নির্জনে লইয়া গিয়া সমুদয় অবস্থা শুনিলেন। মারওয়ান-পত্রপাঠে অনেক চিন্তা করিয়া মহারাজ এজিদ্ তৎক্ষণাৎ আবদুল্লাহ্ জেয়াদকে একখানি পত্র লিখিলেন। পত্র শেষ করিয়া কোষাধ্যক্ষের প্রতি আদেশ করিলেন, "তিন লক্ষ টাকা, তদুপযোগী বাহন এবং ঐ অর্থ রাক্ষার্থে কয়েকজন সৈনিকপুরুষ,-এই কাসেদের সমভিব্যাহারে দিয়া এখনই কুফা নগরে পাঠাইতে প্রধান কার্যকারককে আমার আদেশ জানাও।" কোষাধ্যকে এই কথা বলিয়া

কাসেদ্‌কে বলিলেন, "তুমি এই উপস্থিত কার্যের উপযুক্ত পাত্র। কুফা নগরে যাইয়া আবদুল্লাহ্‌ জেয়াদকে বলিয়ো, আশার অতিরিক্ত ফল পাইবে, কুফা রাজ্য একচ্ছত্ররূপে আপনারই অধিকৃত হইবে। দামেস্করাজ আর কখনোই আপনাকে অধীন রাজা বলিয়া মনে করিবেন না, মিত্ররাজ্য বলিয়াই আখ্যা হইবে। সেই মিত্র ব্যবহার জগতে চন্দ্র-সূর্য থাকা পর্যন্ত সমভাবে থাকিবে।" দামেস্কাধাপতি এই বলিয়া কাসেদ্‌কে বিদায় করিলেন। কাসেদ্‌ অভিবাদন করিয়া বিদায় হইল।

সৈন্যচতুষ্টয়ের সহিত দামেস্কের দূত বিংশতি দিবসে কুফা নগরে উপস্থিত হইল। দামেস্ক হইতে বিস্তর অর্থ সহিত সৈন্যসহচর রাজদূত রাজসমীপে উপস্থিত হইবে, এই কথা আবদুল্লাহ্‌ জেয়াদের কর্ণগোচর হইলে, তিনি একেবারে আশ্চর্যান্বিত হইলেন। "মহারাজ এজিদ্‌ আমার নিকট অর্থ, সৈন্য এবং কাসেদ্‌ পাঠাইবেন-এ কী কথা!" আবদুল্লাহ্‌ জেয়াদ এই ভাবনা ভাবিতেছেন, এমন সময়ে প্রতিহারী আসিয়া করজোড়ে নিবেদন করিল, "দামেস্ক হইতে কয়েকটি লোক কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছে, কাহারো নিকট কিছু বলে না; তাহাদের ইচ্ছা যে, একেবারে মহারাজের সহিত সাক্ষা করে। দামেস্করাজের প্রেরিত, কী কাহার প্রেরিত, তাহা তাহারা কিছুই বলিল না। আমরা যাহাকে কাসেদ্‌ বলিয়া অনুমান করিতেছি, সে লোকটি বিশেষ চতুর এবং বিশেষ বিচক্ষণ। তাহার সঙ্গে তাহার রক্ষকস্বরূপ কয়েকজন প্রহরী এবং প্রচুর অর্থ আছে।"

আবদুল্লাহ্‌ জেয়াদ বলিলেন, "তাহাদিগকে সমুচিত আদর করিয়া উপযুক্ত স্থানে স্থান দাও। সময় মত আহ্বান করিয়া তাহাদের কথা শুনিব।"

যথাযোগ্য প্রণিপাত করিয়া প্রতিহারী বিদায় লইল। আবদুল্লাহ্‌ জেয়াদ্‌ অনেক চিন্তা করিলেন। কী কারণ, কে পাঠাইল, কী উদ্দেশ্যে আসিয়াছে, নানা প্রকার দুশ্চিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন। নিতান্ত উসুক হইয়া অনতিবিলম্বেই সেই কাসেদ্‌কে আহ্বান

করিলেন। কাসেদ্ আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া এজিদের আদেশমত সমুদয় বৃত্তান্ত একে একে বর্ণনা করিল। এজিদের স্বহস্তলিখিত পত্রখানিও জেয়াদের সম্মুখে রাখিয়া দিল। আবদুল্লাহ্ জেয়াদ সহস্রবার পত্র চুম্বন করিয়া ভক্তির সহিত পাঠ করিলেন। কাসেদেক বলিলেন, "তোমরা নির্দিষ্ট স্থানে গিয়া বিশ্রাম কর, অদ্যই বিদায় করিব।"

দ্বাবিংশ প্রবাহ

প্রণয়, স্ত্রী, রাজ্য, ধন-এই কয়েকটি বিষয়ের লোভ বড় ভয়ানক। এই লোভে লোকের ধর্ম, পুণ্য, সাধুতা, পবিত্রতা সমস্তই একেবারে সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অতিকষ্টে উপার্জিত বন্ধুরত্নটাও ঐ লোভে অনেকেই অনায়াসে বিসর্জন দেয়। মানুষ ঐ লোভে অনায়াসেই যথেচ্ছ ব্যবহারে অগ্রসর হইতে পারে। এজিদ্ দামেস্কের রাজা, কুফা তাঁহার অধীন রাজ্য। হোসেনের সহিত আবদুল্লাহ্ জেয়াদের কেবলমাত্র বন্ধুত্বভাব সম্বন্ধ। উপরিউক্ত চারি প্রকার লোভের নিকট বন্ধুত্বভাব সর্বত্র অকৃত্রিমভাবে থাকা অসম্ভব। অধিকন্তু আবদুল্লাহ্ জেয়াদের নিকটে তাহার আশা করাও যাইতে পারে না। কারণ, আবদুল্লাহ্ জেয়াদ মূর্খ ও অর্থলোভী; মূর্খের প্রণয়ে বিশ্বাস নাই, কার্যেও বিশ্বাস নাই, লোভীও তদ্রূপ।

আবদুল্লাহ্ জেয়াদ সেই রাত্রিতেই দামেস্কের দূতকে বিদায় করিলেন। শয়নগৃহে শয্যার এক পার্শ্বে বসিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "হোসেনের প্রণয়ে লাভ কী? শুধু মুখের প্রণয়ে কী হইতে পারে?"-এইরূপ অনেক আন্দোলন করিয়া নিদ্রাভিভূত হইলেন।

প্রধান অমাত্য, সভাসদ এবং রাজসংক্রান্ত কর্মচারিগণ কেহই এই নিগূঢ় তত্ত্বের কারণ কিছুই জানিতে পারিলেন না। কি উদ্দেশ্যে উহারা দামেস্ক হইতে আসিয়াছিল, এক দিবস অতীত না হইতেই কেনই-বা ফিরিয়া গেল, এই বিষয় লইয়া সকলে নানা প্রকার আন্দোলন করিতে লাগিলেন।

রজনী প্রভাত হইল। আবদুল্লাহ্ জেয়াদ্ রাজসিংহাসনে উপবেশন করিয়া সমুদয় সভাসদ্গণকে সম্বোধনপূর্বক বলিতে লাগিলেন, "গত রজনীতে আমি হজরত মোহাম্মদ মোস্তফাকে স্বপ্নে দেখিয়াছি। হস্তে কৃষ্ণবর্ণ আশা (যষ্টি), শিরে শুভ্রবর্ণ উষ্ণীষ, অঙ্গে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন শুভ্র পিরহান। আমার শিয়রে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, 'আবদুল্লাহ্ জেয়াদ্! তোমাকে একটি কার্য করিতে হইবে।' আমি স্বপ্নযোগে সেই পবিত্র পদ চুম্বন করিয়া জোড়হস্তে দণ্ডায়মান থাকিলাম। নূরনবী দুঃখিত স্বরে বলিতে লাগিলেন, 'হোসেন ভ্রাতৃহীন হইয়া আমার সমাধিক্ষেত্রে পড়িয়া, নিঃসহায়রূপে দিবারাত্রি ক্রন্দন করিতেছে। তুমি তাহার পক্ষ অবলম্বন কর। তোমার সাধ্যানুসারে তাহার সহায়তা কর। সৈন্য-সামন্ত-ধন দ্বারা হোসেনের উপকার কর।' এই কথা বলিয়াই পবিত্র মূর্তি অন্তর্হিত হইল। আমারও নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল; স্বর্গীয় সৌরভে সমুদয় ঘর আমোদিত হইয়া উঠিল। সেই সময় আমার মনে যে অনুপম আনন্দ ও ভক্তিভাব উদয় হইল, তাহা এক্ষণে মুখে প্রকাশ করিতে সাধ্য হইতেছে না। আর নিদ্রাও হইল না। তখনই কায়মনে হজরত ইমাম হোসেনের প্রতি আত্ম-সমর্পণ করিলাম। এই রাজ্য, এই সৈন্য-সামন্ত, এই ভাণ্ডারস্থ ধনরত্ন মণিমুক্তা সকলই হোসেনের। এই সিংহাসন আজ হইতে হোসেনের নামে উ�সর্গ করিয়া তাঁহাকে ইহার যথার্থ অধিকারী করিলাম। আপনারা আজ হইতে মহামান্য ইমাম হোসেনের অধীন হইলেন। আজ হইতে আমি তাঁহার আজ্ঞাবহ কিঙ্করমাত্র থাকিলাম। অমাত্যগণ! এখনই আপনারা নগরের ঘরে ঘরে ঘোষণা করিয়া দেন যে, এ রাজ্য আজ হইতে ইমাম হোসেনের অধিকৃত হইল। আবদুল্লাহ্ জেয়াদ্ তাঁহার আজ্ঞাবহ হইয়া রহিলেন। অধীন রাজা, রাজপ্রতিনিধি, রাজসংস্রবী, যিনি যেখানে আছেন কিংবা রাজ্যশাসন করিতেছেন, অদ্যই তাঁহাদের নিকট এই শুভ সংবাদ অগৌণে জ্ঞাপন করা হউক। আর অদ্যই আমার স্বপ্ন বিবরণসহ রাজ্যপরিত্যাগ-সংবাদ ইমাম হোসেনের গোচরকরণ জন্য মদিনায় কাসেদ্ প্রেরণ করা হউক। রাজাবিহনে রাজ্য শাসন হওয়া নিতান্তই কঠিন, রাজসিংহাসন শূন্য থাকাও

অযৌক্তিক। যত শীঘ্র হয়, ইমাম হোসেন কুফা নগরে আসিয়া রাজপাট অধিকার এবং আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। ইহাও জানাইও,-যতদিন ইমাম হোসেন এই রাজসিংহাসনে উপবেশন না করিতেছেন, ততদিন প্রধান উজির রাজকার্য পরিচালনা করিবেন। আমার সহিত রাজ্যের আর কোন সংস্রব রহিল না।"

প্রধান উজির নতশিরে রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করিলেন। সকলেই হোসেনের নামে রাজভক্তির পরিচয় দিয়া শত শত আশীর্বচন প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। আবদুল্লাহ্ জেয়াদকেও একবাক্যে সকলে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, "এমন সাহসী ধর্মপরায়ণ সরলহৃদয় ধার্মিক জগতে কেহ হয় নাই, হইবেও না। এমন পুণ্যকার্য এ পর্যন্ত কেহ কোন দেশেই করে নাই। এ কথাও সত্য যে, যিনি ইহকাল-পরকালের রাজা, প্রাণ দিয়া তাঁহার উপকার করা সকল মুসলমানের কর্তব্য। এজিদের চক্রান্তে ভ্রাতৃহারা-রাজ্যহারা-একে একে সর্বহারা হইবার উপক্রম হইয়াছেন, এ সময় যিনি যত প্রকারে ইমামের উপকার করিবেন, ঈশ্বর তাঁহাকে তাহার কোটি কোটি গুণে পুণ্যময় করিয়া পরকালের প্রধান স্বর্গে তাঁহার স্থান নির্ণয় করিয়া রাখিবেন। আপনি সৈন্যসামন্ত সহিত রাজ্য-ধন ইমামকে দান করিলেন; আমরা চিরকাল হইতে তাঁহার আজ্ঞানুবর্তী দাসানুদাস আছি। আজ হইতে জীবন, ধন, সমস্তই হোসেনের নামে উৎসর্গ করিলাম।"

প্রধান উজির রাজাজ্ঞানুসারে সমুদয় স্থানে ঘোষণা করিয়া দিলেন। আবদুল্লাহ্ জেয়াদের স্বপ্নবৃত্তান্তও বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিয়া, রাজ্যদান-সংক্রান্ত সমস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া হোসেন-সমীপে কাসেদ্ প্রেরণ করিলেন।

ক্রমে সর্বত্র প্রকাশ হইল যে, কুফাধিপতি আবদুল্লাহ্ জেয়াদ তাঁহার সমুদয় রাজ্য হোসেনকে অর্পণ করিয়াছেন। এজিদের স্বপক্ষীয়েরা ব্যতীত সকলেই একবাক্যে আবদুল্লাহ্ জেয়াদকে

শত শত ধন্যবাদ দিয়া ঈশ্বর সমীপে হোসেনের দীর্ঘায়ু ও সর্বমঙ্গল প্রার্থনা করিলেন। ক্রমে মদিনা পর্যন্ত এই সংবাদ রটিয়া গেল।

হোসেন পূর্ব হইতেই মদিনা পরিত্যাগ করিয়া কুফা নগরে আসিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু আবদুল্লাহ্ জেয়াদ কর্তৃক আদৃত না হইয়া তথায় গমন করা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করেন নাই। লোকমুখে জেয়াদের বদান্যতা, বিপদ সময়ে সাহায্য এবং অকাতরে রাজ্য পর্যন্ত দানের বিষয় শুনিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া কৃতজ্ঞতার সহিত উপাসনা করিলেন। কিন্তু জেয়াদ্-প্রেরিত নিশ্চয় সংবাদ না পাইয়া অন্য কাহাকেও কিছু বলিলেন না।

মারওয়ান আজ মদিনা আক্রমণ করিবে, রওজা আক্রমণ করিবে, হোসেনের প্রাণ হরণ করিবে, সর্বসাধারণের মুখে এই সকল কথার আন্দোলন। মদিনাবাসীরা সকলেই হোসেনের পক্ষ হইয়া এজিদের সৈন্যের সহিত যথাসাধ্য যুদ্ধ করিবে, প্রাণ থাকিতে হোসেনের পরিজনদিগকে বন্দি করিয়া দামেস্কে লইয়া যাইতে দিবে না, এ কথাও রাষ্ট্র হইয়াছে। 'আজ যুদ্ধ হয়, কাল যুদ্ধ হয়'-এই কথারই তর্কবিতর্ক। এজিদের সৈন্যগণ মদিনা আক্রমণ না করিলে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে কি-না এই বিষয় লইয়াই-এই চিন্তাতেই ইমাম-বংশের চিরহিতৈষী মদিনাবাসীরা সকলে মহা ব্যতিব্যস্ত। দিবরাত্রে কাহারই যেন আহার-নিদ্রা নাই।

কয়েকদিন যায়, শেষে সাব্যস্ত হইল যে, শত্রুগণ নগরের প্রান্তভাগে-প্রান্তরের শেষ সীমায় শিবির নির্মাণ করিয়া যে প্রকার শান্তভাবে রহিয়াছে, তাহাতে আশু বিরোধের সম্ভাবনা কী? কোন বিষয়ে অনৈক্য, কোন বিষয়ে বাধা কিংবা কোন কথার প্রসঙ্গে অযথা উত্তর না করিলে কী প্রকারে বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়া যায়; এই বিবেচনা করিয়া সকলেই যুদ্ধের অপেক্ষায় বিবাদের সূচনার প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছেন। একদিন কুফা নগরের কাসেদ্ মদিনায় দেখা দিল। মদিনাবাসীরা জেয়াদের বদান্যতার বিষয় পূর্বেই শুনিয়াছিলেন, নিশ্চয় সংবাদ না পাইয়া অনেকে অনেক সন্দেহ করিতেছিলেন, আজ সে সন্দেহ দূর হইল। একমুখে বলিতে শত শত মুখে জিজ্ঞাসিত হইল, "কুফার সংবাদ কী?"

কাসেদ্ উত্তর করিল, "কুফাধিপতি মাননীয় আবদুল্লাহ্ জেয়াদ তাঁহার সিংহাসন, রাজ্য, ধন, সৈন্যসামন্ত সমস্তই হজরত ইমাম হোসেনের নামে উৎসর্গ করিয়াছেন। তিনি এক্ষণে রাজকার্য হইতে অপসৃত হইয়াছেন। ইমাম হোসেন কুফা-সিংহাসনে উপবেশন না-করা পর্যন্ত প্রধান উজিরের হস্তে রাজকার্যের পরিচালনার ভার রহিয়াছে। ইমাম হোসেন কোথায় আছেন আপনারা বলুন, আমি তাঁহার নিকটে যাইয়া এই সংবাদ দিব।" একজন বলিতে শত শত লোক কাসেদের অগ্র-পশ্চাতে চলিতে লাগিল। কেহ আবদুল্লাহ্ জেয়াদের প্রশংসা, কেহ কেহ হোসেনের কুফাগমনজনিত দুঃখ, কেহ এজিদের দৌরাত্ম্যে হোসেন দেশত্যাগী, এই সকল কথার শাখা-প্রশাখা বাহির করিয়া পরস্পর বাদানুবাদ ও তর্ক-বিতর্ক করিতে করিতে হজরতের রওজায় উপস্থিত হইল। প্রধান প্রধান লোকেরা কাসেদের বৃত্তান্ত ইমামের নিকট বিবৃত করিলেন।

আবদুল্লাহ্ জেয়াদের পত্র পাঠ করিয়া হোসেন সেই পত্রহস্তে কাসেদ সমভিব্যাহারে নিজ ভবনের প্রবেশদ্বারে উপস্থিত হইয়া মদিনাবাসীদিগকে বলিতে লাগিলেন, "ভাই সকল! আপনারা কেন আর কষ্ট পাইতেছেন? যদি কুফার অন্ন-জল ঈশ্বর আমার অদৃষ্টে লিখিয়া থাকেন, তবে আপনারা আমার কৃতদোষ মার্জনা করিবেন। সময়ে আমি আপনাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিব। এক্ষণে এত ব্যস্ত হইবার কোন কারণই দেখিতেছি না।"

মদিনাবাসীরা সকলেই একবাক্যে হোসেনকে আশীর্বাদ করিয়া স্ব-স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

জেয়াদের পত্র লইয়া হোসেন মাননীয়া বিবি সালেমার হোজ্‌রা (নির্জন স্থান) সমীপে গমন করিলেন। সংবাদ পাইয়া বিবি সালেমা হোজ্‌রা হইতে বহির্গত হইলেন। ইমাম হোসেন মাতামহীর (হজরত হোসেনের আপন মাতামহী বিবি খাদিজা। বিবি সালেমা হযরত মোহাম্মদের অন্য স্ত্রী।) পদধূলি গ্রহণ করিয়া জেয়াদের পত্রবিবরণ প্রকাশ ও কুফা নগরে গমন প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন।

রওজা হইতে হোসেনের আগমনবৃত্তান্ত শুনিয়া পরিজন, আত্মীয়, বন্ধু অনেকেই বিবি সালেমার হোজ্‌রায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

হোসেন সকলের নিকটেই কুফা-গমনসঙ্কল্পে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করায়, কেহই কোন উত্তর না করিয়া নিস্তব্ধভাবে রহিলেন। বিবি সালেমা গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন, "আবদুল্লাহ জেয়াদ্‌ যাহাই লিখুক, আমি তোমাকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতেছি, তুমি কখনোই কুফায় গমন করিয়ো না-হজরতের রওজা ছাড়িয়া কোন স্থানেই যাইয়ো না; হজরত আমাকে বলিয়া গিয়াছেন যে, হোসেন আমার রওজা পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিলে অনেক প্রকার বিপদের আশঙ্কা। আমি পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতেছি, তুমি কখনোই রওজা হইতে বাহির হইও না। এখানে কাহারো ভয় নাই, কোন প্রকার শত্রুতা সাধন করিবার ক্ষমতা কাহারো নাই, তুমি স্বচ্ছন্দে নিশ্চিন্তভাবে রওজায় বসিয়া থাক।"

হোসেন বলিলেন, "কতকাল এইভাবে বসিয়া থাকিব? কাফেরগণ ক্রমশঃই তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া মদিনার নিকটে একত্রিত হইতেছে। আমি কি করি, কতদিন এই প্রকারে বসিয়া কাটাইব? একা আমার প্রাণের জন্য কত লোকের জীবন বিনষ্ট হইবে? তাহা অপেক্ষা আমি কিছুদিন স্থানান্তরে বাস করি, ইহাতে দোষ কি? বিশেষ কুফা নগরের সমুদয় লোক মুসলমান-ধর্মপরায়ণ, সেখানে যাইতে আর বাধা কী?"

সালেমা বিবি বিরক্তভাবে বলিতে লাগিলেন, "আমি বৃদ্ধা হইয়াছি, আমার উপদেশ তোমাদের গ্রাহ্য হইবে কেন? যাহা হয় কর।" এই বলিয়া হোজ্রামধ্যে চলিয়া গেলেন। তৎপরে হোসেনের মাতার সহোদরা ভগ্নী উম্মে কুলসুম্‌ হোসেনের হস্তধারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হোসেন! সকলের গুরুজন যিনি, প্রথমেই তিনি নিষেধ করিতেছেন, তাঁহার কথার অবাধ্য হওয়া নিতান্তই অনুচিত। বিশেষ আমিও বলিতেছি, তুমি কুফার নাম পর্যন্তও করিয়ো না। কুফার নাম শুনিলে আমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠে। তোমার কি স্মরণ হয় না যে, তোমার পিতা কুফায় যাইয়া কত কষ্ট পাইয়াছিলেন? কুফা-নগরবাসীরা তাঁহাকে কতই-না যন্ত্রণা দিয়াছিল, সে কথা কি একেবারে ভুলিয়াছ? কুফায় যাইবার বাসনা অন্তর

হইতে একেবারে দূর কর। নিশ্চিন্তভাবে রওজায় বসিয়া থাক, আমি সাহস করিয়া বলিতেছি, জগতে এমন কেহই নাই যে, তোমার অঙ্গ স্পর্শ করে।"

হোসেন বলিলেন, "আমার মন অত্যন্ত অস্থির হইয়াছে! তিলার্ধ কালও মদিনায় থাকিতে ইচ্ছা হইতেছে না। আপনারা আর আমায় বাধা দিবেন না। মিনতি করিয়া বলিতেছি, অনুমতি করুন, শীঘ্রই যাহাতে কুফায় যাত্রা করিতে পারি।"

উম্মে কুলসুম্ বিরক্ত হইয়া চলিয়া যাইতে যাইতে বলিলেন, "ঈশ্বর অদৃষ্টফলকে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা রদ করিবার কাহারো সাধ্য নাই। তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর।"

হোসেনের বন্ধুবান্ধব একবাক্য হইয়া সকলেই কুফাগমনে নিষেধ করিলেন। প্রতিবেশীগণের মধ্যে একজন বলিলেন, "মদিনার মায়া একেবারে অন্তর হইতে অন্তর করিবেন না। এজিদের ভয়ে মদিনা পরিত্যাগ নিতান্ত পরিতাপ ও দুঃখের বিষয়। তাহারা প্রকাশ্য যুদ্ধে কী করিবে? মদিনাবাসীদের একজনেরও প্রাণ দেহে থাকিতে শত্রুগণ কি আপনার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারে? কাহার সাধ্য? আমাদের স্বাধীনতা, স্বদেশের গৌরব রক্ষা, ইহা তো আছেই; তাহা ছাড়া আপনার প্রাণের জন্য এজিদের সৈন্যের সম্মুখীন হইতে আমরা কখনোই পরাক্সমুখ হইব না। আমরা শিতি নহি, তাহা স্বীকার করি; কিন্তু আপনার প্রাণরার জন্য আমাদের প্রাণ শত্রুহস্তে অর্পণ করিতে শিক্ষার আবশ্যক কি? আমরাও যদি শত্রুহস্তে বিনাশপ্রাপ্ত হই, তথাপি মদিনার একটি স্ত্রীলোক জীবিত থাকিতে এজিদ্ আপনার অনিষ্ট সাধন করিয়া কখনোই মদিনার সিংহাসনে বসিতে পারিবে না। আপনি কাহার ভয়ে-কোন্ শত্রুর শত্রুতায় মদিনা পরিত্যাগ করিবেন? আমাদের জীবন থাকিতে আমরা আপনাকে যাইতে দিব না। আপনার আজ্ঞার প্রতিবন্ধকতা করিতে আমাদের ক্ষমতা নাই। যদি আপনি মদিনা পরিত্যাগ করিতে নিতান্তই কৃতসঙ্কল্প হইয়া থাকেন, করুন; কিন্তু মদিনাবাসীরা আপনাকে কখনোই পরিত্যাগ করিবে না। যেখানে যাইবেন, তাহারাও আপনার সঙ্গে সেইখানে যাইবে।"

হোসেন বলিতে লাগিলেন, "ভাই সকল! এজিদের জীবনের প্রথম কার্যই আমাদের বংশ বিনাশ করা। যে উপায়ে হউক, এজিদ্ আমার প্রাণ বিনাশ করিবে। যখন দুই ভ্রাতা ছিলাম, তখন এজিদের সৈন্যেরা সাহস করিয়া প্রকাশ্য যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হয় নাই। কয়েকবার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে এবং আপনারাও দেখিয়াছেন। এক্ষণে আমার সাহস, বল, বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির অনেক লাঘব হইয়াছে। কারণ, ভ্রাতৃশোকে আমি যে প্রকার দুঃখিত ও কাতর আছি, তাহা আপনারা স্বচক্ষে দেখিতেছেন; যে হৃদয় কখনোই ভয়ের নাম জানিত না, শত্রুনামে যে হৃদয় কদাচ আতঙ্কিত হইত না, সেই ভয়শূন্যহৃদয় আজ ভ্রাতৃ-বিয়োগ-দুঃখে সামান্য যুদ্ধের নামে আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিতেছে। আমার নিজের মনই যদি নিরুৎসাহ থাকিল-শত্রুভয়ে কম্পমান রহিল, তখন কাহার উৎসাহে-কাহার উত্তেজনায়, আপনারা সেই দুর্দান্ত শত্রুর অস্ত্রসম্মুখে-অসংখ্য সেনার অসংখ্য অস্ত্রসম্মুখে দণ্ডায়মান হইবেন? বলুন তো, কাহার সাহসের উপর নির্ভর করিয়া বিধর্মীর অস্ত্রাঘাতের জন্য বক্ষ বিস্তার করিয়া দিবেন? শিক্ষিতি সৈন্যের তরবারির গতি কাহার প্রোৎসাহবাক্যে প্রতিরোধ করিবেন? আমি অনেক চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি, এক্ষণে মদিনা পরিত্যাগ করাই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ এবং মদিনাবাসীর পক্ষে মঙ্গল। আমার জন্য আমি আপনাদিগকে বিপদগ্রস্ত করিতে বাসনা করি না। এজিদের হস্তে, কিংবা তাহার সৈন্যের হস্তে বিধি যদি আমার জীবন-শেষের বিধি করিয়া থাকেন, তবে তাহা নিশ্চয়ই ঘটিবে। যেখানেই কেন যাই না, আমার প্রাণহন্তা সেইখানেই উপস্থিত হইবে। কারণ, জগদীশ্বরের কার্য অনিবার্য। আমার স্থানান্তর হওয়ায় মদিনাবাসীরা তো এজিদের রোষাগ্নি হইতে রক্ষা পাইবে। তাহাই আমার পক্ষে মঙ্গল।"

প্রতিবেশীগণের মধ্যে একজন প্রাচীন ছিলেন, তিনি বলিতে লাগিলেন, "ঈশ্বরের নিয়োজিত কার্য অনিবার্য, এ কথা কে না স্বীকার করিবে? কিন্তু আবদুল্লাহ্ জেয়াদ্ হঠাৎ এইভাবে এত বড় রাজ্য আপনাকে অযাচিতভাবে ছাড়িয়া দিল, ইহার কারণ কী? এ কথাও রাষ্ট্র হইয়াছে যে, এজিদপক্ষীয় কাসেদ্ তিন লক্ষ টাকা লইয়া কুফা নগরে জেয়াদের নিকট গিয়াছিল। জেয়াদ্ও দামেস্কের কাসেদ্কে এবং তৎসমভিব্যাহারী সৈন্যচতুষ্টয়কে বিশেষ পুরস্কৃত করিয়া বিদায় করিয়াছেন। তাহার পরদিবসই স্বপ্নবিবরণ সভায় প্রকাশ করিয়া রাজসিংহাসন ও

রাজ্য আপনাকে অর্পণ করিয়াছেন। ইহারই-বা কারণ কী? যদি এজিদের মন্ত্রণায় সে অসম্মত হইবে, কি এজিদের আদেশ প্রতিপালনে অনিচ্ছুক হইবে, তবে নিঃস্বার্থ বন্ধুর চিরশত্রুপ্রেরিত কাসেদ্‌কে কেন পুরস্কৃত করিবে? কেন তাহার প্রদত্ত অর্থ নিজ ভাণ্ডারে রক্ষা করিবে? যে রাজ্য আপনার পিতা বহু পরিশ্রম করিয়াও নিষ্কণ্টকে হস্তগত করিতে পারেন নাই, কয়েকবার তাঁহাকে ঐ নগরবাসীরা, যে প্রকার কষ্টে নিপাতিত করিয়াছিল, তাহা বোধ হয় আপনি পরিজ্ঞাত আছেন। এইণে কুফাধিপতি জেয়াদ্ হঠা৷ নূরনবী মোহাম্মদের স্বপ্নাদেশে সেই রাজ্য অকাতরে আপনাকে দান করিল, ইহাতে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে।"

হোসেন বলিলেন, "এমন কথা মুখে আনিবেন না। আবদুল্লাহ্ জেয়াদের ন্যায় আমার প্রকৃত বন্ধু মদিনা ব্যতীত অন্য কোন স্থানেই নাই। তাঁহার গুণের কথা কত বলিব। তিনি আমার জন্য এজিদের মুণ্ডপাত করিতেও বোধ হয় কখনোই কুণ্ঠিত হইবেন না। জেয়াদের বাক্য ও কার্যে আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই।"

বৃদ্ধ পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "জেয়াদের বাক্যে ও কার্যে আপনার কোন সংশয় হয় না, অবশ্যই না হইতে পারে। কিন্তু আমি বলি, মানুষের মনের গতি কোন্ সময় কী হয়, তাহা যাহার মন, সেও জানিতে পারে না। একটু চিন্তা করিয়া কার্য করায় ক্ষতি কী? আমার বিবেচনায় অগ্রে জনৈক বিশ্বাসী এবং সাহসী লোককে কুফা নগরে প্রেরণ করা হউক। কুফাবাসীরা যদি কোনরূপ চক্রান্ত করিয়া থাকে তবে অবশ্যই প্রকাশ হইবে। গুপ্ত মন্ত্রণা ক'দিন গোপন থাকিবে? একটু সন্ধান করিলেই সকল জানা যাইবে। আর জেয়াদের রাজ্যদানসঙ্কল্পও যদি যথার্থ হয়, তবে আপনার কুফা গমনে আমি কোন বাধা দিব না।"

হোসেন বলিলেন, "এ কথা মন্দ নয়; কিন্তু অনর্থক সময় নষ্ট এবং বিলম্ব। তা যাহাই হউক, আপনার কথা বারবার লঙ্ঘন করিব না। অগ্রে তথায় পাঠাইতে কাহাকে মনস্থ করিয়াছেন? এমন সাহসী বিশ্বাসী পাত্র কে আছে?"

দ্বিতীয় মোস্‌লেম নামক জনৈক বীরপুরুষ গাত্রোত্থান করিয়া করজোড়ে বলিতে লাগিলেন, "হজরত ইমামের যদি অনুমতি হয় তবে এ দাসই কুফা নগরে যাইতে প্রস্তুত আছে। আপনি কিছুদিন অপেক্ষা করুন, আমি কুফায় যাইয়া যথার্থ তত্ব জানিয়া আসি। যদি আবদুল্লাহ্ জেয়াদ্ সরলভাবে রাজ্য দান করিয়া থাকেন, তবে মোস্লেম আনন্দের সহিত শুভ সংবাদ লইয়া ফিরিয়া আসিবে। আর যদি ইহার মধ্যে কোন ষড়যন্ত্র থাকে, তবে বুঝিবেন, মোস্‌লেমের এই শেষ বিদায়। আপনার কার্যে মোস্‌লেমের প্রাণের মায়া, সংসারের আশা, সুখ-দুঃখের চিন্তা, স্ত্রী-পরিবারের স্নেহবন্ধন, কিছুমাত্র মনে থাকিবে না। আজ মোস্লেম আপনার কার্যে জীবন উৎসর্গ করিল। এই মুহূর্তেই কুফায় যাত্রা করিবে। এখানে অনেকেই আছেন, যাহা বলিতে ইচ্ছা করেন বলুন; মোস্‌লেম সে কথার অন্যথা কিছুতেই করিবে না।"

বৃদ্ধ পুনরায় বলিলেন, "মোস্‌লেম তো যাইতেই প্রস্তুত। মোস্‌লেমের প্রতি আমার তো সম্পূর্ণ বিশ্বাসই হয়, কিন্তু একা মোস্‌লেমকে কুফায় প্রেরণ করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। শিক্ষাত হউক কি অশিক্ষিত হউক, সৈন্যনামধারী কতিপয় লোককে মোস্‌লেমের সঙ্গে দিতে হইবে।"

বৃদ্ধের মুখে এই কথা শুনিবামাত্র নিতান্ত আগ্রহের সহিত অনেকে যাইতে ইচ্ছুক হইলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এক হাজার লোক মোস্‌লেমের সঙ্গী হইতে সমুৎসুক হইল। কুফার রহস্য-ভেদ ষড়যন্ত্রের মূলোচ্ছেদ করিতে তাহারা প্রাণপণে প্রস্তুত। সমুদয় কথা সাব্যস্ত হইয়া গেল; অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়া মোস্‌লেম এক হাজার সৈন্য লইয়া কুফা নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বীরবরের দুই পুত্রও পিতার সঙ্গে চলিল।